বনস্পতি

শ্রীজ্যোতিলাল প্রামাণিক



গেছো বাবা

কী রে সন্ধান পেলি ?

আরে ভাই তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধ'রে বনে বাদাড়ে ঘুরে [illegible]
হোলো, টিকিও দেখতে পেলুম না।

কাব সন্ধান করছিস্ রে ?

গেছো বাবার।

গেছো বাবা ? সে আবার কে রে ?

জানিস্‌নে ? বিশ্বসুদ্ধ লোক তাকে জানে।

তা গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি ?

বাবা যে গাছে চ'ড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু। তলায় দাঁড়িয়ে থাক
যা চাইবি তাই পাবি রে।

খবর [redacted] কার কা ক ?

আহেরিকা

গেছো বাবা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধাকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দ্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চ'ড়ে ব'সে



পা দোলাচ্ছিল, ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্চে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈবি কববে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল ট'লে—চিটেগুড়ে তাব মুখ চোখ গেল বুজে। বাবাব দয়াব শবীব, বললে ভেকু, তোর মনের কামনা কী, খুলে বল। ভেকুটা বোকা, বললে বাবা,—একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোক মুছে উপবে যখন তাকালো তখন আব কাবো দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস্, তাব পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

রে হায়, শাল নয় দোশালা নয় শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি সুবে।

নপু, ঐ গামছা নিয়েই তার দিব্যি চলে যাচ্চে—দেখিস্ নি রথতলার কাছে অত লা বানিয়েছে। গামছা হোক বাবার গামছা তো!

র হোলো? ভেলকি নাকি?

গেছো বাবা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হোঁদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা শিকেটা আলুটা মুলোটা চারদিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে ও ভেকু দাদা আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিন মাস ধ'রে জ্বরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবেদ্য চাই পাঁচশিকে, পাঁচটা সুপুরি, পাঁচ কুনকে



ল, পাঁচ ছটাক ঘি। নৈবিদ্যি তো দিচ্চে, ফল পাচ্চে কিছু?

াচ্চে বৈ কি? গাজন পাল গামছা ভ'রে পনেরো দিন ধ'রে ধান ঢেলেছে, তার র ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, কী বলব ভাই দ আষ্টেক পরেই তার চাকরি জুটে গেল। মাদের রাজবাড়িব কোতোয়ালেব সিদ্ধি টে, তার দাড়ি চুমরিয়ে দেয়।

ত্য বলছিস্?

ত্য না তো কী? গাজন যে আমার মামাতো াইয়ের ভায়রা ভাই হয়।



াচ্ছা ভাই বুধু, গামছাটা তুই দেখেছিস্?

খেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড় গজ াড়ের যে গামছা বুনুনি হয়, চাঁপার বরণ জমি, লাল পাড়,

গেছো বাবা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলিস্ কী ? তা সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী ক'রে ?

ঐ তো মজা। বাবার দয়া !

চল্ ভাই চল্, খোঁজ করতে বেরই। কিন্তু চিনব কী ক'রে ?

সেই তো মুস্কিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। তার হবি তো হ' ভেকু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে'।

তবে উপায় ?

আমি তো হাটেঘাটে যাকে দেখ্ছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিজ্ঞাসা করছি দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা ? শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো দিল আমার মাথায় হুঁকোর জল ঢেলে।

তা দিক্ গে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বেব কববই। যা থাকে কপালে।

ভেকু বলে গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহাবা ধবা পড়ে, নিচে থেকে চেনবারই জো নেই।

গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে ভাই ? আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভ'রে গেছে, যাকে দেখ্ছি তাকেই বল্ছি আমড়া পেড়ে নাও—গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

আর দেরি নয়রে চল্। কপালের জোব যদি থাকে তবে দর্শন লাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে না ভাই। গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পাকল বনে কোথাও যদি থাকো লুকিয়ে একবার অভাগাদেব দর্শন দাও।

ওরে হয়েছে রে, দয়া হোলো বুঝি !

কই রে কই।

ঐ যে চাল্তা গাছে।

কী রে চাল্তা গাছে কী, দেখছিনে তো কিছু !

[illegible]য় দুলছে !

[illegible] হোলোও তো ল্যাজ রে !

আহরিকা

গেছো বাবা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোর কেমন বুদ্ধি, গোবরা, ও বাবার ল্যাজ নয় রে, হনুমানের ল্যাজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

ঘোর কলি যে! বাবা ঐ কপি-রূপ ধরেছেন—আমাদের ভোলাবার জন্যে।

ভুলছিনে বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পারো মুখ ভ্যাঙাও নড়ছিনে—তোমার ঐ শ্রীল্যাজের শরণ :নলুম।

ওরে, বাবা যে লম্বা লাফ দিয়ে পালাতে সুরু করল রে।

পালাবে কোথায়? আমাদের ভক্তির দৌড়ের সঙ্গে পারবে কেন? ঐ বসেছে কয়েৎ ~লের গাছের ডগায়।

:হরি, উঠে পড়্ না গাছে!

ারে তুই যা না!

ারে তুই যা।

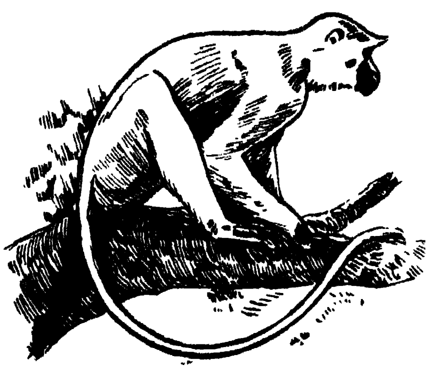
অত উচ্চে উঠতে পারব না বাবা, কৃপা করে নেমে এসো।

বাবা, তোমার ঐ শ্রীল্যাজ গলায় বেঁধে অন্তিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করো।

দয়া যদি হয় তবে আর জন্মে তোমার ঐ রূপটি নিয়ে জন্মাব।

আবার লাফ দিল যে, চল্ চল্!

(প্রস্থান)





ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সেবার দেশময় রটে গেল যে তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্চে না। দু'টি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হ'য়ে গেছে বাকি শুধু একটি। এইটি সংগ্রহ হ'লেই পুল তৈরি হ'য়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানীর নিযুক্ত ছেলে-ধরা'রা সহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হ'বে কেউ বলতে পারে না। তাদের কারও পোষাক ভিখিরীর কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠি হাতে ডাকাতের মতো—এ জনশ্রুতি পুরনো সুতরাং কাছাকাছি পল্লী-বাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রইলোনা-যে এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলে-পুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে। কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়ীতেই কেমন একটা ছমছম্ ভাব। আবার তার উপর আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলে-ধরা ধরা পড়েছে, কাল করেয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে সে ছেলে ধ'রে ঝুলিতে পুরছিলো। এমনি কত খবর। কলকাতার অলিতে গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছলো। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা [illegible]। সেইটে বলি।

ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুয্যে-দম্পতি। ছেলে-পুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আসক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা ক'রে দিয়েছেন কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি তৈজসপত্র, খুড়ি চেঁচিয়ে হাট বাধিয়ে দিয়ে লোক জড়ো কবেন, বলেন হীরু আমা'দের মার্‌তে এসেছিলো। হীরু বলে সেই ভালো—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় কর্‌বো। এমনি ক'বে দিন যায়।



সেদিন সকালে ঝগড়াটা চূড়ান্ত হ'য়ে গেল। হীরু উঠনে দাঁড়িয়ে বল্‌লে, শেষ বলা বল্‌চি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কি না বলো।

খুড়ো বল্‌লেন, তোর কিছুই নেই।

নেই ?

না।

আদায় ক'রে আমি ছাড়্‌বো।

আহরিকা

ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খুড়ি রান্নাঘরে কাজে ছিলেন বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, তাহ'লে যা তোর বাবাকে ডেকে আন্‌গে।

হীরু বল্‌লে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আস্‌তে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমার বাবাদের ডেকে আন্‌বো। তাদের কেউ কেউ হয়ত বেঁচে আছে—তারা এসে চুল চিরে আমার বখরা ভাগ ক'রে দেবে।

তারপরে মিনিট দুয়েক ধ'রে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চল্‌লো তা' লেখা চলেনা।

যাবার আগে হীরু বলে গেল আজই এর একটা হেস্ত-নেস্ত ক'রে তবে ছাড়বো। এই তোমাদের ব'লে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ি বল্‌লেন, তোর ভারি ক্ষমতা! যা পারিস্ ক'র্‌গে।

হীরু এসে হাজির হ'লো রাইপুরে। ঘর কয়েক গরিব মুসলমানদের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁঠে গাঁঠে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মতো লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পাবেনা এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়েই শান্ত হ'য়ে থাকে।

হীরু বল্‌লে, বড়-মিঞা এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ছোট ভাইয়ের। কাজ উদ্ধার ক'রে দাও আরো বক্‌শিস্ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বল্‌লে, কি কাজ বাবু?

হীরু বল্‌লে, এদেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারী হাসিল ক'রে দিয়েছো—তোমরা মনে কর্‌লে পারোনা কি!

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল ক'রে দিয়েছি এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, কেউ চিনতে পারে নি?

লতিফ বল্‌লে, পারবে কি ক'রে! মাথায় ইয়া পাগ্ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাব্‌লে হিঁদুর

ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

যমপুরী থেকে যম-দূত এসে হাজির হলো। চিনবে কি, কে-কোথায় পালালো তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ি বেটি এমনি শয়তান যে একটা চুম্‌কি-ঘটিতে পর্য্যন্ত হাত দিতে দেয় না।



ওই পাগ্‌ড়ি, গাল-পাট্টা আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠনে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতে হুম্‌কি একবার ঝাড়বে, তার পরে দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা কিছু পাওনা ফেঁড়ে বার ক'রে আনবো। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যস্‌।

লতিফ মিঞা রাজি হলো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোষাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়ীতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারাদিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই ক'রে দিয়েছেন জগদ্

ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বসেছেন জলযোগে। সামান্য ফল-মূল ও দুধ। বেতো-ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলো দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগ্‌ড়ি, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর মাখানো। মুখুয্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম্‌ ক'রে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—ওগো পাড়ার লোক কে-কোথায় আছো এসো গো—ছেলে-ধরা ঢুকেছে!

সুমুখের ছোট্ট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিলো,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে-যেখানে পারলে ছুট দিলে—ওগো ছেলে-ধরা এসেছে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল—সে চাপা গলায় বললে,—আরে দেখো কি মিঞা পালাও। পাড়ার লোকে ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা সহরের আর কিছু না শুনে থাক্‌ ছেলে ধরার জনশ্রু কানে এসেও পৌঁচেছে। চক্ষের পলকে বুঝলে এই অজানা যায়গায় এইরূপ এই সিঁদুর-মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে সুতরাং তারাও মারলে ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি! পথ অচেনা, আলো এসেছে ঝুকমে—চতুর্দ্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল্‌! ধরে ফ্যাল্‌! মেরে ফ্যাল্‌ ব্যাটাদের! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালালো ঠিকানা নেই কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটাবন ভেঙে লাফিয়ে পড়লো একটা ডোবায়। তার পরে সবাই তার পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগলো ঢিল। যাই মাথা তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার ওঠে আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইট খেয়ে আধ-মরা হয়ে পড়লো। সে যতই হাত-জোড় ক'রে বলতে চায় সে ছেলে-ধরা নয়, ছেলে ধরতে আসে নি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন? ওর পাগ্‌ড়ি কিসের জন্যে? ওর মুখ-ময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে? পাগ্‌ড়ি তার খুলে

গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখ-ময় লেগেছে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন শোনেই বা কে।

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে—সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্চে সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা,—তারা ছেলে-ধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেবে এলুম পুকুর ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল—সবাই সমস্বরে বলতে লাগলো তাবা একটা ছেলে-ধরা ধরেছে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগ্ড়িতে সিঁদুরে, রক্তে মাখামাখি—শুধু হাত-জোড় করছে আর কাঁদচে।

জিজ্ঞেস করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেছে? কে নালিশ করচে?

তারা বললে তা কে জানে।

ছেলে কৈ?

তাই বা কে জানে?

তবে এমন ক'রে মারচো কেন?

কে-একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম, মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায়?

তারা বললে, মরা হবে কেন জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হলো। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি। বললুম ছাড়ো ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলুম, মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কি বলো ত?

এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে। মুখুয্যে-দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না, শুনে অনেকের করুণাও হলো।

বললুম, লতিফ বাড়ি যাও আর কখনো এ সব কাজে এসো না।

ছেলেধরা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবু মশায় আর এ সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায়?

বললুম, ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচলো এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনোমতে বাড়ি চলে গেল।

* * * *

অনেক রাত্রে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদেব পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকেছিল গরুকে জাব দিতে। খড়েব ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা



যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ মূর্ত্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো কে কোথা আছো—ভূতে আমাকে খেয়ে ফেললে।

ভূত ততই তাব মুখ চেপে ধরে বলে, মাগো আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত পেরেত নই আমি মানুষ।

চীৎকার শব্দে বাডীব কর্ত্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত—আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সুতরাং ছোট ভায়েব ভাগ্যে বড় ভায়েব দুর্গতি আর ঘটলো না। সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়। ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবনে মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রঙ্‌ টঙ্‌ ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ একশ সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সবে পড়ল। ঘটনাটি ছেলে ভুলানো গল্প নয়, সত্যিই আমাদেব ওখানে ঘটেছিল।



অরিসিংহ



শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিতোর তখনও পাঠানের হস্তগত হয় নাই, মেবাবে তখনও ভীমরাণার অটুট প্রতাপ, মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহের সুশাসনে দেশ তখন ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ; সেই সময় একদিন যুবরাজ অরি সিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনেব ধারে উজলা গ্রামে, মেটো রাস্তায় শিকারির দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল—শিকার একটা ছুঁচালো মুখ, দাঁতালো বরা—বেলা দুপুরে মেটে রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেক দূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার একটা জনার ক্ষেতের ভিতর ঝাপিয়ে পড়ল; সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর ত ছোটেই না।

ক্ষেতের মধ্যে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুতের মেয়ে এই তামাসা দেখছিল; পরণে তার পীলা ওড়নী, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা। দুজনের চোখ দুজনের উপর পড়েছিল।

শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরি সিংহ যখন বুনাশ নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, ক্ষেতের ভিতর থেকে রাজপুতের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে রাজকুমারকে ভেট দিয়ে গেল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ক্যায়সে মারা"? বালিকা বল্লমের মত সিধে একটা জনারের শিশ্ দেখিয়ে বল্লে, "ইসিসে ঘায়েল কিয়া"। তার

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধূলো-মাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মত সুন্দর মুখের চারিদিকে শোভা ধরেছিল, তার সুডৌল হাতে পিতলের কাঁকণ সূর্য্যের আলোয় সোণার মত ঝক্‌মক্ করছিল।

বুনাশ নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কন্যার কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল। সবুজ ক্ষেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখীর ঝাঁক আর হরিণের পাল তাড়াতে তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে, কিন্তু এ সময় তার হাত থেকে ঠিক্‌রে একটা মাটির ঢেলা সেই আমবাগানের ধারে গাছতলায় বাঁধা একটা ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চম্‌কে উঠে, রাজকুমার চেয়ে দেখলেন; আমবাগানের ফাঁকে একটুখানি সবুজ ক্ষেত, তার মাঝে সেই নীল আঙ্গিয়া পীলা ওড়নী রাজপুতকন্যা। পশ্চিমে বাতাসে অড়— ক্ষেতে ঢেউ উঠছে, একদল টীয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের নিবু-নিবু, পাথরের মত পরিষ্কার আকাশ তার কোলে কালো কালো মেঘের সর রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ী চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথে আর রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুইজনে আর একবার দেখা হল; বালিকা মাথায় দুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙ্গে গ্রামে চলেছে, সঙ্গে দুটি চিকণ কালো ছানা ভৈঁষ আর কাঁকে দুধ-মা'র লেড়কী।

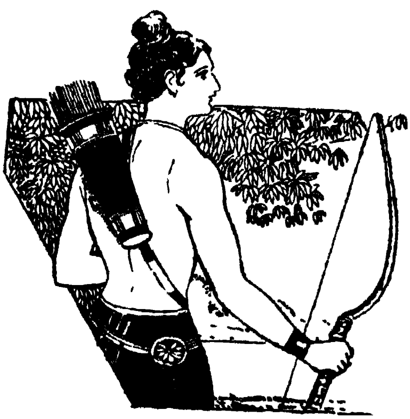
পরদিন উজলা গ্রামে সেই বালিকার ঘরে বিয়ের কথা নিয়ে রাজকুমারের দূত এল। বালিকার ঠাকুরদাদা চন্দানো বংশের চোহান রাজপুত। কিছুতেই সম্মত হল না। রাজকুমার হতাশ হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুতের ঘরে পরে, গৃহিণীর কাছে, পাড়াপড়সীর দুয়ারে লাঞ্ছনা গঞ্জনার সীমা পরিসীমা রইল না—'এমন কাজও করে—হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? রাজা হচ্ছিল নাতজামাই তা মর্দ্দর মনে ধরল না, যেমন বুদ্ধি তেমনি চিরকালটা চাষা হয়েই থাক'—বুড়োর কিন্তু সকলের কথায় একই জবাব 'তা তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লছমীকে রাজবাড়ীতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারব না, তার চেয়ে আমার নাত্‌নী গরীবের ঘরে গিন্নি হয়ে থাকে সে ভাল।' বুড়োর প্রতিজ্ঞা কিন্তু বেশীদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, রাণী পদ্মিনী লিখেছেন—"আমি নিঃসন্তান, তোমার লছমীকে ভিক্ষা চাই, আমার আশীর্ব্বাদ, চিতোর-রাজলক্ষ্মী তোমার বংশ আশ্রয় করুন"। সতীর কথা ব্যর্থ হয় না, লক্ষ্মী

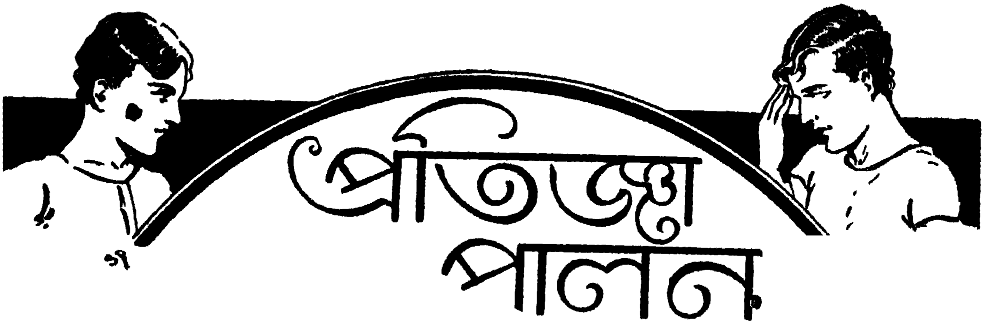
অরিসিংহ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিতোরের সিংহাসনে বসবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। শুভলগ্ন স্থির হল। ধূমে-ধামে আলো জ্বালিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে বরবেশে যুবরাজ এলেন, যেন কোন স্বপ্নের রাজ্য থেকে রাজপুত্র এসে উজলা গ্রামে উদয় হলেন! আনন্দে আলোয়, নাচে গানে সমস্ত গ্রাম এক রাত্রের মত উৎফুল্ল হয়ে উঠল; সে দিনের সে সুখের বাসর কোথা দিয়ে কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমী রাণীকে আর এক মাসের রাজপুত্র হাম্বীরকে উজলা গ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে গেলেন। সে যুদ্ধে যে গেল তাকে আর ফিবতে হল না। রাণা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীম সিংহ গেলেন, রাণী পদ্মিনী, রাজবধূ, রাজমাতা সকলে গেলেন, চিতোরলক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হলেন। রইলেন কেবল হাম্বীরকে নিয়ে রাণী লছমী আর কৈলোরের কেল্লায় রাণার বংশধর অজয় সিংহ।





প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

গ্রাম ছেড়ে পাঁচু যখন কলকাতায় পড়তে এলো, তখন তার বিধবা মা অনেকখানি চোখের জল ফেললেন।

পাড়ার লোকেরাও সকলে ব'ললে, "কি হবে ছেলেকে আর পড়াশুনা করিয়ে পাঁচুর মা, তার চেয়ে যা লেখাপড়া শিখেছে, ওই দিয়ে কোন দোকানে কাজকর্ম্ম যোগাড় ক'রে চালাতে পারবে'খন। এই তো আমাদের বিশু, কালো, গদা, সব ছেলেরাই মহেন্দ্র সরকারের দোকানে যা-হোক এক-একটা কাজে লেগে গেছে,—দশ বারো টাকা যা মাইনে পায়, তাতেই ওদের সংসার বেশ চলে যায়।

মা প্রথমটায় তাই ভেবেছিলেন। তাঁদেব মা-ছেলের সংসার, দশ বারো টাকা প্রতি মাসে পেলে হেসে খেলে দিন কেটে যাবে, কি হবে বেশী টাকার লোভ ক'রে ছেলেকে পড়াশুনা করিয়ে ?

কিন্তু পরে তাঁর মত বদলে গেল। বদলাবার কাবণও ছিল।—জেলার হাকিম একবার এখানে এসেছিলেন, সেই সময়েই মাইনর স্কুলে ছেলেদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সে একটা বিশেষ দিন, দেশের যে-যেখানে ছিল সকলেই সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিল—ছেলে মেয়ে কেউই বাদ যায় নি।

হাকিম হাতে করে পুরস্কার দেবেন—এ বড় কম কথা নয়। ক্ষুদ্র গ্রামে শিমূলতলায় এমন কাণ্ড কখনও ঘটে নি। হাকিমের নামটা অনেকে জানে, অনেককে মামলা মোকর্দ্দমা করতে সহরে হাকিমের কাছে যেতে হয়, হাকিমের প্রতাপ তারাই জানে। সেই হাকিম নিজের হাতে ছেলেদের পুরস্কার দেবেন এ বড় কম কথা নয়।

হাকিম বাঙ্গালী, নাম প্রমথনাথ রুদ্র, বিলাত ফেরত হ'লেও প্রকৃতি অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত। সেদিন তিনি ছেলেদের অনেক উৎসাহ দিয়ে গিয়েছিলেন, পড়াশুনা ক'রে

৩

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

তারা তাঁরই মত হাকিম হ'তে পারবে এ-কথাও তিনি বলেছিলেন। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য পাঁচু যেন সেই নূতন করে জানতে পারলে; এবং অবিলম্বে সে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলো—সে হাকিম হবেই।

সহপাঠি ছেলেরা হাস্‌লে, ঠাট্টা বিদ্রূপ আরম্ভ করলে, শেষে তার নাম-করণ করলে, হাকিম-সাহেব!

পাঁচু নেহাৎ বোকা ছেলে ছিল, লেখাপড়ায় সে গ্রাম্য-স্কুলে সকলের চেয়ে ভালো হ'লেও আর কোনও কিছু সে বুঝত না। তার একটা বিশেষ গুণ ছিল—সহজে সে কিছু বুঝতে না পারলেও একবার যদি বুঝতো, সেটা সে আর কিছুতেই ভুলতে পারতো না। লেখাপড়ায় তাই সে হ'য়েছিল সকলের প্রথম।

হাকিম হওয়ার কথাটা নিতান্ত বে-ফাঁসেই তার মুখ দিয়ে বার হ'য়ে পড়েছিল।



নমঃশূদ্র নরহরি দাসের ছেলে পাঁচু যে গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলেদের ডিঙিয়ে চলবে এটা কেউই সহ্য করতে পারেন নি, অথচ তাকে স্কুল হ'তে কোন রকমে বিতাড়িতও কেউ করতে পারেন নি; চেষ্টা চললেও ব্যর্থ হ'য়েছে।

সেই পাঁচু হাকিম হ'তে চায় শুনে গ্রামের সকলেরই মুখে হাসির ঢেউ বয়ে গেল; ছোট বড়, ছেলে বুড়ো সবাই তাকে দেখলেই হেসে উঠে বলতো—"হাকিম সাহেব—সেলাম।"

এই অপমান পাঁচুর-মা এবং পাঁচু সইতে পারছিল না। দৃঢ়কণ্ঠে পাঁচু বলেছিল—"আমায় তুমি কলকাতায়

পাঠাও মা, আমি লেখাপড়া শিখে নিশ্চয়ই মানুষ হব। হাকিম হ'তে না পারি, মানুষ হওয়ার পথ কেউ বন্ধ করতে পারবে না।"

গ্রামে পাঁচুদের স্বজাতীয় শ্রীপতি দাস কলকাতায় ব্যবসা করতো, অবস্থাও তার বেশ ছিল। পাঁচুর-মা একদিন তার কাছে গিয়েই কেঁদে পড়ল এবং শ্রীপতি দাসও দয়া ক'রে তার স্বজাতীয় এই ছেলেটীকে নিতে স্বীকার হ'ল।

(২)

পাঁচু কলকাতায় এসে ফ্রী-তে স্কুলে ভর্ত্তি হ'ল, বলা বাহুল্য, শ্রীপতি দাসই তাকে এ-রকম সুবিধা ক'বে দিলে।

ছেলেটী যে সত্যই শান্ত শিষ্ট ও ভদ্র সে পরিচয় মাষ্টারেরা দু'দিন না যেতেই পেলেন, ক্রমে বুঝতে পারলেন, এ ছেলেটীকে শিক্ষাদান করার সার্থকতা আছে।

একদিকে বোকা হ'লেও পাঁচুর অন্যদিকে বুদ্ধি ছিল। স্কুলে সকলে যখন তার নাম জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন নিজের পাঁচু-নামটাকে গোপন ক'বে অনেক ভেবে উত্তর দিয়েছিল, তার নাম সুনীল।

এখানে সে সুনীল নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করলে। ক্লাসের ছেলেরা কেউ তার নাগাল পায় না পড়ার সময়,—মাষ্টারেরা দেখে ভারি খুসি হয়ে উঠেছিলেন—তাঁদের শিক্ষা ব্যর্থ হয় না।—এই ছেলেটীর মধ্যে তাঁদের শিক্ষাদান সার্থক হয়ে ফোটে।

তবু এর উচ্চাশার কথা তারা কেউ জানেন না—একদিন ছিল কেবলমাত্র আশা, লোকের বিদ্রূপে সেই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—কঠোর প্রতিজ্ঞা।

মায়ের পত্র মাঝে মাঝে আসে, তাতে থাকে উৎসাহ-পূর্ণ বাণী—কবে সে মানুষ হ'বে—কবে সে বড় হ'য়ে এসে দাঁড়াবে, মা শুধু সেই আশা ক'রে আছেন। গ্রামের লোকেরা আজও তাঁকে ঠাট্টা ক'রে বলে—"হাকিমের-মা"। মা নীরবে আকাশের দিকে তাকান, প্রার্থনা করেন, যেন ওদেরই কথা সত্য হয়, তিনি যেন হাকিমের-মা হ'য়েই দেশে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়ান।

মায়ের পত্রের কথা পাঁচুকে আরও উৎসাহিত ক'রে তোলে, পাঁচু আরও কঠিন-

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ভাবে প্রতিজ্ঞা করে—তাকে মানুষ হ'তেই হবে, সে নিশ্চয়ই বিলেতে যাবে, হাকিম হ'য়ে আসবে।

সাহস ক'রে সে কাউকে বিলাতের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কি-জানি অতর্কিতভাবে যদি তার মনের কথাটাই বার হ'য়ে পড়ে। গ্রামে সে একটা গোলের সৃষ্টি ক'রে ফেলেছে, যার ঢেউ আজও এসে তাকে বিলক্ষণ বিচলিত ক'রে তোলে। এখানে সে থাকে তাই অত্যন্ত সংযতভাবে, যেন অনর্থক একটী কথাও ব্যয় না করতে হয়।

সে-দিনে এক ভদ্রলোকের মুখে সে বিলাতের গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিল। বইয়ে সে বিলাতের যে গল্প পড়েছে, সে নিছক গল্পমাত্র, এমন বিশদভাবে সে কিছুই জানতে পারে নি, জানার আকাঙ্ক্ষাও তাই তার মোটেই তৃপ্ত হয় নি—ক্ষুধা তাই তার বেড়েই চলেছিল।

পাঁচুর-মা এই সময়ে কলকাতায় চলে এলেন, গ্রামে আর তিনি একা থাকতে পারছিলেন না। পাঁচু প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছে—মানুষ না হ'য়ে সে শিমূলতলায় আর ফিরবে না, ততদিন সে-গ্রামে অত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে বাস করা পাঁচুর-মায়ের পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য মনে হচ্ছিল।

দেশে লোকের বাড়ী ধান-ভেনে চি ড়ে-কুটেও দিন চলতো, কলকাতায় এসে বাধ্য হ'য়ে শ্রীপতির বাড়ী তাঁকে দাসীর কাজ নিতে হ'ল।

এও ভালো, তবু তিনি প্রতিদিন একবার করে পাঁচুকে দেখতে পাবেন, মায়ের কাছে এ বড় কম সান্ত্বনার কথা নয়।

পাঁচু নির্ব্বাকে জলভরা চোখে কেবল মায়ের পানে চেয়ে থাকতো। পান হ'তে চুণটী খসলে শ্রীপতির স্ত্রী পাঁচুর-মাকে হাজার কথা শুনিয়ে দিতো।

চোখের জল চোখে শুকিয়ে পাঁচুর-মা মুখটী বুজে কাজ করতেন, রাত্রে পাঁচুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলতেন,—"দুঃখ কি বাবা, তুই যখন মানুষ হবি তখন আমার সব কষ্ট ঘুচবে, সেই আশায় আমি এখন সব দুঃখ সইব। তুই আগে মানুষ হ, নিজেও সুখি হবি আমাকেও সুখি করবি।"

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে পাঁচু নিঃশব্দে কেবল চোখের জল ফেলে। ম্যাট্রিকের ফল যখন বার হ'ল, দেখা গেল পাঁচু শ্রেষ্ঠ হ'য়েছে, সব বিষয়ে সে প্রথম হ'তে পেরেছে।

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

হেড-মাষ্টার মতিবাবুর আনন্দ ধরে না। তাঁর স্কুল থেকে এমন ভালো হ'য়ে কেউ কখনও পাশ হ'তে পারে নি, তাঁর স্কুল আর সকল স্কুলের অনেক পেছনে চাপা ছিল, পাঁচু তাঁর স্কুলকে সকলের সামনে তুলে ধরল।

মহানন্দে পাঁচুকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। সে মুহূর্ত্তে তাঁর মনে ছিল না পাঁচু জাতিতে নমঃশূদ্র, আর তিনি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ।



স্কুলের সকল মাষ্টারই পাঁচুর কৃতকার্য্যতায় গৌরবান্বিত হ'য়েছিলেন। সবাই তার অবস্থা জানতেন ; ফ্রি-তে সে পড়তো, মাষ্টারদের দয়ায় স্কুল-লাইব্রেরী হ'তে পড়ার বই পেত। তার খাতা পেন্সিল প্রভৃতি খরচ এঁরাই বহন করতেন।

সেই জন্যই তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন—সে এখন কি করবে ? অবশ্য তার এখন কলেজে পড়া চলতে পারে, কেন-না সে স্কলারশিপ পেয়েছে, তাতে তার পড়ার খরচ চলে যাবে। কিন্তু যদি সে কাজও করতে চায়, এই স্কুলেই কোন কাজ সে নিতে পারে।

পাঁচু বিনীতভাবে জানালে, সে আরও পড়বে। তার আশা আছে অপরিমিত, সে আশার সমাধি সে রচনা করতে পারবে না ; চাকরী করা তার মায়ের জন্যে কিন্তু মা যদি এতকাল কষ্ট ক'রে আসতে পারেন, আর কয়েকটা বছরও তেমনই কষ্ট সহ্য করবেন, তার পর সে মানুষ হ'য়ে মায়ের কষ্ট আগে দূর করবেই।

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বাড়ীতে শ্রীপতি দাস একখানা লাল-কাপড়ে-বাঁধানো মোটা খাতায় পেন্সিল দিয়ে হিসাবের অঙ্ক কষতে কষতে গম্ভীর মুখে বললে, "আর লেখা পড়া শেখার দরকারই বা কি? যে-টাকাটা এস্কোলারশিপ না-কিসের জন্য পেয়েছ, সেটা দিয়ে বরং দেশের বাড়ী ঘর মেরামত ক'রে নাও গিয়ে, মাথা-গুঁজবার জায়গাটা আগে কোরে নাও। দেশে আমার জমি-জমাগুলো বরং দেখাশোনা কর গিয়ে; তার জন্যে মাসে না-হয় দশটা কোরে টাকা দেওয়া হবে।"

পাঁচু একেবারে মুসরে পড়লো। শ্রীপতির কথার বিরুদ্ধাচরণ সে করতে সাহস পায় না,—যদি সে বাড়ীতে থাকতে না দেয়, তাকে আর তার মাকে তাড়ায়!

পাঁচুর-মা শ্রীপতির পায়ে ধীরে প্রার্থনা করলে, ওর কাজ করা এখন থাক, পড়তে চাইছে—পড়ুক। শ্রীপতি অত্যন্ত রাগ ক'রে বললে, "তবু একটা কাজ করতো, আমার উপকার হতো, বিনা-কাজে অত বড় একজন বুড়ো ছেলেকে বসিয়ে আমি খাওয়াতে পারব না।

এর পর পাঁচুর আর এ-বাড়ীতে থাকাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠল, অথচ সে-যে কোনও মেস বা বোর্ডিংয়ে আশ্রয় নেবে এমন অর্থও তার নেই।

এই সময়ে তার পরম বন্ধু হ'য়ে দাঁড়াল পরিতোষ নামে একটী ছেলে।

ধনীর একমাত্র ছেলে হ'য়েও সে গরীব পাঁচুকে অত্যন্ত ভালবাসতো। অন্য ছেলেরা পাঁচুকে ঈর্ষার চোখে দেখতো, পরিতোষ কোনদিন তাকে ঈর্ষার চোখে দেখেনি, অর্থ সম্পদের দিক দিয়ে না হোক, চরিত্র, সংযম প্রভৃতি কতকগুলি গুণের জন্য সে পাঁচুকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছিল এবং পাঁচুর একনিষ্ঠ ভক্ত হ'য়ে উঠেছিল।

পাঁচুর দুর্দ্দশার কথা শুনে পরিতোষ তাকে নিজের কাছে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলে। ধনী-বন্ধুর কাছ থেকে এতটুকু সাহায্য নিতে পাঁচু কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু তার উপায় ছিল না—সেইজন্য তাকে সাহায্য গ্রহণ করতেই হ'ল। পাঁচুর-মা রইলেন শ্রীপতির বাড়ীতে, পাঁচু পরিতোষের বাড়ীতে যাওয়ার সময় মায়ের পায়ের-ধূলো মাথায় দিয়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলে গেল, "রোজ না-হয় নাই দেখতে পেলে মা, তাই বলে যেন কান্নাকাটি করো না, আমি প্রতি রবিবারে একবার ক'রে এসে তোমায়

দেখে যাব। আশীর্ব্বাদ কর—অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েও আমি যেন মানুষ হ'তে পারি, তোমায় যেন সুখী কবতে পারি।" পাঁচুর-মা কেবল ঝর ঝর ক'রে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

আই-এতেও পাঁচু নাম রাখলে, সে সকলের প্রথম হ'ল এবং স্কলাবশিপ পেলে।

পরিতোষও পাশ হ'য়েছে ভালো-রকমে। এরা দু'জনেই সিভিল-সার্ব্বিস দেওয়াব জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিল। পাঁচুব কল্পনা পরিতোষকেও আচ্ছন্ন করেছিল।

ছেলের এই উচ্চ আশার কথা জানতে পেরে পরিতোষেব পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হ'য়েছিলেন। তিনি পরিতোষকে বিলাতে পাঠানোব জন্য প্রস্তুত হ'লেন।

কিন্তু পবিতোষ একা যাবে না, পাঁচুকেও তাব সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া চাই। সে পিতাকে জানালে, যদি তিনি পাঁচুব পড়া এবং থাকাব খবচও দেন তবেই সে যাবে, নচেৎ যাবে না। আর সেই অপরিচিতের মাঝখানে পাঁচুকে যদি সে পায় তা-হলে তার পড়া ঠিক হবে, নচেৎ তার পড়াও হবে না।

পরিতোষের পিতা-মাতা বিনয়ী ও শান্ত-স্বভাব। পাঁচুকে সত্যই ভালবেসেছিলেন, তার সাহচর্য্য সত্যই যে তাঁদেব ছেলের পক্ষে কল্যাণকর হবে তা তাঁরা জেনেছিলেন, সেই-জন্যই আনন্দের সঙ্গে পরিতোষেব প্রস্তাবে তাঁবা রাজী হ'লেন।

দুঃখিনী পাঁচুর-মা—

পাঁচু যখন বিদায়কালে তাঁকে প্রণাম করতে গেল তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন [illegible] কেঁদে উঠে তাকে দুই হাতে কোলের মধ্যে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

কতদিনে [illegible] কে জানে—কবে সে ফিরবে, আবার তাঁকে মা বলে ডাকবে! হয়তো সে যখন [illegible] মা তখন এ পৃথিবীতেই থাকবেন না, সে এসে আর তার মাকে দেখতে পাবে না।

পাঁচুও [illegible]কখানি চোখের জল ফেললে। কিন্তু সে সেই ছোটবেলাকার অপমানের কথা ভোলে নি, সে প্রতিজ্ঞা প্রতিদিন আরও শক্ত হয়ে উঠেছে। পাঁচুকে ভগবান সুযোগ দিয়েছেন, এ-সুযোগ সে হারাবে না; সে বিলাতে যাবেই, সে হাকিম হয়ে ফিরবেই।

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে পাঁচু একদিন বিলাতের পথে পা-বাড়ালে।

চুলোয় যাক সব,—সে মানুষ হ'য়ে ফিরবে, মাকে সে সুখী করবে, মাকে সে হাকিমের-মা নামে পরিচিত করবে।

(৩)

কয়েকটা বছর এলো আর চলেও গেল।

দিনগুলো যে কেমন ক'রে এলো আর কেমন ক'রে কেটে গেল পাঁচুর-মা জানেন না।

এ-সব দিনের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই—বৈচিত্র্য থাকবে সেইদিন যেদিন তাঁর পাঁচু তাঁর কাছে ফিরে আসবে।

পাঁচু প্রত্যেক 'মেলে'ই দীর্ঘ পত্র দেয়, সে-পত্রে তার প্রতিদিনকার খুঁটিনাটী জীবনযাত্রার অনেক কথাই লেখা থাকে। মা এ-সব জানতে চান, কেবল "আমি ভাল আছি" এ-খবর পেয়ে তাঁব মন খুসি হতে পারে না।

পাঁচু লেখে, যে-পরিবারে তারা রয়েছে সেই পরিবারে একটী মেয়ে আছেন যাঁর চোখ-দুটি ঠিক তার মায়েবই মত, সেইজন্য পাঁচু তাঁকে মা বলে ডাকে, তিনিও পাঁচুকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। মায়ের মনে পরম তৃপ্তি আসে, তিনি চোখ বুঁজে হাত দু'খানা কপালে রেখে সেই অচেনা দেশের অচেনা মেয়েটীর কল্যাণ প্রার্থনা করেন। পাঁচুর মায়ের অভাব সে মিটিয়েছে, পাঁচুকে সে ভালোবাসে, পাঁচুকে য[illegible]।

পাঁচুর সমস্ত পত্রগুলো বুকের পাঁজরের মতই জমে থাকে [illegible]নের বাক্সের মধ্যে একখানি কাপড়ের ভাঁজে। মাঝে মাঝে সেগুলো বার ক'রে বুকে তুলে নেন, মনে হয় পাঁচু ফিরে এসেছে, তারই স্পর্শ মা এ-গুলোর মধ্যে পান।

অবশেষে সত্যই সে-দিন এলো, পত্র এলো পাঁচু ফিরছে—

মায়ের চোখে জল ঝ'রে পড়ল। আসছে তার পাঁচু; সেখানে সে সম্মানের সঙ্গে যেদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংবাদ দিয়াছিল, মা সেদিন চুপি চুপি বাড়ীর বার হ'য়ে গিয়ে কালীতলায় পূজো দিয়ে এসেছিলেন। সেই একটুখানি দেরীর জন্য তাঁকে কত না লাঞ্ছনা সইতে হ'য়েছিল বাড়ীতে, সেদিনের কথা আজও তাঁর মনে পড়ে।

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সবস্বতী

মা ঠিক কবলেন, পাঁচু এলে সে যেদিন তাঁকে নিয়ে যাবে সেইদিন কালীতলায় তিনি বুকেব বক্ত দিয়ে পূজো ক'বে যাবেন।

পাঁচু যেদিন এসে পৌঁছাল সেদিন মায়েব আনন্দেব শেষ রইল না।

পবিতোষ এসেই পাঁচুকে পাঠালে তাব মাকে আনবাব জন্য।

মা ছেলেব মিল হ'ল পবিতোষেব বাড়ীতে। মায়ের চোখ দিয়ে যতখানি জল ঝ'বে পড়ল, পাঁচুর চোখ দিয়ে তার চেয়ে বড় কম জল ঝবে নি।

তাবা ফিরবাব কযেকদিনেব মধ্যেই নিয়োগ-পত্র পেলে—পাঁচু এবং পরিতোষ দু'জনেই দুইটী জেলাব হাকিমেব পদ পেয়েছে; পাঁচু বর্দ্ধমান জেলায় ও পবিতোষ মুর্শিদাবাদ জেলায়।

কালীতলায় মহাসমাবোহে ষোড়শোপচাবে পূজো দিয়ে মা চললেন পাঁচুর সঙ্গে তাব কর্ম্মস্থলে। পাঁচুব প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েছে, পাঁচুব মায়েব আশা পূর্ণ হ'য়েছে—পাঁচু আজ হাকিম। নমঃশূদ্র বলে আজ কেউ তাকে ঘৃণা কবতে পাবলে না, পবম সমাদরে সে সকলেব দ্বাবা গৃহীত হ'ল।

(৪)

শিমূলতলাব স্কুলে প্রতি বছরকাব মত এ বছবও প্রাইজ-বিতরণ হবে।

কত বছব পরে এবাবও জেলার হাকিম আসছেন পুবস্কার বিতরণ করতে।

শিমূলতলাব স্কুলে এ একটা চিরস্মবণীয় ঘটনা। কুড়ি বছর আগে একবার এক হাকিম স্বহস্তে শিমূলতলাব স্কুলেব ছেলেদেব পুরস্কাব বিতবণ ক'বে গেছেন, সে কথাটা আজও এখানকাব লোকেব মুখে মুখে গল্পেব আকারে ফেরে।

কুড়ি বছব পবে আবার একজন হাকিম আসছেন পুরস্কার দিতে।

কুড়ি বছব আগে স্কুল যেমন সাজানো হ'য়েছিল এ-দিনও স্কুলে তেমনি সাজানো হ'ল—হেড-মাষ্টার ননী চৌধুরী আজও আছেন, অন্য মাষ্টারেবা দু'জন বাদে আব সবাই আছেন। কুড়ি বছর আগে যারা স্কুলে পড়তো আজ তাবা সংসারী গৃহস্থ, তবু তারাও আসবে ঐ উৎসবে যোগ দিতে।

হাকিমেব গাড়ী এসে দাঁড়ালো। মোটব হতে নামলেন হাকিম নিজে ও আর

আহরিকা

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

একটী বৃদ্ধা,—শোনা গেল ইনি তাঁর মা। মাতৃভক্ত হাকিম যেখানেই যান তাঁর মা সঙ্গে থাকেন, মাকে ছেড়ে ইনি কোথাও যান না।

হাকিমের মায়ের স্থান হ'ল পর্দ্দার আড়ালে মেয়েদের মধ্যে—মেয়েরা সসম্ভ্রমে স'রে বসে এই রত্নগর্ভা নারীর পানে চেয়ে রইল।

মুখখানা পরিচিত বলে মনে হয় না ? কিন্তু না—সে নয়।
পাঁচুর-মায়ের সেই বোকা ছেলে পাঁচু হাকিম হ'য়ে এসে পুরস্কার দেবে এ-যেন হাত বাড়িয়ে চাঁদ-ধরার মত কথা।

পুরস্কার বিতরণ হ'য়ে গেল, হাকিম কিছু বলবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "প্রিয় স্কুলের ছেলেরা, আজ আমি তোমাদের কিছু বলতে এসে এ-কথা কখনও বলব না যে, তোমরা কেউ কেউ একদিন আমারই মত হাকিমের আসনে বসবে এবং আমার চেয়েও কেউ কেউ বড় হবে—এই শেষ নয়—আমি তোমাদের শুধু এই কথাটী বলি, তোমরা মানুষ হ'তে চেষ্টা কর, তোমরা যে-কোন রকমে মানুষ হও। তোমরা শুনে আশ্চর্য্য হবে যে কুড়ি একুশ বছর আগে আমার জীবনের প্রারম্ভে একজন আমায় এই হাকিমী-পদটাই জীবনের চরম লক্ষ্য বলেই নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন; মানুষের জীবনে হাকিমী-পদটাই আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেনেছিলুম এবং এই পদ লাভ করবার জন্যে কঠোর প্রতিজ্ঞাও ক'রেছিলুম। এর জন্যে আমায় কত নির্য্যাতন সইতে হ'য়েছে, কত অপমান সইতে হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই—সেইজন্যই আমি বলছি, তোমরা আমার পানে তাকিয়ে আমারই বাল্যের স্বপ্ন-বীজ মনে বপন ক'রো না। প্রিয় ছেলেরা, তোমরা শুনে আরও আশ্চর্য্য হবে, আমি তোমাদের এই গ্রামেই জন্মেছি, এই স্কুলেই পড়েছি, নির্য্যাতীত নিগৃহীত এইখানেই হ'য়েছি। নীচজাতির ছেলে আমি, আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে আমায় গ্রাম হ'তে চিরকালের মতই তাড়িত হ'তে হ'য়েছিল।

হাকিম হেড-মাষ্টারের পানে ফিরলেন—হেড-মাষ্টার ও মাষ্টারদের অবস্থা তখন অতি কাহিল, এবারে তাঁরা স্পষ্ট চিনতে পারলেন।

হেড-মাষ্টারের পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে, অন্যান্য মাষ্টারদের প্রণাম ক'রে হাকিম বললেন, "আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়েছে স্যার, আমিই আপনাদের এখানকার নরহরি দাসের ছেলে পাঁচু,—এখন বোধ হয় চিনতে পারবেন।"

প্রতিজ্ঞা পালন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পাঁচু—পাঁচু— ।

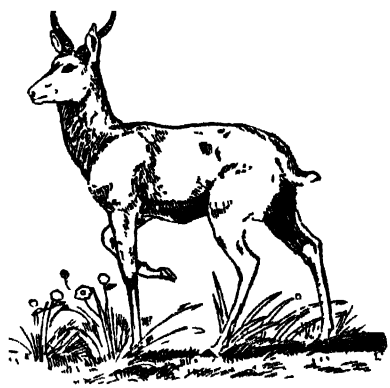
চারিদিক হ'তে আনন্দ-কোলাহল উঠলো—সেই পাঁচু—তাদের পাঁচু ; গ্রামের পাঁচু, সে আজ ফিরে এসেছে হাকিম হ'য়ে।

বৃদ্ধ হেড-মাষ্টার হাতযোড় ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন, পাঁচু তাঁর হাত ধরে ফেললে, "আপনাকে আমি চিরদিনই ভক্তির পাত্র মনে করি ; আমি আপনার ছাত্র, আপনাদের পাঁচু। দেশের কাছে হাকিম হ'লেও আপনারা আমায় হাকিম মনে করবেন না, আমায় সেই পাঁচু বলেই মনে করুন—"

সমবেত-কণ্ঠে চীৎকার উঠল—"পাঁচু—আমাদের পাঁচু—"

ভেতরে পাঁচুর-মাকে নিয়েও টানাটানি চলছিল। সবাই তখন ভুলে গেছে, পাঁচু জাতিতে নমঃশূদ্র—একদিন এই পাঁচুকে তারা অপমান ক'রে গ্রাম হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ সে পাঁচু নয়, সে সুনীল দাস—সে জেলার হাকিম।





স্বর্ণ পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

জমিদার-বাড়ীতে সামিয়ানা খাটিয়ে প্রকাণ্ড আসর কবা হ'য়েছে।

জমিদার-গিন্নির জগদ্ধাত্রী পূজো। সেই উপলক্ষে দূরদেশ থেকে যাত্রাব দল এসেছে—তারা প্রহ্লাদ-চরিত্র পালা গাইছে। চিকেব আড়ালে জমিদাব-গিন্নি কেঁদে আকুল। এমন মিষ্টি-গলায় যাত্রায় হবিনামেব গান এ-অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বে আব কেউ শোনে নি।

আট দশ বছরের ফুট্‌ফুটে দিব্যি ছেলেটি। আহা, যখন গায়—চোখে জল না-এসে উপায় নেই।

শুধু জমিদার-গিন্নি কেন—ভেতরে বাইরে যে যেখানে বসে যাত্রা শুন্‌ছিল—আঁচলের খুঁটে ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগ্‌লো।

পালা শেষ হবার তখনও অনেকটা বাকি—তখন সেই দৃশ্যের অভিনয় হচ্ছিল, যেখানে গলায় পাথর বেঁধে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়েও প্রহ্লাদের প্রাণনাশ করা গেল না।

সেই সময় প্রহ্লাদ হাত-জোড় করে যে করুণ গান গাইতে লাগলো, তা শুনে—অতি বড় শক্ত যে প্রাণ তার চোখ ফেটেও জল এলো।

অভিনয়ের গুণে সমবেত জনতা বাহবা দিতে পর্য্যন্ত ভুলে গেল। জমিদারের নায়েব দাঁড়িয়ে উঠে আসরের সকলকে জানিয়ে দিলেন যে, জমিদার-গিন্নি প্রহ্লাদের অভিনয় দেখে খুসী হ'য়ে তাকে কাল একটা স্বর্ণ-পদক দান করবেন।

স্বর্ণ-পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সমবেত দর্শকদল এইবার চোখের জল মুছে ফেলে তাদের আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করলে।

পরদিন সকালবেলা গ্রামের ছেলের দল এসে জমিদার-বাড়ীতে ভীড় জমালে।

তারা প্রহ্লাদকে দেখ্‌বে।

প্রহ্লাদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে রাত্তিরে তাদের কারো চোখে আর ঘুম ছিল না। তারা যদি অমনি প্রাণ-মাতানো গান গাইতে পারতো!

এত লোকের প্রশংসা—তার' পর স্বয়ং জমিদার-গিন্নি আজ তাকে সোনার মেডেল দেবে।

বংশী বল্লে, হ্যারে গুপে,—ওকি আমাদের সঙ্গে কথা কইবে?

গুপী ভয়ে ভয়ে বল্লে, তাইত, সে কথা ত' একবারও ভেবে দেখিনি!

দামোদর ছেলেটি একটু গোয়ার-গোবিন্দ গোছ্‌। সে বল্লে, কথা কইবে না কেন? যদি না কইতে চায় ত' মারবো এমন গাঁট্টা—

সিধু ভয়ে শিউরে উঠে বল্লে, কি যে বলিস্‌ তুই! কাল দেখলি নে কত বড় একটা হাতি ওকে পায়ে দলে চলে গেল তবুও মরল না। হরি-ঠাকুর যাদের সহায়—তাদের এ-জগতে কাউকে ভয় নেই—তা জানিস্‌?

সবাই তখন সিধুর কথায় সায় দিয়ে বল্লে, ঠিক বলেছিস্‌ তুই সিধু। এই দামোদর গোঁয়ার-গোবিন্দটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমাদের ভাল হয় নি। যা, তুই পালা—

সকলের কথা শুনে দামোদরও কেমন যেন ঘাব্‌ড়ে গেল—তাইত! যদি সত্যিই হরির কৃপা ওর ওপর থাকে—আর সে যদি তাকে গাঁট্টা মারতে যায়—কিছুই ত' আগে থাকৃতে বলা যায় না!

কালকের নৃসিংহ-অবতার এসে যদি ওকে চেপে ধরে—তখন প্রাণ বাঁচানো দায় হ'য়ে উঠ্‌বে!

ভয়ে ভয়ে সে আর কোন কথা কইলে না।

*　　*　　*　　*

যার সম্বন্ধে ছেলেদের এত ভয় ও ভাব্‌নার অন্ত ছিল না—সেই প্রহ্লাদেরও তখন ভাব্‌নার কোনো কূল-কিনারা ছিল না। প্রহ্লাদ নয়—ছেলেটির নাম বিশু।

আহরিকা

স্বর্ণ-পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বিশু বসে তখন তার মার কথাই একমনে ভাব্‌ছিল। বিশুরা বড্ড গরীব—একেবারে দিন চলে না। এ-বেলা খেতে পায় ত' ও-বেলা পায় না—এম্‌নি তাদের অবস্থা!

আস্‌বার সময় মাকে জ্বরে ধুঁক্‌তে দেখে এসেছে। তাকে দেখবার কেউ নেই—তবু তাকে আস্‌তে হয়েছে—কেন-না যাত্রা-দলের অধিকারী টাকা দিলেই তবে ওর মার মুখে একটু ওষুদ পড়্‌বে।

আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বারবার তার মার মুখখানিই মনে হতে লাগ্‌লো।

একলা কুঁড়ে ঘরে মা শুয়ে—হয় ত' জ্বর আরও বেড়েছে। অজ্ঞান অবস্থায়—বারবার বিশু বিশু বলে ডাকছে কি না তাই বা কে বল্‌তে পারে। ও-পাড়ার দামিনী পিসি যদি এসে একবার দেখে যায়! কিন্তু তারও ত' ছেলেপুলের সংসার! সময় পাবে কিনা—হয় ত' বিকেলের মুখে একবার আস্‌বে। কিন্তু তার আগেই যদি তার মা এক ফোঁটা জলের জন্যে মাথা খুঁড়েও মরে ত, এক গেলাস জল গড়িয়ে দেবার কেউ নেই—শেষটায় যদি সত্যি-সত্যিই—ভাবতেই সে শিউরে উঠ্‌ল।

কাল রাত্তিরের এত লোকের প্রশংসা—জমিদার-গিন্নির সোনার মেডেল দেয়ার কথা—সব সে এক মুহূর্ত্তে ভুলে গেল। না, এখানে আর কোন মতেই তার থাকা চল্‌বে না। সে পাগলের মতো ছুটে একবারে অধিকারীর ঘরে গিয়ে হাজির হ'ল।

সমস্ত রাত্রি জাগার পর দলের লোকদের তখন সবে মাত্র ঘুম ভেঙেছে। তারা সবাই অধিকারীকে মাঝখানে রেখে—আগের দিনের পালায় নিজ নিজ ক্যারামতির কথা ব'লে আসর জমাবার চেষ্টা করছিল—এমন সময় বিশু সেইখানে গিয়ে হাজির হ'ল।

হুঁকো হাতে অধিকারী-মশাই সকলের কথাই শুন্‌ছিলেন আর ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ তামাক খাচ্ছিলেন। বিশুকে আস্‌তে দেখে বল্লেন, কিরে পেল্লাদ, কাল খুব লোককে কাঁদিয়েছিস্। জমিদার-গিন্নি ত' খুব খুসী। ওরে জনার্দ্দন, শোন্—দ্যাখ্—আজ বিশুকে দুটো মাছ দিস্—আর আমার বরাদ্দ থেকে একটু দুধও ওকে দিস্। কিরে বিশু, এবার খুসী হ'য়েছিস্?

স্বর্ণ-পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বিশু কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে বল্লে, না অধিকারী-মশাই, আমি দুধ মাছ খেতে চাই নে—আমার মা এক ফোঁটা জলের জন্যে কাত্‌রাচ্ছে—আমি আর এখানে থাক্‌তে পার্‌বো না—তুমি আমায় ছুটি দাও।



অধিকারীর হাতের হুঁকোর কল্কেটা উল্টে পড়ে গেল।

—ছুটী!—অ্যাঁ, তুই বলিস্ কি? জমিদার-গিন্নি কাল তোকে সোনার মেডেল দিলে—তারপর পালা শেষ হ'বার পর আমায় ডেকে নিয়ে বল্লে, অধিকারী, তোমার 'পেহ্লাদ-চরিত্তির' আর একদিন শুন্‌বো—আর তুই বলিস্ কিনা ছুটি চাই—! আমি তাহ'লে তার সাম্‌নে মুখ দেখাবো কি ক'রে! এদ্দুর থেকে টাকা-পয়সা খরচ ক'রে তোকে নিয়ে এলাম—আমার হাতে হাতকড়ি পরাতে চাস্, নয়? যা নচ্ছার ছেলে—ছুটি-টুটি হবে না—সে আমি তোকে সোজা কথা বলে দিলাম।

অধিকারীর কথা শুনে বিশুর দু' চোখ ফেটে জল আস্‌তে লাগ্‌লো—সে ছুটে বাইরে চলে এলো।

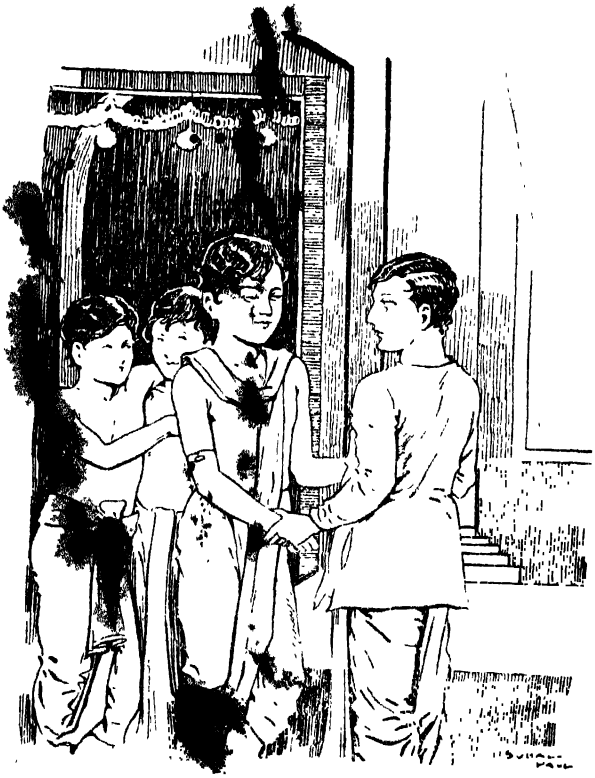
তখনোও ছেলের দল—প্রহ্লাদের সঙ্গে কথা কইবে এই আশায় উন্মুখ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বংশী এইবার প্রহ্লাদকে একা দেখতে পেয়ে সাহস করে দু' পা এগিয়ে এসে শুধোলে, হ্যাঁ ভাই প্রহ্লাদ, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা কইবে?

স্বর্ণ পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

সিধু বল্লে, প্রহ্লাদ ভাই, তুমি আমাদের ভালোবাস্‌বে ? ডান্‌পিটে দামোদরটাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।—জমিদারের ছেলেও সেই দলে ছিল। সে প্রহ্লাদের হাত হু'খানি ধ'রে বল্লে, তুমি কি ক'রে এত সুন্দর গান গাইতে শিখ্‌লে ?—আমায় যদি তোমার হরির গান শেখাও ত' মাকে ব'লে আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা গেয়ে বেড়াবো। কী মজা হ'বে তখন ! শেখাবে আমাকে ?



বংশী বল্লে, তাহলে—আমাকেও তোমাদের সঙ্গে নিয়ো—আর পূর্ণ পণ্ডিতের বেত খেতে হবে না—সকাল সন্ধ্যে বই নিয়ে ব'সে শুভঙ্করী মুখস্থ ক'রতে হবে না। আমরা তিন জনে দেশ-বিদেশে ঘুরে ঘুরে যাত্রা-গেয়ে বেড়াবো। যে শুন্‌বে সেই আমাদের খাতির কর্‌বে। আমাদের গুণের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়াবে। হয়ত কত জনে আমাদের সোনার মেডেলই দেবে।

বিশু তাদের কথার কোনো জবাব দিতে পার্‌লে না, ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্লে।

ছেলের দল ফিরে যেতে-যেতে বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো—ও হয়ত দিন রাত ওর কেষ্টর কথাই ভাবে—নইলে দেখলি নে—ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেল্লে !

সিধু, চুনি শুনে বল্লে, আরে না—পাছে আমাদের গান শেখালে ওর আদর কমে যায়, সেই জন্যে আমাদের সঙ্গে ভাব কর্‌তে চাইলে না, বুঝলি ?

স্বর্ণ-পদক

শ্রীঅখিল নিয়োগী

বংশী বল্লে, দূর বোকা, তা হবে কেন? গলায় পাথর বেঁধে দিলেও হরির দয়ায় যে ডুবে মরে না, তার আবার কখনও আদর কমে? তা নয়—ও সব-সময় ওর হরির কথাই ভাবে কিনা;—কাল রাত্তিরেও ও নিজে কাঁদলে আর সবাইকে কাঁদিয়ে মারলে—আজ সকালেও তাই। ঠাকুমা বলেছেন—হরিঠাকুর যাকে ভালবাসে তাকে দিন রাত্তির কাঁদায়। আমি কি করবো জানিস্?

সবাই উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, কি—কি? বংশী এদিক ওদিক চেয়ে গলাটা খাটো করে বল্লে, ও-বেলা এসে, কোন রকমে ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে ওর মাথার এক-গাছি চুল চেয়ে নেবো।

দামোদর এতক্ষণ দল ছেড়ে পুকুর-পাড়ের বারোমেসে জামরুল গাছটায় চড়ে আপন-মনে কাঁচা পাকা জামরুল চিবুচ্ছিল—সেও এসে জুটেছে। চুলের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে সে বল্লে, আরে—চুল দিয়ে কি করবি তোরা? তারপর আপন মনেই চীৎকার করে উঠল, ও, বঁড়শীর মতো করে মাছ ধরবি বুঝি?

বংশী শিউরে উঠে উদ্দেশে জোড়হাতে প্রণাম করে বল্লে, যাদের পুণ্যের শরীর তাদের বুঝি অম্নি করে বলে? ছিঃ, ঠাকুমা বলেন, ওতে পাপ হয়।

সিধু এতক্ষণ অবাক হ'য়ে ওদের কথা গিল্‌ছিল। এইবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস্ কল্লে, হ্যাঁ বংশী, চুলের কথা কি বল্‌লি?—ওর চুল নিলে কি হবে?

বং[illegible] নিজের মুখখানা যথাসম্ভব জ্ঞান-বৃদ্ধের মতো করে বল্লে, যাদের পুণ্যের শরীর তাদের [illegible] সঙ্গে থাকলে কখনো আপদ-বিপদ হয় না। ঠাকুমা বলেছেন—তাদের ছেলে[illegible] এক সিদ্ধবাবা ছিল—তার একগাছা দাড়ির চুল দিয়ে মাতুলী করে গলায় পর[illegible]অসুখ-বিসুখ সেরে যেতো।

[illegible]র এইবার লাফিয়ে উঠে বল্লে, হয়েছে—আমিও একগাছা চুল চেয়ে নিয়ে আসবো। যেদিন অঙ্কের পড়া হবে না, পুণ্য পণ্ডিতের ঘণ্টায় ঐ চুল দিয়ে মাতুলী তৈরী করে তাই [illegible] বেঁধে ইস্কুলে যাবো, পুণ্য পণ্ডিত আমায় দেখতেই পাবে না—মাতুলীর গুণে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে থাকবো।

* * * *

জমিদার-গিন্নির আগ্রহে সেদিন রাত্তিরে আবার প্রহ্লাদ-চরিত্র পালা গাওয়া

স্বর্ণ-পদক

শ্রীঅখিল নিযোগী

আজ যেন পালাটা আরও জমেছে। প্রহ্লাদ গান গাইতে গাইতে কেঁদে আকুল! যত প্রহ্লাদ কাঁদে—দর্শকদল কাঁদে তাব চাইতে আবো বেশী। শেষের দিকে নায়েবমশাই উঠে নিজের হাতে জমিদার-গিন্নির দেওয়া সোনাব মেডেল প্রহ্লাদেব গলায় পরিয়ে দিলে। সমস্ত আসর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। পালা শেষে জমিদার-গিন্নি প্রহ্লাদকে অন্দরে ডেকে পাঠালেন —বল্লেন, আজ আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোমায় খাওয়াবো বাছা। কামিনী, আমার ঘবের দাওয়ায় ওব ঠাঁই কবে দেতো। জমিদাব-বাড়ী। দাসী-বাঁদীর অভাব নেই। জমিদাব-গিন্নির ডাকে দশটা ঝি, চাকব ছুটে এসে খাবার জায়গা করে দিলে। বাটীতে বাটীতে নানাবকম খাবাব যা' আস্তে লাগ্লো, তা কখনো চোখে দেখা ত' দূরের কথা, বিশু তাব নামই শোনেনি।

জমিদার-গিন্নি বল্লেন, লজ্জা কি বাবা, খেতে বোসো। যেটা তোমার ভালো লাগ্বে, আবাব চেয়ে নেবে—আমায় তোমাব মাব মতো মনে কববে—বুঝ্লে?

পাতে বসে প্রথম গ্রাস মুখে দিতে গিয়েই মায়েব রোগ-মলিন মুখখানি বিশুব মনে পড়ে গেল।

সে আজ জমিদার-বাড়ী ত্রিশ ব্যঞ্জন দিয়ে খেতে বসেছে আর তার রোগক্লিষ্ট উপোসী মা হয়ত অনাহাবে—তারই পথ চেয়ে বসে আছে।



বিশুর চোখের জল টপ্ টপ্ করে জমিদার-গিন্নির দেওয়া সোনার মেডেলের উপর ঝরে পড়তে লাগ্লো।

খাওয়া আর তার হ'ল না।



রায় মহাশয়ের গল্প

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আমি যখন তোমাদের মত ছিলাম, অর্থাৎ আমার বয়স যখন তোমাদের বয়সের মত ছিল, তখন আমাদের বাড়ীতে একটি আত্মীয় মাঝে মাঝে আসতেন,—তাঁর নাম, ধর "রায় মহাশয়"। রায় মহাশয় ভারি আমুদে লোক ছিলেন; বয়স ছিল আমার বয়সের মত বেশী, কিন্তু মনটী ছিল তোমাদের মনের মত সরল। মুখে হাসি লেগেই থাকৃত, আর কণ্ঠে গুন্ গুন্ শব্দে গান। তামাক খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন; ভুড়ুক-ভুড়ুক ক'রে সর্ব্বদাই তামাক খেতেন, আর তার ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের মজার মজার গল্প ব'লে শোনাতেন।

আজ রায় মহাশয়ের কাছে-শোনা একটা গল্প মনে পড়ছে। তোমাদের সে গল্পটা শুনিয়ে দিই।

এক ছিল পশ্চিমা-সওদাগর, বয়স ছিল তার কম-বেশি ষাট বছর। দীর্ঘাকৃতি কৃশ মানুষটির মন ছিল অত্যন্ত সরল, কিন্তু সেই মনের মধ্যে বুদ্ধি ব'লে যে জিনিষটি থাকে সেটি ছিল একেবারে ভোঁতা, অর্থাৎ সাদা কথায় লোকটী ছিল নেহাৎ বোকা।

ব্যবসাতে লোকসান তাকে প্রায়ই দিতে হয়। কাজ শিখ্‌তে-শিখ্‌তে আর পাকা হ'তে-হ'তেই সে বুড়ো হ'য়ে গেল। লোকে কিছু বল্‌লে বলে, ব্যবসা কি সহজ জিনিষ রে ভাই? লাভ হঠাৎ করলেই হ'ল আর কি? বুদ্ধি যে তার ধারাল নয়, এ কথা কিন্তু প্রাণান্তে কারও কাছে সে স্বীকার করে না।

সক্কাল-বেলা তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে দিল্লীর চাঁদনী-চক্-বাজারে গিয়ে সে তার ছোট খাট দোকানটি খুলে বসে। তার পর সারাদিন সেখানে বেচা-কেনা ক'রে

রায় মহাশয়ের গল্প

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

নেভাতে গিয়ে একটু-একটু যা দাড়ি রয়ে গেল, তাতে মুখের শোভা হ'ল অপূর্ব্ব ! নিকটেই ছিল সওদাগরের মেয়ে, সে বাপের কাতরোক্তি শুন্‌তে পেয়ে ছুটে এল।

"কি হ'ল বাবা ?"

"কিছু নয় মা।" যন্ত্রণায় কিন্তু দুই চোখ জলে ভরা।

"ও কি বাবা ! তোমার দাড়ি কি হ'ল ?"

দাড়িতে হাত বুলোতে-বুলোতে সওদাগর বল্‌লে, "কিছু হয় নি, ঝ'রে গেছে।"

"ঝ'রে গেছে ? কি ক'রে ঝ'রল ?"

"দাড়িতে ওষুধ লাগিয়েছিলাম, তাই ঝ'রে গেছে।"

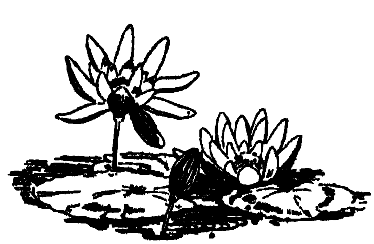
"উঃ ! গন্ধ কিসের ? কি বিশ্রী চুল-পোড়া গন্ধ।"

"ও ওষুধের গন্ধ ; চুল কি পোড়ে মা ? পোড়ে না। পুড়লেও এতদূর থেকে কখনো পোড়ে ? যা ত' মা, শিগ্‌গীর একটু নারকেল-তেল নিয়ে আয়। উঃ, বড্ড জ্বল্‌ছে !"

"কি জ্বলছে বাবা, দাড়ি ?"

"দাড়ি নয় মা, মাথা। মাথা ঠাণ্ডা হ'লে দাড়িও ঠাণ্ডা হবে।" সওদাগরের মেয়ে যখন নারিকেল তেল নিয়ে এসে হাজির হ'ল, তখন সওদাগর বইখানা বেঁধে ফেলেছে। মেয়ের হাতে সেটা দিয়ে বল্‌ল, "এটা আলমারীতে তুলে রাখ্‌গে মা; তোরা কখনো যেন খুলে পড়িস্‌নে।"

মেয়ে চলে গেলে, দাড়িতে তেল মাখিয়ে, সওদাগর বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল ; মনে মনে বল্‌ল, "বইয়ে যে কথা লেখে তা কি আর মিথ্যে লেখে ! দু' মুঠোর বেশি লম্বা যাদের দাড়ি, সত্যই দেখ্‌ছি তারা বড় বেওকুফ্‌ হয়।"





কৃপণের দান

শ্রীকালিদাস রায়

(বৌদ্ধজাতক হইতে)

বাজগৃহের নিকটে শর্করা-নিগম নামে এক গণ্ডগ্রামে কৌশিক নামক এক ধনী ব্যক্তি বাস করিত। সে এত কৃপণ ছিল যে, প্রাতঃকালে কেহ তাহার নাম করিত না—জীবনে কখন একটি কপর্দ্দকও কাহাকেও দেয় নাই—এক মুষ্টি অন্নও কোন ক্ষুধার্ত্তকে দান কবে নাই। পিতা প্রচুব অর্থ রাখিয়া গিয়াছিলেন—তাহাই আগলাইয়া জীবন কাটাইয়া দিত—পিতৃ-পিতামহ সাততালা বাড়ী বাখিয়া গিয়াছিলেন—জীবনে কখনও তাহা মেরামত করে নাই।

এই কৌশিক একদিন পথের ধাবে এক ভিক্ষুককে পিঠা খাইতে দেখিয়াছিল। পিঠা খাইতে দেখিয়া তাহারও পিঠা খাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু পিঠা খাওয়া ত' সোজা কথা নয়, চালের গুঁড়া চাই, ঘৃত চাই, ক্ষীর চাই, গুড় চাই। অনেক খরচ - তাহা ছাড়া পিঠা খাইতে চাহিলে বাড়ীশুদ্ধ লোক সকলেই পিঠা খাইতে চাহিবে—তাহা হইলে একদিনেই ফতুর। এই সব ভাবিয়া কৌশিক মনের বাসনা মনেই গোপন করিয়া রাখিলেন, কিন্তু এই যে বাসনার সংযম—এরূপ তাঁহাকে কখনও করিতে হয় নাই—কারণ কখন কোন সাধ বাসনাই তাহার মনে জাগে নাই। এই সংযমে কৌশিকের ভীষণ তপস্যা আরম্ভ হইল। কৌশিক মনের স্বস্তি ও শান্তি হারাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—আহারে রুচি গেল—রাত্রে নিদ্রা হয় না—কেবলই আর্ত্তনাদ করেন—ক্রমে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল—

কৃপণের দান

শ্রীকালিদাস রায়

চুল পাকিতে লাগিল—হাতে, পায়ে শিরা ধমনী বাহির হইয়া পড়িল,—বুকের পাঁজরা ঠেলিয়া উঠিল।

কৌশিকের স্ত্রী স্বামীর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"আর্য্যপুত্র, বলুন আপনার কি অসুখ ?"

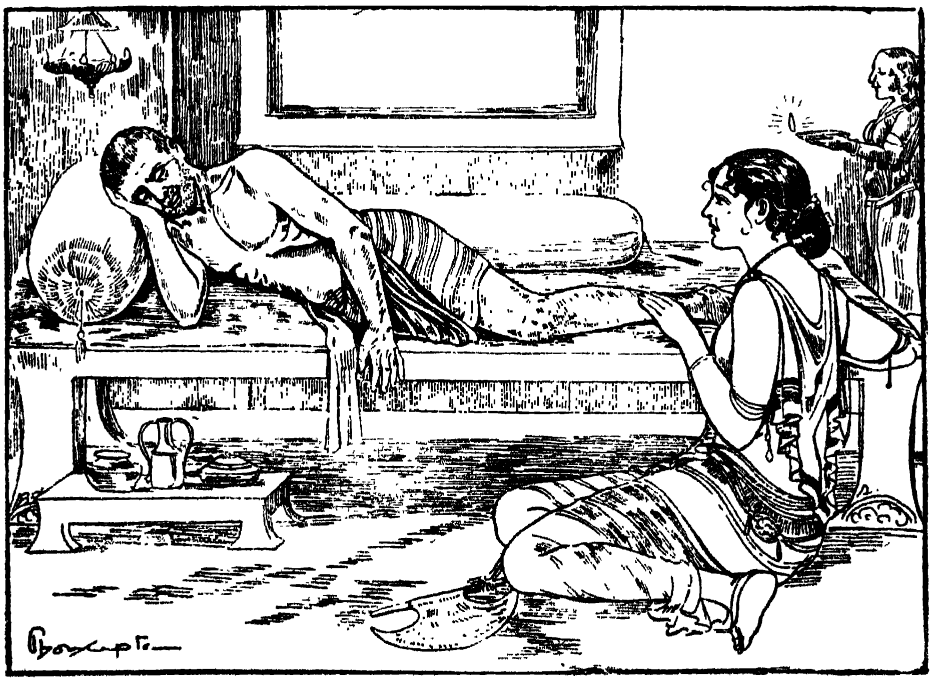
কৌশিক···আমার কোন অসুখ হয় নি।

পত্নী··তবে কি রাজা আপনার উপর কোন কারণে রাগ করেছেন ?

কৌশিক···না, রাজা কেন রাগ ক'রবেন ?

পত্নী···তবে কি পুত্র-কন্যা কি দাসদাসী কেউ এমন কিছু অন্যায় কাজ করেছে ?

কৌশিক··না, তারা কোন অন্যায় কাজ করে নি।



পত্নী···তবে আমি কি অজ্ঞাতসারে কোন বিরক্তি উৎপাদন করেছি ?

কৌশিক···না, তুমি কোন অপরাধই কর নি।

কৃপণের দান

শ্রীকালিদাস রায়

পত্নী··তবে কি আপনার কোন সুখাদ্য খেতে সাধ হয়েছে ?

কৌশিক কোন উত্তর দিল না। চুপ করিয়া রহিল। পত্নী বুঝিলেন—স্বামীর কোন দ্রব্য খাইতে সাধই হইয়াছে।

পত্নী···আপনার কি খেতে ইচ্ছা হয়, বলুন না ?

কৌশিক···সত্যি কথা বলতে কি গৃহিণী, আমার পিঠা খেতে ইচ্ছা হ'য়েছে।

পত্নী···এই ব্যাপার! এজন্য এত হাহাকার কেন? আপনার অভাব কি? আজই আমি এত পিঠা তৈয়ার করছি--সমস্ত গ্রামের লোক খেয়েও ফুরুতে পারবে না।

কৌশিক···সর্ব্বনাশ! গ্রামশুদ্ধ লোককে পিঠা খাওয়াবে নাকি? না না, পিঠা খাওয়ার দরকার নেই।

পত্নী···আচ্ছা, তবে পাড়ার লোকের জন্য যতগুলি দরকার, ততগুলি তৈয়ার করি ?

কৌশিক···পাড়ার লোকের জন্য আমার আর ঘুম হচ্ছে না। তুমি ক্ষেপেছ গৃহিণী ?

পত্নী···তবে বাড়ীর লোকজনের জন্য আয়োজন করি, কেমন ?

কৌশিক···তুমি আমাকে পথে বসাবে দেখছি। সাধে আমি এতদিন মনের কথা বলি নি ?

পত্নী··তবে ছেলেপুলেদের জন্য ও তোমার জন্য তৈয়ার করি—তাতে আর খরচ বেশি হবে না। ছেলেপুলেদের না দিয়ে কি খাওয়া যায় ?

কৌশিক···তারা এখন ছোট—কতদিন বাঁচবে—কত খাবে—তাদের জন্য ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ? আমি মরে গেলে হয়ত তারা দিনরাতই কেবল পিঠাই খাবে।

পত্নী···তবে তোমার আমার জন্যই করি, কেমন ?

কৌশিক···মেয়েমানুষের অত লোভ ভাল নয়, পতির সুখেই সতীর সুখ যে—নইলে খরচ বাড়ে।

পত্নী···আচ্ছা, তবে কেবল আপনার জন্যই আয়োজন করি।

কৌশিক···এখানে নয়—একেবারে সাততালার উপরে একটি উনান, একটি তাওয়া ও কিছু ক্ষুদ, গুড়, মধু ও ঘৃত নিয়ে চল। তাহ'লে কেউ দেখতে পাবে না। ছেলেপুলে দেখলে চেয়ে বস্‌বে—বিড়ালেও এক-আধখানা চুরি করতে পারে। একেবারে সাততালার উপরে চল।

কৃপণের দান

শ্রীকালিদাস রায়

কৌশিক প্রত্যেক তলার সিঁড়িব দরজা বন্ধ করিয়া সাততালায় উঠিলেন— পত্নী পিষ্টক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। সহসা জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একজন শ্রমণ দাঁড়াইয়া আছেন।



কৌশিক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও?

শ্রমণ·· আমি একখানি পিষ্টক চাই।

কৌশিক···সাততালায় উঠেও নিস্তার নাই, এখানেও এক ভিক্ষুক এসে হাজির—না, কিছু মিলবে না, যাও।

শ্রমণ ··একখানি মাত্র পিষ্টক চাচ্ছি—তোমার ত' এক ঝুড়ি রয়েছে। দানের মত পুণ্য নেই—এতে তোমার সদগতি হবে।

কৌশিক ··· আমার পুণ্যেও কাজ নেই—সদগতিতেও কাজ নেই—তুমি দূর হও। কিছুতেই দেব না।

শ্রমণ তখন হাসিতে হাসিতে মুখ হইতে ধূম-উদ্গিবণ করিতে লাগিলেন—ক্রমে গৃহের মধ্যে এত ধূম জমিয়া গেল—অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না—কৌশিক চোখ মিলিতেও পারে না। তখন কৌশিক স্ত্রীকে বলিল, "খুব ছোট একখানি পিঠা তৈয়ারী ক'রে ওকে দিয়ে বিদায় কর।"

গৃহিণী সামান্য একটু পিটুলি দিয়া একখানি ছোট পিঠা তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা ফুলিয়া গোটা কড়াই ভরিয়া উঠিল—যতবার একবিন্দু পিটুলি দিয়া

ছোট একটি পিঠা তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিলেন—ততবারই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিঠা তৈয়ারী হইতে লাগিল।

শ্রমণ বলিলেন, "দেখ কৌশিক, আমার নামে এক ফোঁটা পিটুলি কড়াইয়ে দিচ্ছ—আর তাতে দশজনের খোরাকের মত পিঠা হ'চ্ছে। দান এখনও কর নি—দানের সংকল্পেই দেখ তোমার পিঠা কতগুণ বেড়ে যাচ্ছে। দান কর কৌশিক, তোমার সাততালা সব ধনে ভরে যাবে।"

কৌশিক তখন বলিল, "স্থবির, তুমি ঘরের মধ্যে পেট ভরে পিঠা খাও।"

শ্রমণ···আমি ত' খেতে পারি না—আমি ভিক্ষা চাচ্ছিলাম—মহাভিক্ষুর জন্য। তিনি জেতবনের বিহারে পঞ্চশত ভিক্ষুর সঙ্গে সেখানে এই পিষ্টকের আশায় বসে আছেন – এই পিষ্টক নিয়ে গেলে তবে তাঁদের আহার হবে।

কৌশিক···একখানা পিঠায় পাঁচশত ভিক্ষুর কি হবে?

শ্রমণ···কৌশিক,—তুমি তথাগতের মাহাত্ম্য জান না—চল না দেখবে—একখানা পিঠায় কত লোক আহার করে।

কৌশিক···সে ত' অনেক দূর, আমি সেখানে কি করে যাব? আপনি যোগবলে বলী—আপনি আকাশে বিচরণ করতে পারেন, আমি কি করে সেখানে যাব।

শ্রমণ···তুমি যদি নিজ হাতে বোধিসত্ত্বের পাত্রে এই পিষ্টক দিতে চাও—তাহ'লে আমি ঋদ্ধিবলে তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। তোমার এই সাততালা বাড়ীকে জেতবনের পাশেই আমি নিয়ে যাচ্ছি—তুমি শুধু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেই একেবারে বিহারের দ্বারে পৌঁছিবে। তোমরা সস্ত্রীক তোমাদের বড় সাধের বুকের রক্তের মত এই পিঠা তথাগতের পাত্রে পরিবেশন করে ধন্য হও।

কৌশিক সম্মত হইলেন। তৎক্ষণাৎ কৌশিকের গৃহ—জেতবনের পাশে স্থাপিত হইল। কৌশিক সস্ত্রীক নীচে নামিয়া ভিক্ষুমণ্ডলীকে দেখিতে পাইলেন।

বোধিসত্ত্বের সহিত ভিক্ষুগণ আচমন করিয়া ভোজনাগারে বসিলেন—কৌশিক-পত্নী একখানি পিষ্টক লইয়া পরিবেষণ করিতে গিয়া দেখিলেন তাহাই ফুরায় না—অথচ তাহাতে পাঁচশত ভিক্ষুর ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। বিহারের ধারে বহু ভিখারী জুটিয়াছিল, তাহাদিগকে দান করিয়াও পিষ্টক ফুরাইল না—তখন গাড়ী-গাড়ী পিষ্টক একটি গহ্বরে ফেলিয়া দিয়া আসা

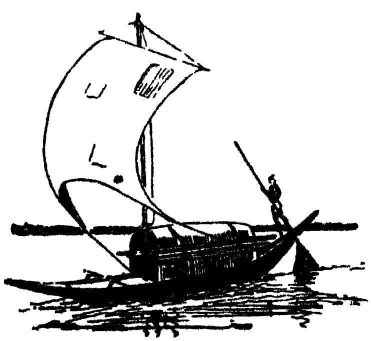
কৃপণের দান

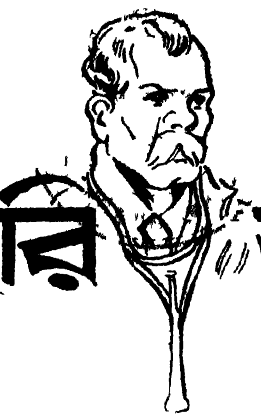
শ্রীকালিদাস রায়

হইল। আহারান্তে বুদ্ধদেব কৌশিককে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন—কৌশিকের চৈতন্যোদয় হইল। ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া তখন শাস্তা বলিলেন—দেখ, এই কৌশিক পিষ্টক ভক্ষণের বাসনা করিয়া বহুদিন ধরিয়া কি আত্মনিগ্রহ আর সংযমই না অভ্যাস করিয়াছে। অর্থহানির ভয়ে উহার মনে কোন বাসনাই জাগিত না—কাজেই বাসনা-সংযমের যে মহাপুণ্য সে তাহা লাভ করিতে পারে নাই। পিষ্টক ভক্ষণের বাসনা জানিবামাত্র সে যদি বাসনার তৃপ্তিসাধন করিত—তাহা হইলে এই তপস্যা তাহার হইত না। যে কারণেই হউক তাহার চিত্ত তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে—তাহার চিত্তক্ষেত্র বীজ বপনের ঠিক উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—ঠিক সময় ও সুযোগ বুঝিয়াই ভিক্ষু মৌদ্গলায়ন তাহাতে জ্ঞানের বীজ বপন করিয়াছেন। ভিক্ষুবর কৌশিককে কোন ক্লেশ না দিয়াই তাহার মতির পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন—

ফোটা ফুলের গন্ধহানি, বর্ণ অপচয়
না করিয়া অলি আপন খাদ্য হ'রি লয়;
প্রাজ্ঞ শ্রমণ তেমনি বিনা ক্লেশের সঞ্চার
হরিলেন এই কৃপণ-ধনীর মায়া মোহের ভার।
এমনি করে গৃহীজনে বার ক'রে সব খুঁজে,
ধীরে ধীরে দীক্ষা দিও সময় সুযোগ বুঝে।

কৌশিক তাহার সর্ব্বস্ব বুদ্ধবিহারে ভিক্ষুসেবার জন্য দান করিয়া উপসম্পদা লাভ করিল।





রামহরি ডাক্তার

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামহরি ডাক্তার
বড়ির মত নাক তাঁর,—
ব'সে আছেন হাঁসপাতালে, বড়ই কাজে ব্যস্ত,
যদিও কোন কাজ নেই—ঐরূপই অভ্যস্ত।
গলায় ঝোলে ষ্টেথিস্‌কোপ,—জেবে থার্ম্মামেটার্,
দাঁত-তোলা শাঁড়াসী হাতে,—বিশ্রাম নেই সেটার।

পাখা যেন 'সিগ্‌নেলে'
কাণ দুটি ডানা মেলে
রয়েছে, নাকটীর তাঁর জরিমানার স্বরূপ;
রোগীরা কিছু বলতে গেলেই ধম্‌কে দিচ্ছেন্—"চুপ!"
নাড়ী দেখ্‌তে হাতটা একবার ছুঁচ্চেন যথা তথা,
জীব্‌টে দেখা, পেট্‌টা টেপা, আর কোন নাই কথা।

"সিঙ্কোনা, ম্যাগ্‌, রেড়ীর তেল্"
এই তিনটি শক্তিশেল্,—
হুকুম মত কম্পাউণ্ডার যাচ্চেন শুধু শুনে,
উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে পড়চেও তাঁর গুণে!
যার হ'য়েছে কাণেতে পুঁজ—তারও ভাগ্যে তাই;
দাতব্যের দাপটে জ্বাব্‌রু কথাটির যো-নাই।

রামহরি ডাক্তার

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অকস্মাৎ হেনকাল
রুমাল মুখে মতিলাল
আসি কন্,—"দাঁতের কষ্টে মলুম্ ডাক্তার মশাই,"
ডাক্তার কন্,—"ফুট্‌বল খেল্‌লে হবেই ত' ঐ দশাই।
বাঁশীর মত ছিল,—এখন দেখনা এই নাক্,—
ঐ খেলেই ত'—হুঁ হুঁ,—সে কথা এখন থাক্—

লেখা পড়া ঘোঁড়ার ডিম্,
'শিল্ড' আর 'কপ্', টীম্,
ঘুমিয়ে কেষ্টা পা ছোঁড়ে আর বোলে ওঠে 'গোল্'
শয়ন-কক্ষ হ'য়ে উটেচে ঘোড়ার আস্তাবোল্!
মরুক্ গে যাক্,—কথাটা আমার পেরেছ ত' বুঝ্‌তে?
এলো ব'লে সাহেব,—গেলেই (তোমায়) দেখ্‌বো ধীরে-সুস্তে।"

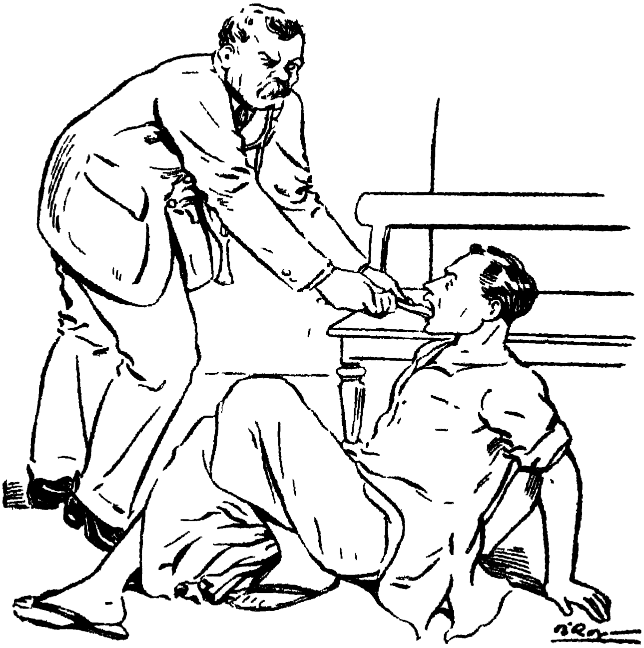
এমন সময় "গোলাপ"
এসে চাইলে জোলাপ।
গাড়ীর শব্দ শুনে ডাক্তার ব'ল্লেন্, "একটু রোসো,—
সাহেব বিদেয় করি আগে,—বাইরে গিয়ে বোসো।"
একটা রোগীর হাত্‌টা ধরে দ্রুত মেরে টান্,—
"ষ্টেথিস্‌কোপ" বসিয়ে বুকে, দিলেন তা'তে কাণ।

রোগী কয়, "ওকি মশয়?
আমার যে আমাশয়!"
সাহেব আসতেই ত্রাস্তভাবে দিলেন তাকে ছেড়ে,
সেলাম্ ঠুকে চেয়ারখানা দিলেন দ্রুত ঝেড়ে;
সাহেব ব'ললেন, "শীকার খেলতে যাচ্চি দিনাজপুর,—
'রায়বাহাদুর' আরজি তোমার করে নিচ্চি মঞ্জুর।"

রামহরি ডাক্তার

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চলে গেলেন সাহেব্,
গাড়ী যেই গায়েব্
হ'য়ে গেল দৃষ্টি হ'তে,—এক গাল হেসে
বল্লেন,—"কোথায় বীর পুরুষ, দাঁড়াও দিকি এসে!"
গোলাপ আসতেই, বল্লেন, "জোরে কর দিকি হাঁ—'
শাঁড়াসী-দে' দাঁতটা ধরেই টান মারলেন্ ঝাঁ!



যেই সে ক'রেছে,—"না-না-না",
"হাঁ-হাঁ-হাঁ—বুঝেচি হাঁ—"
বলেই, অন্য দাঁতটা ধরেই সজোরেতে উৎপাটন্;—
অজ্ঞান হ'য়ে গোলাপ নিলে ধড়াস্ ক'রে ধরাসন্।
জল নি-য়ায়, পাখা নি-য়ায়,—"লাইকার-ফেরি" নি-য়ায় টুল্-
কম্প আর রক্ত-স্রোতে, প'ড়ে গেল হুলস্থুল্।

সজোরেতে যত শক্তি
ক'রে এই রক্তারক্তি,
হাঁপাচ্চেন্ আর ভাব্‌চেন্—"তাইত কোন্ দাঁতটা তবে?"
এমন সময় রুমাল্-মুখে মতিলাল যবে
এসে বলে,—"গোলাপের হঠাৎ হ'লো একি?
জোলাপ্ নিতে এসেছিল,—এ আবার কি দেখি!"

হঠাৎ উঠি চোম্‌কে,
"অ্যাঁ" বলি থোম্‌কে,—
ধম্‌কে বল্লেন, "দেখ দেখি ঘটিয়েচ কি উৎপাৎ,
এতক্ষণ কোথায় ছিলে তোলাতে হেথা এসে দাঁত?
চেনা দুস্কর, সবারই ত' ঐ বেয়াড়া ঢংয়ের চেহারা,
বোতাম্-খোলা, হাত-গুটোনো, চুল-কপ্‌চানো তেহারা!"

"আজ্ঞে- ঘুরে বাগান্‌টায়,
ভুল্‌তেছিলাম যাতনায়।"
বিষম্ চোটে ডাক্তার কন্—"কুহু, কেকা, মঞ্জরী—
মলয় বাতাস নাইক হেথা, নাইক হেথা ভ্রমরী;—
কাব্যিপণা মহলা দেবার নয়কো স্থান হাঁসপাতাল,—
(এটা) সুদূর পথের পান্থশালা,—যমালয়ের অন্তরাল!

ইয়ার্‌কী মার্‌তে বুঝি,—
যায়গা আর পাওনি খুঁজি?"
মতি ব'ল্লে, "একবার ওকে জিজ্ঞেস্ ক'ত্তেও হয়—
কোন্ দাঁতটা—অন্তত তা"—"থাম থাম" রেগে ডাক্তার কয়,
"বিশ বৎসর করচি কাজ, এর হাড়-হদ্দ জানি,
রায়বাহাদুর অম্‌নি হয় না;—ভেব না ধান ভানি!"

রামহরি ডাক্তার

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব'লেই শাঁড়াসী নিয়ে
যেই ওঠা দাঁড়িয়ে ;—
"ওরে বাপ্" ব'লে মতি লাফিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে
ছোটে, আর নিজে নিজেই বেধড়ক্ হাসে।
বলে মতি, "দাতব্যেতে কোটী নমস্কার ;—
সেই যাবে, ফাল্‌তু রক্ত দেহে আছে যার।



উঃ,—কি পাকা হাত—
দু'-দুটো কাঁচা দাঁত—
পটাপট্ ভেঙ্গে দিলে,—বাজে জিনিষ যেন!
পুছলেও না—কোন্ দাঁতটা—কি, এসেচে সে কেন?"
দাতের ব্যথা কোথায় গেল, হেসেই মতি সারা,
(বলে) "দাঁত আছে যার—জোলাপ্ নিতে যায় না যেন তারা!"

৭



ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

রমা ছোট বয়সে মাকে হাবিয়েছিল। বাবা তাব মস্ত ব্যবসায়ী। কাণপুরে প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ী, দাস দাসী, আমলা কর্ম্মচাবী, সবকার দরওয়ানে গম্‌গম্‌ করে। রমার একটিমাত্র ছোট ভাই রঞ্জিৎ। তারা দুই ভাই বোনে মোটরে চড়ে সকাল বিকাল বেড়াতে যায়, সর্ব্বদা পরে থাকে সিল্কের সুন্দব সুন্দর পোষাক, খেলা করে দামী দামী চমৎকার খেলনা নিয়ে।

রমার বাবা রমার সমবয়সী একটি হিন্দুস্থানী ছোট্ট মেয়েকে মাহিনা দিয়ে তার দাসী বা সঙ্গিনী নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। রঞ্জিতেরও ছিল তারই মত ছোট বয়সের একটি চাকর। তাদের নাম ছিল লখিয়া এবং মন্নু।

একদিন রঞ্জিৎ বললে—দিদি, আমার কলের দম্ দেওয়া এরোপ্লেনখানা পাওয়া যাচ্ছে না।

রমা খুঁজতে বললে—লখিয়াকে এবং মন্নুকে। তারা কেউ খুঁজে বার্ করতে পারলে না। তার পরদিন পাওয়া গেল না, বমার চমৎকার পোষাক পরানো ডলী পুতুলটা। তারপর প্রায়ই তাদের এটা ওটা সেটা হারাতে লাগলো।

রমা বলে—রঞ্জি, এ' নিশ্চয় তোর মন্নু ছোঁড়ার কাজ। রঞ্জিৎ জোর করে মাথা নেড়ে বলে,—কক্ষনো নয় দিদি। এ'নিশ্চয়ই তোমার আদুরী লখিয়ার কর্ম্ম।

লখিয়া ও মন্নু শপথ করে বল্লে, তারা চুরি করেনি। এ' বোধ হয়,—"খোকাবাবু"র সঙ্গে খেলা করতে যে সব পাড়ার ছেলেরা আসে, তাদেরই কাজ।

ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

রমা ধমক্ দিলে—তাদের, জানিস্ তারা ভদ্রলোক, তারা আমাদের সঙ্গে খেলতে আসে বলে কি চুরি করে বল্‌তে চাস্ ?

কিন্তু পাড়ার বন্ধুদের আসা কমার সঙ্গে সঙ্গে চুরিও কমে গেল। রমা বললে,—রঞ্জু, চুরি বোধ হয় ওরাই করত।

রঞ্জিৎ বললে, কক্ষনো নয় দিদি।

২

লখিয়া আজ ক'দিন খোকার ঘরের মধ্যে গিয়ে তার খেলনাগুলি নেড়ে চেড়ে দেখছে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। সে সারাদিন রমার কাছে থাকে, সন্ধ্যাবেলা তার মা এসে তাকে সাথে করে বাড়ী নিয়ে যায়।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা লখিয়া রঞ্জিতের ঘরে গিয়ে চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। রঞ্জিত বললে—কি চাই তোর ?

লখিয়া ভয়ে ভয়ে বললে—খোঁখাবাবু! তোমার ঐ কলের ঘোড়াটা একবার আমাকে দেবে ? আমি কালই তোমাকে ফিরিয়ে দেব।

রঞ্জিতের জুতা সাফ্ করছিল মন্নু। সে অমনি বলে উঠলো—তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়, বাবুর ঘোড়া তোর ঘরে নিয়ে যাবি ?

রঞ্জিৎ বললে—ঘোড়া নিয়ে কি করবি ?

লখিয়া বললে—আমার ছোট ভাই একবার দেখতে চেয়েছে।

রঞ্জিৎ রেগে উঠে বললে—খবর্দ্দার! আমার কোনও জিনিষে হাত দিবিনে। বুঝতে পেরেচি, খেলনা জিনিষপত্র চুরি তোরই কাজ।

* * * *

দিন পনেরো পরে একদিন দুপুর বেলা সবাই ঘুমুচ্চে। রমা ও রঞ্জিত দু-ভাই বোনে দোতলার ঘরে বসে ক্যারম্ খেলচে। এমন সময়ে নীচে একটা হৈ চৈ শোনা গেল। তার পরই মন্নু ও বাড়ীর অন্যান্য চাকর বাকরেরা লখিয়াকে ধরে এনে হাজির করলে রমা ও রঞ্জিতের সামনে। সে আঁচলের মধ্যে খোকার সেই ঘোড়াটি লুকিয়ে নিয়ে নাকি

ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

বাড়ী থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল। সমস্ত চাকর বাকরেরা তাকে চাঁদা করে দিচ্ছে কাণমলা, চাঁটী, চড়।

লখিয়া দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে। তার দু' গাল বেয়ে টস্ টস্ করে চোখের জল ঝরে পড়ছে।



রঞ্জিৎ হেসে বললে—দেখ্‌লি দিদি, তুই তখন বিশ্বাস করিস্‌নি, কিন্তু আমি ঠিকই ব'লেছিলাম, ঐ লখিয়ারই কর্ম্ম।

রমার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। সে বললে -কেন তুই এমন কাজ করলি বল্? নিশ্চয়ই সমস্ত জিনিষ তুইই চুরি করেছিস্।

লখিয়া জলভরা চোখ তুলে কান্নার স্বরে বল্‌লে— আমি জীবনে কক্ষনো চুরি করিনি। আজ এই সর্ব্বপ্রথম ঐ অন্যায় কাজ করেছি। আমার ছোট ভাই ভজুয়ার খুব ব্যারাম। সে কয়েক মাস আগে একদিন আমার সঙ্গে এ বাড়ীতে এসে ঐ ঘোড়াটি দেখে খুব খুশী হয়েছিল। এখন অসুখের মধ্যে তার মুখে আর অন্য কোনও কথা নেই,-- খালি ঐ ঘোড়া আর ঘোড়া। মাঝে মাঝে সে বেহুঁস হয়ে যাচ্চে কিন্তু বেহুঁসের মধ্যেও খালি বল্‌ছে—"লখিয়া বহিন্! একবার সেই ঘোড়াটা আমি নেব। একবার শুধু দেখবো তাকে।" ডাক্তারবাবু বলেছে ভজুয়া নাকি বাঁচবে না। মা কাঁদছে কেবল। আমি তাই থাকতে পারিনি। মনে করলুম একবার চুপি চুপি ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে ভজুয়ার হাতে দেব। তারপর আবার এনে, যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিলে কেউ জানতে পারবে না। কাল সন্ধ্যেবেলা আমি ঘোড়াটা নিয়ে গেছলুম। ভজুয়ার তখন হুঁস্ এসেছিল। সে ঘোড়া পেয়ে খুবই খুশী হল। তারপর বেশী রাত্রে আবার বেহুঁস হয়ে পড়লো। আজ এখনও তার হুঁস্ ফেরেনি। ডাক্তারবাবু বলে

গেছে, আর নাকি তার হুঁস্ হবে না। আমি ভাবলুম, আর তো ভজুয়া ঘোড়া চাইবে না,—এই বেলা এটা যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিয়ে আসি। কাপড়ের ভিতরে করে এনে রেখে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দরওয়ান্ দেখতে পেয়ে ধরে মারতে লাগলো। বল্লে, "তুইই খোকাবাবুর সমস্ত জিনিষ চুরি করিস্।"

লখিয়ার দু' চোখ দিয়ে দর দর ক'রে ক্রমাগত জল গড়িয়ে পড়ছিল। রমার মনটায় খুব কষ্ট হল কিন্তু রঞ্জিৎ এবং বাড়ী শুদ্ধ লোক কেউ লখিয়ার কথায় বিশ্বাস করলে না। কাজেকাজেই রমাও তাদের মতে মত্ দিয়ে লখিয়াকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিলে। লখিয়া যাওয়ার সময়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে গেল—বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। শুধু রোগা ভাইয়ের জন্যই এই অন্যায় কাজ করেছি। কেউই তার কথায় কাণ দিলে না।

৩

এই ঘটনার পর প্রায় দশ বৎসর কেটে গেছে।

রমা ও রঞ্জিতেব বাবাব ব্যবসায়ে লোক্সান্ হয়ে সেই প্রকাণ্ড বাড়ী, মোটর গাড়ী, লোকজন সমস্তই দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেছে। মাতৃহীন ছেলে মেয়ে দু'টিকে নিয়ে তিনি কলিকাতায় এসে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করে কষ্টেস্বষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ একদিন সন্ন্যাস রোগে তিনিও মারা গেলেন। রমা ও রঞ্জিৎ পৃথিবীর মধ্যে একেবারে একা। কি করবে, কোথায় যাবে ভেবে পায় না। শেষে রঞ্জিৎ এক বড়লোকের বাড়ীতে মোটর গাড়ী ধোওয়ার কাজ নিয়ে আহার ও আশ্রয় পেলে। আর রমা পেলে রাঁধুনীর কাজ। রমা যা মাইনে পেতো, তাই দিয়ে রঞ্জিতের স্কুলের মাইনে যোগাতো।

তাদের মনিব বাড়ীর মেয়েরা ছিল একটু কড়া প্রকৃতির এবং সন্দিগ্ধ স্বভাবের। তারা কেবলই সন্দেহ কোরতো, রমা বুঝি নিজে খুব ভাল ভাল মাছ মাংস পায়স পিঠা চুরি করে খায় এবং তার ভাইকে খাওয়ায়।

রমা বড়লোকের মেয়ে। অবস্থার গতিকে আজ রাঁধুনী হয়েছে। তার স্বভাব মোটেই হীন নয়। সে ওদের সন্দেহের জন্য মনের ঘেন্নায় নিজে কখনও ভাল মাছ-তরকারী খেত না। মোটা ভাত ও ডাল চচ্চড়ী যা চাকর বাকররা খায় তাই নিজে খেতো

ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

এবং ভাইকেও খাওয়াতো। সে আপন হাতে মনিবদের জন্য মাংস, মাছ, পোলাও, চপ্, কাটলেট্, পায়স, পিঠা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি কত কি উৎকৃষ্ট সামগ্রী রান্না করতো,— একান্ত ইচ্ছা হতো তার,—এর থেকে এক টুক্‌রা বা একরত্তি মাত্র নিয়ে তার পিতৃমাতৃ-হীন অভাগা ছোট্ট ভাইটিকে খাওয়ায়। কিন্তু কঠিনভাবে নিজের ইচ্ছাকে সে সংযত করে রাখতো। কতদিন দেখেছে,—বাবুদের বা গিন্নীদের পাতে কত মাছ মাংস বা পায়স মিষ্টান্ন ফেলা গেল, কুকুরে বেড়ালে সেগুলি খেল। তার মনে হয়েছে, "হায়! ওরা যদি ঐগুলি নষ্ট না করে একটুখানিও আমার রঞ্জিতকে দিতে বল্‌তো!"

রঞ্জিৎ দুঃখে পড়ে খুব ধীব ও বুদ্ধিমান হয়েছিল। সে ভোরে উঠে মোটর গাড়ী সাফ্ করতো। তার পর ন'টার সময় স্নান করে খেয়ে স্কুলে চলে যেতো। আবার স্কুল থেকে ফিরে এসে ফের মোটর গাড়ী সাফ্ করতে লাগতো। রাত্রে স্কুলেব পড়া তৈবি করতো।

৪

কার্ত্তিক মাস এলো। আশ্বিন মাসে পূজার ছুটির সময় রমার মনিব বাড়ীর প্রায় সকলেই পশ্চিমে বেড়াতে চলে গেছেন। বাড়ীতে আছে খালি জনকতক ছোকরা বাবু এবং একটি বৌ। রমা ও রঞ্জিত তাদের নিজের চাকরীতে আছে।

শুক্লাপক্ষের দ্বিতীয়া তিথি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ব্রতেব দিন। রমা সকাল থেকে ভাবচে—আজ ভাই-ফোঁটা। আজকের দিনে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলে যমের দুয়ারে কাঁটা পড়ে। ভাই হয় দীর্ঘজীবি। ছোট বেলা থেকে এতদিন পর্য্যন্ত সে প্রতি বৎসর ঐ দিনটিতে ভাইকে নূতন কাপড় পরিয়ে আসন পেতে বসিয়ে প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজিয়ে কপালে দই চন্দনের ফোঁটা দিয়েচে। তারপর পঞ্চ ব্যঞ্জন ঘৃত অন্নের সাথে নিজের হাতে রাঁধা পরমান্ন খাইয়েচে। আজকের দিনে বোনকে পরমান্ন রেঁধে খাওয়াতে হয় ভাইকে। তাই তা'হলে দীর্ঘায়ু হয়।

রমা আকাশ পাতাল ভাবচে। শেষে ঠিক করলে, যেমন করেই হোক্ সে তার ভাইয়ের কল্যাণব্রত করবেই। বাড়ীতে বেশী লোক না থাকায় সুবিধা হল। একটিমাত্র বৌ ছিল, তাকে গিয়ে বললে, - বৌদি, দুধ অনেক রয়েছে। আজ আপনাদের জন্যে পরমান্ন রাঁধি।

ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

বৌটি বল্লে—আচ্ছা।

রমা বেশ করে পরমান্ন পিঠা ও পঞ্চ ব্যঞ্জন রান্না করলে। তার পর সব রকম সামগ্রী থেকে একটু একটু করে উঠিয়ে একখানি ছোট থালে যত্ন করে সাজালে—একটি ছোট বাটী ভরে পরমান্ন রাখলে।

ঠিক দুপুর বেলা যখন সকলে ঘুমুচ্চে, তখন রঞ্জিৎকে রান্নাঘরের মধ্যে ডেকে রমা বল্লে—খেতে বোস্ ভাই! রঞ্জিৎ খাবারের থালার পানে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললে—এ সব কোথায় পেলে দিদি?

রমা বললে,—আজ যে ভাই-ফোঁটা রে! শুক্রবার কিনা, ফোঁটা দিতে নেই। তাই ফোঁটা দিইনি। দাঁড়া, প্রদীপটী জেলে দিচ্চি। এবার আর নতুন কাপড় হোলো না। পুরানো কাপড়খানিই সাবান দিয়ে ফর্সা করে রেখেচি, ঐ পরে খেতে বোস্।

রঞ্জিৎ খেতে বসেচে এবং রমা প্রদীপ জ্বালচে, এমন সময়ে রান্নাঘরের জানালায় মনিব বাড়ীর সেই বৌটির মুখ দেখা গেল। বৌটি উঁকি মেরে রান্নাঘরের ভিতরের ব্যাপারটা দেখে নিয়ে চট্ করে সরে গেল। একটু পরেই ডেকে নিয়ে এল তার স্বামী ও দেওর দু'টিকে।



তারা এসে দেখলে, রঞ্জিৎ পরমান্ন খাচ্চে এবং রমা পাখা দিয়ে বাতাস করছে। দেখেই তারা জ্বলে উঠলো। ঘরে ঢুকে রমাকে নির্দ্দয়ভাবে কটুস্বরে বললে—হাতে হাতে চুরি ধরেছি। প্রতিদিন এমনি করে ভাইকে চুপি চুপি চুরি করে ভাল ভাল খাবার-দাবার খাওয়ান হয়। দূর্ হয়ে যা আমাদের বাড়ী থেকে।

রমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বল্লে—আমি আর কোনদিনও এমন কাজ করিনি। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলে আমার

ভাইয়ের জন্য

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী

অনাথ ছোট ভাইটিকে একটু ভাল খাবার ও পরমান্ন খাওয়াচ্ছিলুম। ওরা কিন্তু কেউ সে কথায় কাণই দিলে না।

রঞ্জিৎ অপমানে মাথা হেঁট কবে বসেছিল। তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাদের ছোটবেলাকার দিনে কাণপুরে সেই লখিয়াব কথা। সেদিন লখিয়াও তার দিদিরই মত এমনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, "ওগো তোমবা বিশ্বাস ববো, আমি চোর নই। শুধু আমার ছোট ভাইটিকে একটিবাব চড়বো বলে ঘোঁড়াটি নিয়েছিলাম।" কিন্তু সেদিন তারাও এই মনিবদেরই মত নিষ্ঠুরভাবে তাকে অপমান করতে ছাড়েনি এবং লখিয়ার কথা কাণে তুলতে চায়নি।

রঞ্জিতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। সে ভাবতে লাগলো, ভগবান সেই পাপেই কি আজ আমাদের এই শাস্তি দিচ্ছেন।।





ভবঘুরের কথা



শ্রীজলধর সেন

ছেলেবেলায় এক ফকিরের কাছে একটা গান শুনেছিলাম। সে বহুকাল আগের কথা। তা-হোলেও সে গানটা এখনও আমার মনে আছে ;—সবটা মনে নেই গোড়াটাই মনে আছে। গানটা এই—

ক'লকাতা, ঢাকা সহর,
দিল্লী, লাহোর,
মুরশিদাবাদ, কুচবিহার—
আমার মন গিয়েছে ছড়িয়ে,
তারে কুড়িয়ে আনা ভার।

এতকাল আগের শোনা এই গানটা মনে আছে কেন, তা জান? আমি যে বুড়া হয়েছি, ওপারের ডাক এসেছে, এখনও আমার মনটাকে কুড়িয়ে আনতে পারলাম না ;—সে স্থধু 'মুরশিদাবাদ, কুচবিহারের' দিকেই ছড়িয়ে আছে, তাকে কিছুতেই কুড়িয়ে আনতে পারলাম না—আর পারবও না। এই ভবঘুরে-গিরি করেই আমার তিন কাল কেটে গিয়ে শেষকালে ঠেকেছে ; এখনও 'মুরশিদাবাদ, কুচবিহার' শুনলেই আমার মন নেচে ওঠে। আমি আমার দেহের দুর্ব্বলতার কথা ভুলে যাই কেউ যদি বলে, দাদা, রাওয়ালপিণ্ডি যাব? আমি তখনই নেচে উঠি ; রাওয়ালপিণ্ডি যে কোন্‌নগরের

৮

আহরিকা

ভবঘুরের কথা

শ্রীজলধর সেন

এ-পাশের ষ্টেসন নয়, সেখানে যেতে হ'লে যে অত দ্রুতগামী পাঞ্জাব মেলেরও ছ'রাত ছ'দিন লাগে, সে কথা আমি বেমালুম ভুলে যাই। আমার মধ্যের ভবঘুরেটা মাথা তুলে বলে, চল, বেরিয়ে পড়।

আমার একখানা কোষ্ঠী ছিল; সেখানা হারিয়ে গিয়েছে; নইলে সেই লম্বা কোষ্ঠীখানি খুলে তোমাদের দেখাতাম, তার মধ্যে কম ক'রে হ'লেও দশবার লেখা ছিল—'ফলং ভ্রমণং'। কোষ্ঠীর সব কথা ঠিক না মিলে গেলেও 'ফলং ভ্রমণং' গণনাটা আঠারো-আনা মিলে গিয়েছে—আমি অনেকের কাছে থেকে 'পাকা ভবঘুরে' ব'লে সার্টিফিকেট পেয়েছি—আমাদের দেশের চলতি কথায় যাকে বলে 'কাঙ্গালের ঘোড়ারোগ'।

তা তোমরা যাই বল না কেন, আমার এই ভবঘুরে রোগ এতদিনেও যখন সারলো না, তখন এ রোগ আমার শেষ পর্য্যন্ত থাকবে।

অনেক সময় নিঃসম্বলে, শুধু নিজের শরীরের শক্তির উপর নির্ভর করে 'দুর্গা দুর্গা' ব'লে পথে বেরিয়ে পড়েছি। যাঁরা আমার 'হিমালয়' 'প্রবাসচিত্র' প্রভৃতি পড়েছেন, তাঁরা এ কথার সাক্ষ্য দেবেন। তখন ত টাকা পয়সা ছিল না—সম্বল ছিল আমার অটুট স্বাস্থ্য, নির্ভর করেছিলাম ভগবানের উপর, আর নির্ভর করেছিলাম আমার দুইখানি পায়ের উপর এবং সেও ভগবানের অনুগ্রহে। আমার এই পা দু'খানি যদি সবল না হোতো তা হ'লে আমি এত বেড়াতে পারতাম কি না সন্দেহ। তার পর এখন পায়ে বল নেই, বেশীদূর চল্‌বার সামর্থ্য নেই, কিন্তু আমার মধ্যের সেই ভবঘুরেটা এখনও যখন-তখন বলে, চল, বেরিয়ে পড়। তা না হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সেও এই সেদিন বড়দিনের হি-হি শীতের মধ্যে সুদূর মীরাটে যেতে পারতাম না। শুভানুধ্যায়ীরা বললেন, পশ্চিমের সেই দারুণ শীতে দাদা মারাই যাবেন। কৈ, মারা ত যাইনি, বেশ আনন্দে কাশী, মীরাট, দিল্লী ঘুরে এলাম, শরীর একটু অসুস্থও হোলো না। আবার তারই পরের বছর সেই বড়দিনের সময়ই গেলাম কোথায় জান? বৈদ্যনাথ, মধুপুর নয় ভাই, একেবারে মধ্য প্রদেশের ইন্দোর, উজ্জয়িনী, অজন্তা, ইলোর, নাসিক, জব্বলপুর, বোম্বাই। আর সেও ধীরেসুস্থে মাসখানেক ধ'রে নয়—দশ দিনের মধ্যে সব বেড়িয়ে এসেছি এবং সুধু কি তাই, যাঁরা আমার সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা প্রতিদিনই ভয় করতেন—এইবার দাদা ভেঙ্গে পড়বেন। কিন্তু ভ্রমণ শেষে ঘরে ফিরে এসে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, পথ চলতে দাদা কোনদিন পিছিয়ে

ভবঘুরের কথা

শ্রীজলধর সেন

পড়েন নি, সকলের আগে আগে চলেছেন, অম্লান বদনে রাত্রি জাগরণ, অর্দ্ধাহার, অনাহার সহ্য করেছেন। এর জন্য আমি বাহাদুরী চাচ্ছি নে—চাচ্ছেন আমার মধ্যের সেই ভবঘুরে ব্যক্তিটি।

এই যে ভবঘুরে ভূতটী, ইনি ছেলেবেলা থেকেই আমার স্কন্ধে ভর করেছিলেন, আমি বালককালে, কৈশরে বা যৌবনে কোন রকম ব্যায়াম কুস্তি করি নাই; আমাদের সে সময় ক্রিকেট, ফুটবলের অস্তিত্বও ছিল না। আর আমি ছিলাম পাড়াগাঁয়ের ছেলে; আমাদের সময় ব্যায়াম ছিল ডাণ্ডাগুলি খেলা, হাড়ুডুডু, লাঠী খেলা, সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো। আমি এর মধ্যে ঐ সাঁতার কাটাই শিখেছিলাম। আমার প্রধান ব্যায়াম ছিল পদব্রজে ভ্রমণ। আর সেই সময় থেকেই ভবঘুরে ভূত আমাকে পেয়ে বসেছিল। সেই সময়ের অর্থাৎ যখন আমার বয়স চৌদ্দ কি পনের' তখনকার একটা ভ্রমণের কথাই তোমাদের কাছে বল্‌ব।

আগেই তোমাদের বলেছি, আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, তখন আমি ইংরাজী স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, বয়স তখন পনের' বছর। সেই সময় এক বৈশাখমাসে আমার মা কঠিন রোগে শয্যাগত হলেন; চিকিৎসকেরা বল্‌লেন, এ রোগ সারবে না; তবে মারা যাবার বিলম্ব আছে। আমার বাবা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমার যাঁরা অভিভাবক, তাঁরা বিদেশে চাকরী করেন। আমার একমাত্র ভগিনী নিঃসন্তান বিধবা। তিনি আমার দিদি। মায়ের অন্তিম ইচ্ছা, মরবার পূর্ব্বে একবার দিদিকে দেখেন। দিদি তখন তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে—আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে—যশোর জেলার এক প্রান্তে। এখন যশোর যেতে কোন অসুবিধা নেই, রেলে চড়লেই যাওয়া যায়, তার পর ষ্টেসন থেকে কোন স্থানে যেতে হ'লে ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতি মিলে। আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন যশোর, খুলনায় রেল হয় নি; মোটরের নামও তখন কেউ শোনে নি। আমার দিদির যে গাঁয়ে বিয়ে হয়েছিল, সেখানে যেতে হ'লে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে নেমে বোধ হয় দশ বারো ক্রোশ হয় গো-জানে আর না হয় পদব্রজে যেতে হোতো। মায়ের অন্তিম সাধ পূর্ণ করবার জন্য আমি এই দুর্গম পথে যেতে কৃতসঙ্কল্প হোলাম। মা, জ্যেঠাইমা অনেক নিষেধ করলেন। কারও কথা শুনলাম না। পুরুষ অভিভাবক আমার বড়দাদা, মেজদাদা—

আহরিকা

ভবঘুরের কথা

শ্রীজলধর সেন

আমার জ্যেঠতুতো-ভাই। তাঁরা তখন বিদেশে চাকরী করেন। তাদের অনুমতি নেওয়ারও আবশ্যকতা অনুভব করলাম না। একদিন বেলা দশটার গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লাম।

সঙ্গে নেবার মত কিছুই ছিল না বল্‌লেই হয়। একখানি কাপড় আর একখানি গামছা। ছাতা, জামা, জুতা—এ সব কিছুই আমার ছিল না। সে বয়সে ও-সব বিলাসিতা করবার অবস্থাই যে আমার ছিল না; ধুতি আর চাদরই আমার পরিধেয় ছিল। আর সঙ্গে নিয়েছিলাম গুটি-পাঁচেক টাকা। সে টাকাও জ্যেঠাইমা ধার করে এনে দিয়েছিলেন। দিদির বিয়ে হয়েছিল অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ীতে, সুতরা' এ কয়টা টাকা দিদিই পরে দিয়েছিলেন।

থাক ও-সব কথা। ভবঘুরের ভ্রমণের কথাই বলি। চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে যখন উপস্থিত হোলাম, তখন বেলা একটা। ষ্টেসনের বাইরে কয়েকখানি গো-যান ছিল। গাড়োয়ানেরা আমার গন্তব্য স্থান কালীগঞ্জ শুনে যাতায়াতের ভাড়া সাত টাকা চাইল। সা—ত টাকা! দু' টাকা আড়াই টাকা হলেও না হয় একটু নবাবী করে যাওয়া যেত; সাত টাকা দেওয়া অসম্ভব। আমি বল্‌লাম, আমি হেঁটেই যাব। একজন গাড়োয়ান বল্‌ল, পাগল নাকি! এই দুপুরের ভয়ানক রৌদ্রে হেঁটে যাবে? আচ্ছা, ছয় টাকাই দিও। আমি বল্‌লাম, সে হবে না। আমি হেঁটেই যাব। লোকটা বল্‌লে, তা হ'লে মরগে যাও।

তার এই আশীর্ব্বাদ নিয়ে আমি রাস্তায় নামলাম। রেলের ফটক পার হ'য়ে একটা জলাশয় দেখলাম। সেইখানে নেমে কাপড়খানি ভিজিয়ে নিলাম, গামছা ভিজিয়ে মাথায় দিয়ে সেই প্রখর রৌদ্রে পথ চলতে আরম্ভ করলাম। যেতে হবে দশ ক্রোশ পথ। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, যেমন ক'রে হোক, এই দশ ক্রোশ পথ আমাকে সন্ধ্যার মধ্যেই অতিক্রম করতে হবে। কোথাও বিশ্রাম করব না। এক ভয় কালবৈশাখী! দেখা যাক্ ভগবান অদৃষ্টে কি লিখেছেন। বাড়ী থেকে মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে বেরিয়েছি, পথে গাড়োয়ানের আশীর্ব্বাদও পেয়েছি—দেখি, কার আশীর্ব্বাদ ফলে।

ভবঘুরের কথা

শ্রীজলধর সেন

বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র। পায়ে জুতা নেই, রাস্তার ধুলো যেন আগুন হয়েছে। কোন কিছুই আমার গতিরোধ করতে পারল না। পথের পাশে যেখানে খানা-ডোবা দেখি, সেইখানেই নেমে কাপড় আব গামছা ভিজিয়ে নিই। পথেব মধ্যে একটা হাট পেয়েছিলাম। এতদিন পরে ঠিক মনে পড়ছে না—সে স্থানেব নাম বোধ হয় 'শঙ্খচাঁদ।' সেই হাট থেকে দুই পয়সাব চিঁড়ে আর এক পয়সাব শক্ত গুড় কিনে নিয়ে খেয়েছিলাম, আর সেই হাটেব পাশেই একটা খাল ছিল, তার শৈবালাচ্ছন্ন পঙ্কিল জল খেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলাম।



কালবৈশাখী অনুগ্রহ কবে নাই, গাড়োয়ানেব আশীর্ব্বাদ সফল হয় নাই। পনের' বৎসবেব কিশোর এই হতভাগা, বৈশাখেব রৌদ্র উপেক্ষা ক'রে দশ ক্রোশ পথ অতিক্রম ক'বে সন্ধ্যাব একটু আগেই কালীগঞ্জে পৌঁছে মৃতপ্রায় চিত্রা-নদীব ঘাটে গিয়ে একেবাবে উপস্থিত। এই সুদীর্ঘ পথেব মধ্যে কোথাও বসি নাই। হাটে দাঁড়িয়ে দুই মিনিটের মধ্যেই খাদ্য সংগ্রহ কবেছিলাম।

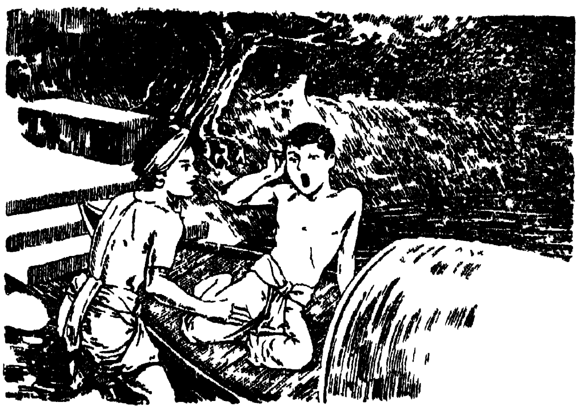
কালীগঞ্জের ঘাটে ব'সে একটু বিশ্রাম করেছিলাম। আমাব দিদির বাড়ী যে গ্রামে, সে গ্রাম কালীগঞ্জ থেকে তিন মাইল দূরে। বাঁধা বাস্তা নেই, চিত্রা-নদীব তীর দিয়ে যেতে হবে। বাঘ, শূয়ারেব ভয় আছে, পথে জঙ্গল আছে, আর সেই

ভবঘুরের কথা

শ্রীজলধব সেন

বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে সাপেরাও পথের মধ্যে বায়ু সেবনের জন্য পড়ে থাকতে পারেন। এ সব সংবাদ সেই ঘাটে বসেই একটা লোকেব কাছে পেলাম। সেই লোকটাই উপদেশ দিল, ঘাটে যে কয়েকখানি ডিঙ্গি নৌকা আছে, তাবই একখানি ভাড়া ক'রে যাওয়াই আমার উচিত; অন্ধকার রাত্রিতে অজানা পথে হেঁটে যাওয়া ঠিক হবে না।

আমি তাব কথা অগ্রাহ্য করতে পাবলাম না। শবীর একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছিল। আট আনা ভাড়া স্থিব ক'রে একখানি নৌকায উঠে সেই যে শুয়ে পড়েছিলাম, গন্তব্য স্থানে পৌঁছে নৌকার মাঝি যখন আমাকে ঠেলে তুলে বলল, বাবু, নামুন—এই ঘোষেদেব ঘাট, তখন আমার চৈতন্যোদয় হ'ল; এমন ঘুমে অচেতন হ'য়েছিলাম।



তারপর আর কি! সবাই আমাব এই ভ্রমণ-কথা শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেল—আমার মত পনের' বছরেব ছেলের এমন হাঁটার কথা তাঁরা নাকি কখনও শোনেন নাই। ভাল কথা।

অর্থাৎ এই পা দু'খানাই আমার প্রধান সম্বল ছিল। এরই কল্যাণে আমি দেশ-দেশান্তরে বেড়িয়েছি—এরই কল্যাণে আমি হিমালয়ের দুরারোহ উপত্যকা, অধিত্যকা, চড়াই-উৎরাই পার হ'য়েছি। সকলকে তাই এই ভবঘুরে বলতে চায় যে, যত যাই কর না ভাই, পা দু'খানি শক্ত ক'রো; তা হ'লেই শরীর শক্ত হবে, মন সবল হবে, পৃথিবীর সুদীর্ঘ পথ 'জয় ভগবান' ব'লে অনায়াসে পার হ'য়ে যাবে।

এইখানেই ভবঘুরের কথা আপাততঃ শেষ।

গরীবের চোখের জল



শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তেপান্তরেব মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড দোতলা ওই বাড়ীটা,—দেখলেই মনে হয় ভুতুড়ে বাড়ী। বাড়ীর মালিক যে কেন এখানে বাড়ী তৈরি করেছিলেন কে জানে। বাড়ীর চারিদিকে ছোট একটি বাগান তৈবি করবার জন্যে বাড়ীর মালিক এক সময় বোধ হয় নানারকম গাছের চারা পুঁতেছিলেন; সে-সব গাছ এখন এক-একটি বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। বাত্রির অন্ধকারে জনমানবহীন এই প্রান্তরের মাঝখানে হঠাৎ যদি কোনদিন ঝড় ওঠে ত ভারি মজা হয়। এই বাড়ীতে এর আগে যাঁরা বাস করে গেছেন, দোতলার একটা ঘবেব পশ্চিমদিকের একটা জানলা তাঁরা বন্ধ করেন নি, এখনও সেটা তেমনি খোলাই আছে; ঝড় উঠলে খোলা এই জানলার কপাটদুটো দড়াম্ দড়াম্ ক'রে একবার খোলে একবার বন্ধ হয়, গাছের পাতায় পাতায় ঝড়ের বাতাস লেগে সর্ সর্ ক'রে কেমন যেন একটা একটানা আওয়াজ হ'তে থাকে, কোথায় যেন একটা গাছের ডাল মাঝে মাঝে মড়্ মড়্ ক'রে ওঠে।

এই নিয়ে কত লোক যে কত কথা বলে তার আর অন্ত নেই। কেউ বলে এই বাড়ীতে ভূত তারা স্বচক্ষে দেখেছে, কেউ বলে প্রায় প্রত্যহ রাত্রেই এ-বাড়ীতে আলো জ্বলতে দেখা যায়, কেউ বলে এই বাড়ীর পাশ দিয়ে দিনের বেলা পার হয়ে গেলেও গা ছম্ ছম্ করে। মোট কথা, ভূত যে এ-বাড়ীতে আছে তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই বাড়ীর মালিকের খেয়াল। এখান থেকে শহরে যেতে হ'লে

মাহরিকা

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

এক ক্রোশ পথ হাঁটতে হয়। ট্রেণ ধরতে হ'লেও তাই। মানুষের মুখ দেখতে হ'লে—হয় শহরে যেতে হয়, আর নইলে পশ্চিমদিকে মাইল-দেড়েক পথ হেঁটে গেলে শাল-মহুয়ার জঙ্গলের মাঝখানে সাঁওতালদের ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়।

কাজেই, এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে এমন একখানি সুন্দর বাড়ী তৈরি করার কোনও মানেই হয় না। তবে সান্ত্বনার মধ্যে এই যে জায়গাটা বড় স্বাস্থ্যকর। সাঁওতাল-পরগণার মাটি, চারিদিকে শাল, মহুয়া, তাল আর তমালের গাছ, অসমতল ঢেউ-খেলানো রাঙা মাটির প্রান্তর, আর তারই মাঝে-মাঝে খালের মত ছোট ছোট এক একটি নদী সাপের মত এঁকে-বেঁকে কোথায় কোন্‌দিকে যে চলে গেছে কে জানে। বছরের অধিকাংশ সময়েই এই সব খালে থাকে শুক্‌নো সাদা বালি, বর্ষার কয়েকটা মাস শুধু ঘোলাটে জলে এই সব খাল কানায় কানায় থৈ থৈ করে, পশ্চিমের কোন্ একটা পাহাড় থেকে নাকি গিরি-মাটির ঢল্ নামে।

যাই হোক, এই বাড়ীখানি তৈরি করবার ইতিহাস আমরা শুনেছি। বাড়ীর মালিক নগেন চৌধুরী অনেকদিন আগেই মারা গেছেন। এখন তাঁর দুই নাতি রয়েছে বেঁচে। নগেনবাবু ছিলেন গরীবের ছেলে। কলকাতা শহরে অতি কষ্টে তাঁদের দিন চলতো। নগেনবাবু কিন্তু নিজের চেষ্টায় শিমূল তুলো আর হরীতকীর ব্যবসা করে বড়লোক হন্। এই দুটো জিনিসের জন্যে প্রায়ই তাঁকে এ-অঞ্চলে আসতে হ'তো। এসে তিনি এই কাঞ্চিপুর শহরেই উঠতেন। উঠতেন বিনয় গোস্বামী ব'লে এক ভদ্রলোকের বাসায়। এই বিনয়বাবু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে তাঁর জন্যে হরীতকী সংগ্রহ করতেন।

হঠাৎ একদিন বিনয়বাবুর হ'লো কিছু টাকার দরকার। নগেনবাবু তাঁকে পঁচিশটি টাকা ধার দিলেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-টাকা তিনি আর শোধ করতে পারলেন না। থাকবার মধ্যে ছিল তাঁর ওই ফাঁকা মাঠের ওপর একটুখানি জমি। ভেবেছিলেন তাঁর মেজ মেয়েকে ওই জমিটুকু তিনি দান করবেন। কারণ আর-সব মেয়েদের বিয়ে দিয়েছেন ভাল ঘর-দেখে, শুধু মেজ মেয়েটাই কষ্টে পড়েছে। বেচারার কিছু নেই।

তা আর হ'য়ে উঠলো না। নগেনবাবু ক্রমাগত টাকার তাগাদা করতে লাগলেন। কলকাতা থেকে চিঠি লিখলেন—তোমার হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ প্রায় তিন বছর হ'তে

চললো। সুদে-আসলে তোমার ঋণের টাকা পরিশোধ কববার ব্যবস্থা যদি না কর ত' বাধ্য হয়ে আমায় নালিশ করতে হবে।

বিনয়বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। শরীব তাঁর অত্যন্ত অসুস্থ, কবে মারা যান কে জানে। মরবার আগে কোনরকমের ঋণ তিনি রেখে যেতে চান না। তবে নগেনবাবু ইচ্ছে করলে এই সামান্য টাকার ঋণ থেকে তাঁকে রেহাই দিতে পারতেন। দেওয়া বোধ হয় উচিত ছিল। কারণ রোদ্দুর নেই, বৃষ্টি নেই, দিবারাত্রি তিনি বহু দূরেব জঙ্গলে জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে হবীতকী সংগ্রহ করেছেন, এবং তাঁর জন্যে তিনি নিজে পেয়েছেন মাত্র পনেরোটি টাকা মাইনে, আব নগেনবাবু পেয়েছেন হাজার হাজার টাকা লাভ। তা পান, তাতে তাঁর হিংসে করবার কিছু নেই, তিনি চেয়েছিলেন মাত্র এই পঁচিশটি টাকার ঋণ থেকে মুক্তি।

কিন্তু তা তিনি পেলেন না। হ্যাণ্ডনোট তামাদি হবার তারিখ যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, নগেনবাবুব তাগাদা ততই যেন বাড়ে। চিঠির পর চিঠি, লোকের পর লোক, শেষে একদিন নিজে এসে হাজির হ'লেন।

বিনয়বাবু বললেন, নগদ টাকা আমার হাতে থাকলে আপনার এ ঋণ রাখতাম না, এখন কি করি তাই ভাবছি।

নগেনবাবু বললেন, ভাবতে ভাবতে হ্যাণ্ডনোটের মেয়াদ যে ফুরিয়ে গেল। বিনয়বাবু বললেন, আমার থাকবার মধ্যে আছে শুধু ওই ফাঁকা ডাঙ্গার মধ্যে একটুখানি জায়গা। ভেবেছিলাম ও জায়গাটুকু আমার মেজ মেয়েটাকে দেবো, বেচারার বাড়ী-ঘর-দোর কিছু নেই, বড় কষ্টে দিন চলে। আপনাকে দিতে হ'লে ওইটুকুই দিতে হয়।

নগেনবাবু বললেন, তাই দাও।

বিনয়বাবু বললেন, কিন্তু ওর দাম—

নগেনবাবু সে-কথাটা তাঁর হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, পাগল হয়েছ? তোমার ও জমির কি কিছু দাম আছে নাকি?—ওখানে শুকনো ওই কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার মধ্যে জমি নিয়ে মানুষ করবে কি?

এমনি-সব নানান কথা বলে জমিটুকু নগেনবাবু তাঁর কাছ থেকে লিখিয়ে নিলেন।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথা রইলো, ওখানে বাড়ী যখন তিনি তৈরি করবেন, বিনয়বাবুর মেজ মেয়েকে তখন কিছু টাকা দেবেন।

বিনয়বাবু ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন। নগেনবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে



বললেন, দেখবেন সার্, দেবেন যেন। মেয়েটার আমার কিচ্ছু নেই

নগেনবাবু প্রতিশ্রুত হলেন।

তারপরেই বিনয়বাবু গেলেন মরে।

জায়গাটা এতদিন এমনি পড়েই ছিল। নগেনবাবু ভেবেছিলেন, শহরটা নিশ্চয়ই এই দিক পানে এগিয়ে আসবে, তখন তিনি কারও কাছ থেকে বেশ একটা মোটা রকমের দাঁও মেরে নিয়ে জায়গাটা দেবেন বেচে।

কিন্তু সে সুবিধা তিনি আর পেলেন না। শহরটা এগিয়ে আসতে আসতে খালের মত ছোট্ট ওই নদীটার কিনারে এসেই থমকে থামলো। সেই যে থামলো, সেইখানেই

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গেল তার গতি রুদ্ধ হয়ে। তার কারণ—বর্ষা কয়েকমাস এতটুকু ওই নদীর চেহারা হয় বড় ভয়ঙ্কর, জলের তোড়ে কারও সাধ্য থাকে না যে পার হয়ে ওপারে যায়। একবার একটা গরু নাকি পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে জল খাবার জন্যে মনের ভুলে ওইখানে গিয়ে নেমেছিল। বাস্—নিমেষের মধ্যে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। স্রোতের জল কোথায় যে তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ফেললে কে জানে!

নগেনবাবু তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। সর্ব্বপ্রথম ওই খালের ওপর বাঁধলেন লোহা দিয়ে এক চমৎকার পুল। তারপব আবম্ভ করলেন বিনয়বাবুর-দেওয়া সেই জায়গাটার ওপর প্রকাণ্ড এক বাড়ী।

দেখতে দেখতে খুব সুন্দব একখানি বাড়ী তৈরি হয়ে গেল। বিনয়বাবুর মেজ মেয়ে একদিন তার কোলেব ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে ধীরে-ধীরে তাঁব কাছে এসে দাঁড়াল। বল্‌লে,



জ্যেঠা-মশাই, বাড়ী তৈরি করবার সময় আমায় কিছু দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছি।

নগেনবাবু বললেন, কখন বলেছিলাম? কি বলেছিলাম?

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কোনও কথাই তাঁর মনে পড়লো না। ঘাড় নেড়ে বললেন, না। এ সময় এই বাড়ীটা তৈরি করতে এত-এত টাকা আমার খরচ হয়ে গেল, এখন আমি কাউকে কিছু দিতে পারব না।

মেয়েটা বড় আশায় এসেছিল। বললে, দিলে আমার বড় উপকার করা হ'তো জ্যাঠামশাই, বড় বিপদে পড়েই আমি এসেছিলাম আপনার কাছে।

বলতে গিয়ে চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো। নগেনবাবুর দয়া কিছুতেই হ'লো না। বললেন, দান-খয়রাৎ করতে হ'লে তোমার মতন এমন অনেক আছে সুশীলা। এখানে তুমি মিছেই এসেছ। কিছু পাবে না।'

সুশীলা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিল, নগেনবাবু তাকে ডেকে বললেন, কষ্ট ক'রে এসেছ যখন, তখন তোমার গাড়ী-ভাড়ার দরুণ এই একটি টাকা আমি দিতে পারি, নিয়ে যাও।

সুশীলার পায়ের কাছে টাকাটা তিনি ছুঁড়ে দিলেন।

সুশীলার কাছে এখন একটি টাকার দামও বড় কম নয়। তা সত্ত্বেও টাকাটা সে নগেনবাবুর গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি আবার চলে গেল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

* * * *

এ হেন জায়গায় এই ত' গেল নগেনবাবুর বাড়ী তৈরির ইতিহাস। সুশীলা সেদিন আর তার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যেতে পারলে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। তখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি। পায়ের তলার মাটি তেতে একেবারে আগুন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যেবেলা শাল-মহুয়ার জঙ্গল থেকে যখন দখিনা বাতাস বইতে থাকে তখন যেন একটু-খানি ঠাণ্ডা হয়, তার আগে সারাটা দিন এই দারুণ গরমের মধ্যে মানুষগুলো ছটফট্ করে। সুশীলা ভাবলে, সন্ধ্যার পরেই সে এখান থেকে রওনা হবে। শ্বশুরবাড়ী অবশ্য তার বেশী দূরে নয়, কিন্তু যত কাছেই হোক্, চারিদিকে আগুনের হল্‌কা বইছে, এ অবস্থায় ছোট্ট এই ছেলেটিকে কোলে নিয়ে পথ হাঁটা তার পক্ষে অসম্ভব।

সুশীলা কাঞ্চিপুরেই ফিরে এলো তার ভাইয়ের কাছে। একটিমাত্র ভাই সরোজ। বিনয়বাবুর ওই এক ছেলে। কাঞ্চিপুরেই কোন্ একটা মাড়োয়ারীর গদিতে চাকরি করে।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তেরোটি টাকা মাইনে পায়। সংসার তার তাইতেই চলে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে তাই রক্ষে, নইলে চলতো কি না সন্দেহ।

সুশীলা ফিরে আসতেই জিজ্ঞাসা করলে, দিলেন কিছু ?

সুশীলার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

দিলেন না ? কি বললেন ?

পিপাসায় তখন তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। বললে, দাঁড়া, বলছি। এক গ্লাস জল খাই আগে।

জল খেয়ে সুশীলা যা বললে, শুনে সরোজের ভারি রাগ হ'লো। বললে, একদম অস্বীকার ক'রে দিলে ? বললে কিছু দেবার কথা ছিল না ? আচ্ছা মানুষ ত' ? সুশীলা বললে, মরবার সময় পর্য্যন্ত বাবা তার এত ক'রে গেল, আর সেই লোকটাকে পঁচিশটি টাকা যে ছেড়ে দিতে পারলে না, সে কেমন লোক সেইখানেই বুঝে ছাখ্।

সরোজ বললে, কিন্তু আমাদের ঐ জায়গাটার দাম অনেক বেশী। আমরা খদ্দের পেলাম না তাই, তা নইলে—

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো।

সরোজ বললে, আমি একবার যাই মেজ্‌দি, দেখি ও কি বলে। সুশীলা হাত নেড়ে বললে, না, যাস্‌নে সরোজ, আমি মেয়েমানুষ, আমি নিজে গেলাম, আমাকেই যখন জবাব দিলে, তোকে ত' তখন দেবেই।

সরোজ বললে, কিন্তু এতে ওর ভাল হবে না, এই আমি বলে রাখলাম মেজ্‌দি।

সুশীলা তার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হেসে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সুশীলা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। এখান থেকে ক্রোশ-খানেক্ দূরে কস্‌বায় তার শ্বশুরবাড়ী। আজ তাকে সেখানে যেতেই হবে—তা সে যত রাত্রিই হোক্। সেখানে তার শ্বশুর শাশুড়ী ননদ দেওর কেউ নেই, আছে মাত্র তার স্বামী। তিনটি ছেলে। দুটি বাড়ীতে আছে, আর এই একটি তার কোলে। সেখানে তাকে যেতে হবে শুধু এই জন্যে যে, স্বামী তার অসুস্থ. প্রায় একটি বৎসর হ'তে চললো

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সে শয্যাশায়ী। লাঠি ধরে উঠে হেঁটে চলে-ফিরে বেড়ায় বটে, কিন্তু সে নামমাত্র, বাঁচবার আশা এখনও তার নেই। বিয়ে যখন তার হ'য়েছিল, স্বামী তখন একটা লোহার কারখানায় চাকরি করছে, আশী টাকা মাইনে, দেখতে শুনতে চমৎকার। কাজেই বিনয়বাবু অন্যায় কিছু করেন নি। কিন্তু সুশীলার বোধ করি কপাল মন্দ। লোহার কারখানায় চাকরি করতে করতে হঠাৎ একদিন এক অঘটন ঘটে গেল। কারখানার কুলি-মজুরেরা ধর্ম্মঘট ক'রে কাজে এলো না। কোম্পানীর লোকসান হ'তে লাগলো। সুশীলার স্বামী উমানাথ ছিল বড় বাবু। সাহেব বললেন, তুমি ছাখো উমানাথ, কিছু করতে পার কি-না। উমানাথ তখন সাহেবের ডান হাত। খাতিরও যত, প্রতাপও তত। তৎক্ষণাৎ বেরুলো একটা চাবুক হাতে নিয়ে। কুলি-ব্যাবাকে গিয়ে দেখে, তারা তখন মদ খেয়ে হাল্লা করছে। উমানাথ প্রথমে তাদের মিষ্টি কথায় বুঝাতে চাইলে। কিন্তু তাদের ধারণা—এই উমানাথের জন্যেই মাইনে তাদেব বাড়ছে না। একজন সর্দ্দার মত্ত অবস্থায় তার কাছে এগিয়ে এসে বললে, আমাদের মাইনে বাড়িয়ে দে, আমরা কাজে যাচ্ছি। উমানাথ বললে, চল্ আগে, তার পর দেখা যাবে। সর্দ্দার বললে, কিছুতেই যাব না, টাকা আগে আন্ এইখানে, আমরা দেখি, তার পর যাব। উমানাথ তার জবাবে চড়া গলায় কি যেন বলতেই মাতাল সর্দ্দারটা তার গালে মেরে বসলো এক চড়! উমানাথ এলোপাথাড়ি চালালে তার হাতের চাবুক। উন্মত্ত জনতা গেল ক্ষেপে। উমানাথকে তারা এমন মার মারলে যে, সে সেইখানেই অচেতন হ'য়ে পড়ে রইলো। খবর পেয়ে সাহেব নিজে গেল।

শেষ পর্য্যন্ত সেই সবই হ'লো, ধর্ম্মঘট যারা করেছিল তাদের মাইনেও বাড়লো, তারা কাজেও গেল, মাঝখান থেকে উমানাথ রইলো হাঁসপাতালে। বাঁচবার কোনও আশাই তার ছিল না। শেষে তিন মাস পরে মাত্র প্রাণটুকু নিয়ে সে হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলো। সেই তারই জের এখনও চলছে। এখনও সে সেরে উঠতে পারে নি।

হাঁসপাতালে যতদিন সে ছিল, কোম্পানী তার বাড়ীতে মাসে মাসে পঞ্চাশটি ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে বেরোবার পর কোম্পানী সে টাকা দিলে বন্ধ ক'রে।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উমানাথ বড়-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলে। সাহেব বললে, টাকা ত' আমার নয় বাবু, টাকা লিমিটেড-কোম্পানীব। আচ্ছা দেখি, আমি তোমার জন্যে কি কবতে পারি।

তার পর প্রথমে কয়েক মাস দিলে দশ টাকা ক'রে, এখন সেই দশ টাকা সাত টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাও-বা কোনও মাসে আসে, কোনও মাসে আসে না। গরুর গাড়ী চ'ড়ে কারখানায় গিয়ে উমানাথকে সেই সাতটি টাকা নিজে নিয়ে আসতে হয়।

সাত টাকায় সংসার তাব চলে না, দুঃখ-কষ্টেব আর সীমা নাই। বিনয়বাবুও তা মববার আগে জেনে গেছেন, সরোজও তা জানে।

আজই কস্‌বা থেকে এসে আবার আজই সুশীলা কস্‌বায় ফিরে যাবে শুনে সবোজের মনটা কেমন যেন করে উঠলো। অন্য বোনেরা এলে যদি-বা দু'চার দিন থেকে যায়, এই বোনটির কিন্তু থাকবার উপায় নেই। সবোজের এক-এক সময় মনে হয় সে যদি কোথাও থেকে কিছু টাকা পেতো ত' তার এই মেজদিদির দুঃখ কষ্ট কিছুই থাকতো না। উমানাথকে ভাল ক'রে ডাক্তাব দেখানো দরকার, টাকার অভাবে তাও হয় না। দু' বেলা পেট ভরে খেতেই পায় না ত' ডাক্তার দেখাবে কোথেকে!

সরোজ জিজ্ঞাসা কবলে, আজ তোমাকে যেতেই হবে, না মেজ্‌দি?

সুশীলা বললে, হ্যাঁ ভাই, না গেলে কেউ যে খেতে পাবে না! সরোজ তক্ষুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে একখানা গরুব গাড়ী ডেকে আনলে।

সুশীলা তার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে গাড়ীতে চড়তে গিয়ে দেখে, সরোজ কোন্ সময় কাপড়ের একটা পৌটলায় কতকগুলো চাল, কিছু ডাল আর কিছু তরকারি দিয়েছে বেঁধে।

সুশীলা বললে, তুই আবার কেন এ-সব দিতে গেলি বল্ ত'?

সরোজ এমনি ভাবে চুপ করে রইলো যে তার মুখখানা দেখলেও কষ্ট হয়। সুশীলা তার এই ভাইটির অবস্থাও জানে। অথচ এগুলি সে না যদি নেয় ত' সরোজের দুঃখের আর সীমা থাকবে না।

সরোজ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অতি কষ্টে তার চোখের জল চেপে বললে, নে মেজ্‌দি, ওঠ্।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সুশীলা তার এই ভাইটির মুখের পানে তাকাতে তাকাতে গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিলে।

আবছা জ্যোৎস্নার আলোয় গাড়ীর ভেতর সুশীলার মুখখানা আর দেখা গেল না। সরোজ কিন্তু সেইদিক পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। যে-কথাটা সে তার মুখের ওপর বলতে পারলে না, এতক্ষণ পরে বোধ করি সেই কথাটাই সে চুপি চুপি আপন মনেই বলে উঠলো—ওই কি আর দেওয়া দিদি? আমারও যে—

চোখ দুটো তার জলে ছল্ ছল্ ক'রে এলো, কথাটা সে আর শেষ করতে পারলে না।

*　　　*　　　*　　　*

নগেনবাবু বাড়ী তৈরি করবার জন্যে এখানে এসেছিলেন। টাকার জোরে অসম্ভবও যে সম্ভব হতে পারে তা তিনি দেখিয়ে দিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মে বাড়ী থেকে লোকজন এক পা বেরোতে পারে না, আর তিনি কিনা রীতিমত জন-মজুর খাটিয়ে চমৎকার ঐ দোতলা বাড়ীখানি শেষ ক'রে ফেললেন।

বাড়ী শেষ ক'রেই তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন শ্রাবণ মাসে। চারিদিকে তখন বর্ষা নেমেছে।

এবার কিন্তু তিনি একা এলেন না; এলেন সপরিবারে। এখানকার এই নূতন বাড়ীতে কিছুদিন বাস করবার জন্যে।

এসেই খুব ধুমধাম করে গৃহপ্রবেশের উৎসব সুরু হ'লো। কাঞ্চিপুর শহরের অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ ক'রলেন। সেই সঙ্গে সরোজকেও বাদ দিলেন না।

রূপোলী কাগজের ওপর সোনালী অক্ষরে ছাপা নিমন্ত্রণের পত্রখানির দিকে সরোজ একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছে, অদৃষ্টের এম্‌নি পরিহাস, ঠিক সেই সময় এলো কস্‌বা থেকে একটা লোক—সুশীলার একখানি চিঠি নিয়ে।

সুশীলা লিখেছে :—

ভাই সরোজ, তোমাদের জামাইবাবুর অবস্থা খুব খারাপ, পারো ত' একটিবার এসো! আমি একা কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সরোজ তক্ষুনি ছুটলো তার চাকরির জায়গায়। একটি দিনের ছুটি নিয়ে সে কস্‌বায় গেল।

গিয়ে দেখে, উমানাথ মর-মর। তখনও মরে নি, কিন্তু মরবার দেরিও বিশেষ নেই। সুশীলা গুম্ হ'য়ে তার শিয়রের কাছে বসে আছে, এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, চোখে একফোঁটা জল নেই।

সরোজকে দেখে বললে, আয় বোস্, আর দেরি নেই।

দেরি নেই—কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করলে যে, শুনে অতি বড় পাষণ্ডেরও চোখে জল আসে।



সরোজ দেখলে, উমানাথ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে আছে, চোখের কোণে দু' ফোঁটা জল। মুখে কথা নেই, বুকের স্পন্দন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা ক'রলে, ছেলেরা কোথায়?

সুশীলা মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিলে। দেখা গেল, এক থালা মুড়ি নিয়ে

আহরিকা

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

তারা দু' ভাই-এ খেতে বসেছে, আব ছোট ছেলেটি এক-গা ধুলো-মাটি মেখে উঠোনে আপন মনেই খেলা করছে।

সরোজ বললে, কারখানার সাহেবকে একবাব খবর দিলিনি কেন মেজ্‌দি? এ সময় টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য না করুন, হাঁসপাতালের ডাক্তারকেও ত' একবাব পাঠিযে দিতে পারতেন!

সুশীলা গম্ভীরমুখে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

সরোজ চুপ ক'বে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সুশীলা আবাব বললে, না ভাই, সাহায্য আর কারও কাছে চাইব না। যা হয় হোক'।

মনে হ'লো, সুশীলা সাহসে বুক বেঁধেছে।

তা সে-কথা বোধ হয় সত্যি।

সন্ধ্যার আগেই উমানাথ মবে গেল। সরোজ ভেবেছিল সুশীলাকে এ অবস্থায় সাম্‌লানো হয়ত' দায় হ'য়ে উঠবে। কিন্তু সাম্‌লানো দূবেব কথা, চোখ দিয়ে তার এক ফোঁটা জলও পড়লো না। শ্মশানে গিয়ে হাতের শাঁখা নোয়া ফেলে, সিঁথির সিন্দূর মুছে সে বাড়ী ফিরে এলো।

শ্মশানে মড়া পুড়িয়ে শ্মশান-বন্ধুদের বাড়ী ফিরতে হয়। সরোজ তার গায়ের জামাটা খুলে কাচতে গিয়ে পকেট থেকে নগেনবাবুর গৃহ-প্রবেশের সেই রঙিন চিঠিখানি বেব ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

সুশীলাব ভাঙ্গা-শাঁখা আব নোয়ার কাছে সোনালীবঙের সেই নিমন্ত্রণেব চিঠিখানি জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল।

* * * *

এ অবস্থায় সুশীলা তার ঐ ছোট ছোট ছেলে তিনটি নিয়ে একা তার এই শ্বশুর-বাড়ীতে থাকবে কেমন ক'রে ভেবে সরোজ বললে, চল্ মেজ্‌দি, তুই আমার ওখানেই চল্।

সুশীলার চোখদুটো লাল। লুকিয়ে কেঁদেছে কিনা তাই-বা কে জানে! ঘাড় নেড়ে বললে, না।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সরোজ বল্‌লে, এখানে থাকবি কেমন ক'রে মেজ্‌দি ? খাবি কি ?

সুশীলা বললে, সে ব্যবস্থা আমার আছে সরোজ, তুই বাড়ী যা।

সুশীলার এই বিপদে অন্যান্য লোকেরা তাকে সমবেদনা জানালে। বড়বোনের অবস্থা ভাল। সে চিঠি লিখে লোক পাঠালে। লোক এসে বললে, মা আপনাকে যেতে বলেছেন, চলুন আপনি ছেলেদের নিয়ে।

সুশীলা কিছুতেই গেল না। বললে, না বাবা, আমার যাবার উপায় নেই। দিদিকে বোলো আমি বেশ ভালই আছি।

এমনি ক'রে সুশীলা তার স্বামীর ভিটে আঁকড়ে প'ড়ে রইলো।

* * * *

সরোজ তার এই মেজ-দিদিটির খবর মাঝে মাঝে নিত। কতবার বলতো, দিদি, এখনও বল্‌ছি তুই চল্‌ আমার কাছে।

সুশীলা বলতো, না রে না, যাবার হ'লে অনেক আগেই যেতাম।

কিন্তু এমন ক'রে তুই যে মরে যাবি দিদি !

সুশীলা তার ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হেসে বলতো, মরে যাব ? তা বেশ ত' সব জ্বালাই জুড়িয়ে যাবে !

সরোজ আর কোনও কথা বলতো না। সুশীলার মুখের হাসি দেখে তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠতো, চোখদুটো ছল ছল্‌ ক'রে আসতেই সেখান থেকে সে লুকিয়ে পালাতো।

এমনি ক'রে মাস-পাঁচ ছয় কাট্‌লো কোন রকমে। তার পর হঠাৎ একদিন দুপুরে সরোজ বাড়ী থেকে বেরোতে যাচ্ছে, দরজায় দেখলে সুশীলার ছেলে তিনটে এসে হাজির। ছোট সেই বাচ্ছা-ছেলেটাকেও তারা টানতে টানতে হিঁচ্‌ড়ে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে এসেছে।

সরোজ জিজ্ঞাসা করলে, কিরে, তোরা এলি কোত্থেকে ? মেজ্‌দি কোথায় ?

বড় ছেলেটা বললে, মা মরে গেছে !

মেজ ছেলেটা তার গালে এক চড় মেরে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, বাঃ ! বেণী-কাকা যা বলতে বললে তাই বল্‌না !

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সরোজের মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে গেল।

বললে, বেণী কাকা কে রে? সে-ই তোদেব এখানে পাঠালে বুঝি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, বলছি দাঁড়াও, একে একবার ধরো ত'! ব'লে তাব ছোট ভাইটিকে মামাব কোলে তুলে দিয়ে মেজ ছেলেটা বললে, বেণী-কাকাকে চেনো না মামা? সেই যে বুড়ো মতন চোখে চশমা—

সরোজ তখন সুশীলার খবব জানবাব জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। বললে, চুলোয় যাক্ তোর বেণী কাকা! তোর মা কেমন আছে বল্!

ওই যে বললাম গো, মরেনি এখনও, মবছে। বেণী-কাকা বললে তোব মামাকে নিয়ে আসবি সঙ্গে ক'রে। চল—তোমাকে নিতেই আমরা এসেছি।

ছোট ছেলেটাকে সবোজ তার স্ত্রীর কাছে বেখে এদের দু'জনাকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লো। বললে, চল্, দেখি।

গিয়ে দেখে, সত্যই তাই। ঘবের এক কোণে উমানাথ যেখানে মবেছিল ঠিক সেইখানে সুশীলা নির্জ্জীবের মত চুপ কবে শুয়ে শুয়ে আপন মনেই বিড বিড় ববে কি যেন বলছে। মানুষ-অভাবে শুশ্রূষা হয় নি, অর্থের অভাবে ডাক্তাব আসে নি, কবে থেকে এ রকম অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে তাই-বা কে জানে। ছেলে দুটো কিছুই ঠিক ক'রে বলতে পারে না। বডটা বলে, পরশু, ত' মেজটা বলে, না, তারও আগে—তুমি ওর কথা শুনো না মামা।

বড় বলে, ইষ্টুপিট্ আচ্ছা মিথ্যেবাদী ত'? ডাক্‌বো বেণী-কাকাকে?

মেজ বলে, ডাক্ না! বেণী-কাকা ত' এখন ইস্কুলে আছে।

বড় বলে, দেখেছ মামা, ওর বুদ্ধি দ্যাখো! আজ রবিবার না? ইস্কুলের ছুটি ত'।

সরোজ বললে, কই ডাক্ দেখি—যা দৌড়ে যা।

রেডী! ওয়ান্, টু, থ্রি!—ব'লে দুজনেই ছুটলো।

সরোজ দেখলে, সুশীলা মাঝে-মাঝে চোখ চেয়ে তাকাচ্ছে বটে, কিন্তু চিনতে কাউকেই পারছে না।

সরোজ ডাকলে, মেজদি—দিদি।

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বলতে গিয়ে ঠোঁট ছুটো তার থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো, চোখ ছুটো জলে ভরে এলো।

সুশীলা কিন্তু সেদিকে কানও দিলে না, চিনতেও পারলে না। হঠাৎ বোধ করি বিকারের ঘোরেই চীৎকার ক'রে উঠলো, বাবা! এসো বাবা, এসে বোসো এইখানে। এতদিন পরে আমাকে মনে পড়লো বাবা?

সরোজের চোখ দিয়ে তখন দর দর করে জল গড়াচ্ছে।—মেজ্‌দি! ও মেজ্‌দি! বাবা কোথায়?

সুশীলা কষ্টে যেন তার বাবার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।— জ্যেঠামশাইকে তুমি এত ক'রে বলে গেলে বাবা, কিন্তু জ্যেঠামশাই কিছু দিলে না। কেমন সুন্দর বাড়ী করেছে দেখেছ?

এমন সময় বেণী-কাকা এসে ঘরে ঢুকলো। মাথার চুলগুলো কতক্ কাঁচা, কতক্ পাকা, গলায় ধপ্-ধপে সাদা পৈতে, পায়ে খড়ম্।

এসেই সরোজের দিকে তাকিয়ে বললে, এই যে, তুমি এসেছ বাবা? ভালই হ'য়েছে। আমি এই পাশের বাড়ীতেই থাকি।

এমন সময় সুশীলা আবার কি যেন বলে উঠলো। ছু'জনেই সেই দিকে তাকালে। বেণী-কাকা বললে, ওই ছাখো বাবা, ওই এক কথা আজ তিন দিন ধরে' বলছে। জ্যেঠামশাই কেমন সুন্দর বাড়ী তৈরি করেছে; জ্যেঠামশাই কিছু দিলে না বাবা····· এই সব।

কথাবার্ত্তায় জানতে পারা গেল, এই লোকটিই সুশীলার প্রতিবেশী, উমানাথ মরবার পর থেকে ইনিই তাকে দেখাশোনা ক'রছেন, কিন্তু এবার আর শুধু দেখাশোনায় চলবে না, ভাল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে, অথচ পবের জন্যে খরচ করবার মত পয়সা তাঁর নেই, কাজেই আজ সকালে তিনি ছেলেদের পাঠিয়েছিলেন সরোজের কাছে।

সরোজ ভাল একজন ডাক্তার নিয়ে এলো, কিন্তু কিছুতেই তার জ্ঞান ফিরলো না। সরোজ নিজে অনেক ডাক্‌লে, মেজ্‌দি, মেজ্‌দি! অনেক কাঁদলে। বললে, মেজ্‌দি, তুমি যে আমায় খুব বেশী ভালবাসতে মেজ্‌দি, আমায় শুধু একবার তুমি সাড়া দাও, একটিবার ফিরে তাকাও আমার দিকে!

আহরিকা

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সরোজ কেঁদে কেঁদে সারা হ'লো, ছেলে ছুটো কাঁদতে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। উপবাসে অনাহারে বিনা শুশ্রূষায় বিনা চিকিৎসায় সেই দিনই রাত্রে সে মরে' গেল।

ছোট ছোট ছেলে তিনটিকে একেবারে নিরাশ্রয় ক'রে দিয়ে মরবার ইচ্ছে সুশীলার ছিল না, তবু তাঁকে মরতে হ'লো।

ছেলে ছুটিকে সঙ্গে নিয়ে কস্‌বার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সরোজ বাড়ী ফিরে এলো।

সুশীলার মৃত্যুর শোক তখনও সে ভোলেনি, এমন দিনে হঠাৎ একটা লোক এসে সরোজকে বললে, বাবু একবার আপনাকে ডাকছেন, আসুন!

সরোজ বললে, বাবু কে?

নগেনবাবু—ওই যে ওখানে ওই নতুন বাড়ী—

থাক্, আর বলতে হবে না। যাব, আজ সন্ধ্যার সময় দেখা ক'রে আসব।

লোকটা বললে, যাবেন কোথায়? বাবু ত' এই রাস্তায় রয়েছেন গাড়ীতে ব'সে। সরোজ তার পিছু পিছু রাস্তায় এসে দেখলে, নূতন একখানা ঝক্‌ঝকে মোটরের ওপর নগেনবাবু বসে আছেন। সরোজকে দেখেই বললেন, বলি, কি হে নবাব, নিমন্ত্রণ করলাম, খেতে গেলে না, তারপর শুনছি নাকি হরীতকীর ব্যবসা আরম্ভ করেছ?

সরোজ বললে, নিমন্ত্রণ যেদিন ক'রেছিলেন সেইদিন আমার মেজ ভগ্নীপতি মারা গেলেন, এখানে আমি ছিলাম না। তারপর গেল-রবিবারে মেজ্‌দিও মারা গেল।

নগেনবাবু বললেন, তোমার মেজ্‌দিদি মানে সুশীলা মারা গেছে?

একটা ঢোঁক্ গিলে সরোজ বললে, হুঁ।

চোখ দিয়ে তার টপ্ টপ্ করে' দু' ফোঁটা জল পড়লো। কিন্তু যাক্, সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে নগেনবাবু আসেন নি। তিনি এসেছেন—নূতন মোটর গাড়ীখানা দেখাতে, আর এসেছেন হরীতকীর কারবার সে ক'রছে কি না তাই জানতে।

বললেন, বাবা কি তোমার খদ্দেরদের একটা লিষ্টি রেখে গিয়েছিল নাকি? চুরি ত' সে অনেকই ক'রেছে, এও করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সরোজ তখন সুশীলার কথাই ভাবছিল। বললে, কি বলছেন ঠিক বুঝতে

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

পারলাম না। ভেংচি কেটে নগেনবাবু বললেন, তা বুঝবে কেন? লিষ্টি তোমার বাবা যদি না রেখে গেছে ত' কারবার তুমি সুরু করলে কেমন ক'রে?

সরোজ বললে, কারবার? কই, কারবার ত' আমি করিনি। আমি ত' সেই-খানেই সেই মাড়োয়ারীর গদিতে—

নগেনবাবু কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, বুঝেছি। টাকা মাড়োয়ারীর, আর তোমার . .হুঁ চালাও। কিন্তু ভাল কাজ করছ না সরোজ, এই আমি ব'লে গেলাম।

গাড়ী চ'লে গেল।

সরোজ অবাক্ হ'য়ে হাঁ ক'রে সেই দিকে চেয়ে রইলো।

নগেনবাবু কতবার যে এই কাঞ্চিপুরের নূতন বাড়ীতে এলেন আর গেলেন তার ইয়ত্বা নেই। এবার এসেছিলেন সপরিবারে নূতন মোটর গাড়ী নিয়ে। এখানকার লোকগুলোকে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে তাক্ লাগিয়ে দেবার জন্যেও বটে, আর স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া বদলাবার জন্যও বটে।

সেদিন হঠাৎ কি-একটা জরুরী কাজে তাঁকে কলকাতা যেতে হ'চ্ছিল। যাচ্ছিলেন একা। দু'দিন পরেই আবার ফিরে আসবেন।

গাড়ী ধরবার জন্যে ষ্টেশনে এলেন। একটুখানি আগেই এসে পড়েছেন। ট্রেণ আসতে তখনও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনে তিনি প্লাটফর্ম্মের একপাশে একখানা বেঞ্চের উপর চুপ করে বসে রইলেন। গ্রীষ্মকাল। ঝুর ঝুর ক'রে বাতাস বইছিল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় তন্দ্রা এলো।

ছোট্ট ষ্টেশন। প্লাটফর্ম্মে আলো এক রকম নেই বললেই হয়। আধো-আলো-অন্ধকারে তন্দ্রার ঘোরেই হঠাৎ তিনি চম্‌কে উঠলেন। ঠিক যেন মনে হ'লো, বিনয়বাবুর মেজ মেয়ে সুশীলা তার কাছে এসে হাতযোড় ক'রে বলছে, কিছু দিন্ না জ্যেঠামশাই, আমার বড় কষ্ট!

চম্‌কে জেগে উঠেই নগেনবাবুর মনে হ'লো তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখেন, দূরে এক অন্ধ ভিখারীকে সঙ্গে নিয়ে একটি মেয়ে ভিক্ষে চেয়ে চেয়ে বেড়াচ্ছে। যাক্, তাহলে স্বপ্ন নয়। সম্ভবতঃ ওদেরই কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এসে বেজেছিল, তাই এ-কথা তাঁর মনে হ'য়েছে। তবু ভালো।

আহেরিকা

গরীবের চোখের জল

শ্রীশৈলচানন্দ মুখোপাধ্যায়

অন্ধকারে প্লাটফর্মে বসে থাকতে তাঁর আর ইচ্ছে হ'লো না। লোকজনের সম্মুখে গিয়ে বসা যাক্—ভেবে যেই তিনি চেয়ার থেকে উঠতে গেলেন, অমনি তাঁর বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে উঠলো। হাত দিয়ে বুকটাকে চেপে ধরে তিনি আবার বসে পড়লেন। এমন ধারা যন্ত্রণা ত' তার কোনোদিন হয় না।

খানিকক্ষণ তেমনি চুপ করে বসে রইলেন। কিন্তু যন্ত্রণা যেন বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া তার উচিত হবে না। টিকিট নষ্ট হয় হোক্। মোটর নিয়ে শোফার তখনও ষ্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন ছেড়ে দিলে তবে সে বাড়ী ফিরে যাবে—এই হুকুম।

নগেনবাবু অতি কষ্টে ষ্টেশনের বাইরে গিয়ে মোটরে চড়ে বসলেন। শোফারকে বললেন, বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে চল। কলকাতা যাওয়া আজ আর হবে না।

নতুন বাড়ীতে গিয়ে নগেনবাবু শয্যা গ্রহণ করলেন। স্ত্রী পুত্র তাঁর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলো। ভাল ডাক্তার এখানে পাওয়া যায় না। তবু যেমন হোক্ একজন ডাক্তার আনবার জন্যে মোটর নিয়ে তাঁর এক ছেলে গেল শহরে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার এলেন। ডাক্তার যখন সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠছেন, এমন সময় রোগীর ঘর থেকে কান্নার রোল উঠলো।

ডাক্তার দেখলেন, সব শেষ হয়ে গেছে। রোগী হার্ট ফেল্ করেছে।

বাড়ীর কর্তা গেলেন চলে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়ে গিন্নি বললেন, চল বাবা, এখানে আর না।

কলকাতা যাবার বন্দোবস্ত হ'চ্ছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। গাড়ী রিজার্ভ করা হ'য়ে গেছে। নগেনবাবুর বড় ছেলে হঠাৎ ছটফট্ করতে লাগলো। কলেরা হ'য়েছে।

ডাক্তার ডাকবার জন্যে লোক ছুটলো মোটর নিয়ে। একজনের জায়গায় চারজন ডাক্তার এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। রোগী মরে গেল।

নগেনবাবুর বৃহৎ সংসার তার পরের দিনই কাঁদতে কাঁদতে কলকাতায় চলে গেল। কাশিপুরের নূতন বাড়ী খাঁ খাঁ করতে লাগলো।

নগেনবাবুর সংসারে কি অভিশাপ যে লাগলো কে জানে। নগেন বাবুর দুটি

মাত্র ছেলে। একজন ত' কাঞ্চিপুরেই মরেছে, বাকি যেটি ছিল, ছ' মাস পেরোতে না পেরোতে সেটিও গেল।

কাঞ্চিপুরের বাড়ীতে তারা জীবনে কেউ আর যাবে না প্রতিজ্ঞা ক'রেছে। লোকজন কেউ যেতে চাইলে তৎক্ষণাৎ তারা অনুমতি দেয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, কেউ সেখানে দশ দিনের বেশী থাকতে পারে না।

সেই থেকে সে অভিশপ্ত বাড়ী তেমনি খাঁ খাঁ ক'রছে। লোকে একে ভূতের বাড়ী বলবে না ত' কি আর বলবে।





বার-ভূঁইয়ার প্রতাপ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

(ঈশা খাঁ ও কেদার রায়)

বর্ত্তমান সময়ে প্রজা শাসন করিবার জন্য জেলায়, মহকুমায়, থানায় দেশের সকল জায়গায়ই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী আছেন। এই সকল সরকারী কর্ম্মচারীই দেশের ভিতরে শান্তিরক্ষা করেন, এবং প্রজাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার নিষ্পত্তি করেন। মোগল বাদশাহগণের অর্থাৎ নবাবী আমলে দেশ শাসনের রীতি অন্যরূপ ছিল। তখন দেশের ভিতরের শান্তিরক্ষার ভার ছিল জমীদার, তালুকদারদিগের উপর, এবং তাঁহারা গ্রামের পঞ্চায়তের সহায়তায় প্রজার মধ্যে বিবাদের নিষ্পত্তি করিতেন। তখন জমীদার, তালুকদারদিগের পাইক বা লাঠিয়াল রাখিবার অধিকার ছিল। বড় বড় জমীদারদিগের অনেক পাইক থাকিত। সুবাদার বা নবাব-নাজিম যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন তখন জমীদারী-ফৌজ নবাবী-ফৌজের সহিত যোগদান করিত।

মোগল (নবাবীর) আমলের পূর্ব্বে দেশের শাসনবিধি অন্য প্রকার ছিল। সমস্ত দেশটা কয়েকটা বড় জমীদারীতে বিভক্ত ছিল। এই সকল বড় জমীদারদিগকে বলিত ভূঁইয়া বা ভৌমিক। প্রবাদ আছে, আকবর বাদশাহ কর্ত্তৃক বাঙ্গলা দেশ অধিকৃত হইবার আগে সমস্ত দেশ বারজন ভৌমিকের শাসনাধীনে ছিল। ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আক্‌মহলের যুদ্ধে আকবরের সেনা শেষ পাঠান সুলতান দাউদ কররাণীকে পরাজিত এবং নিহত করিয়া

বার-ভূঁইয়ার প্রতাপ

আহরিকা

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

বাঙ্গলা দেশ মোগল সাম্রাজ্যের সামিল করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত বাঙ্গলা দেশে বাদশাহী শাসন বিস্তারের তখনও অনেক বিলম্ব ছিল। প্রথমতঃ পাঠান সর্দ্দারগণ মোগল শাসনে বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তারপর প্রায় স্বাধীন ভৌমিকগণের মধ্যে অনেকে (পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকগণ) মোগল বাদশাহের নিকট মাথা নত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই সকল স্বাধীনতাপ্রিয় ভৌমিকগণ আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সোণারগাঁয়ের ভৌমিক ঈশা খাঁ এই সঙ্ঘের নায়ক ছিলেন। আকবর বাদশাহের মন্ত্রী আবুল ফজলের "আকবর-নামায়" এবং তাহার পরিশিষ্টে ঈশা খাঁর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে

ঈশা খাঁর পিতা বৈশ্য-বংশীয় রাজপুত ছিলেন (এবং স্বয় মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন)। তিনি নদ নদীপূর্ণ সোণারগাঁয়ের এলাকায় অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেলিম খাঁ (সাহ) যখন দিল্লীর সুলতান (১৫৪৫ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দ) তখন তাজ খাঁ বৃহৎ এক দল সেনা লইয়া সোণারগাঁও রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। অনেক যুদ্ধের পর ঈশা খাঁর পিতা আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই আবার বিদ্রোহ আচরণ করিয়াছিলেন। তারপর পাঠান সেনাপতি কৌশলে তাহাকে হস্তগত করিয়া হত্যা করিলেন এবং তাঁহার দুই পুত্র ঈশা এবং ইসমাইলকে সওদাগরদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। সুলতান সেলিম সাহের মৃত্যুর পর তাজ খাঁ বাঙ্গলা দেশে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর মাতুল কুতুবুদ্দীন তাহার প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া ভাগিনেয়দ্বয়কে তুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া সোণারগাঁয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর নীতি সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখিয়াছেন

"পরিপক্ক বিচারশক্তির এবং স্থির বুদ্ধির জন্য ঈশা খাঁ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলার বার ভূঁইয়াকে আপনার অনুগত করিয়াছিলেন। তিনি দূরদর্শী এবং হুঁসিয়ার লোক ছিলেন, তিনি কখনও বঙ্গাধিপতিগণের দরবারে হাজির হইতেন না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতেন এবং উপহার পাঠাইতেন। দূরে থাকিয়া তিনি অধীনতা স্বীকার করিতেন।"

পাঠান সুলতানগণের সময় এইরূপ নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইলেও, মোগল বাদশাহ তাহা পছন্দ করিতেন না। দাউদের মৃত্যুর পর বাঙ্গলা আকবর বাদশাহের

বার-ভুঁইয়ার প্রতাপ

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে, ঈশা খাঁ আনুগত্য-স্বীকার-পত্র পাঠাইলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইল। বিদ্রোহী মাসুম কাবুলী -বাদসাহের সেনাপতি সাহবাজ খাঁর দ্বারা পরাজিত হইয়া ঈশা খাঁর রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। বিজয়ী সাহবাজ খাঁ মাসুম-কাবুলীর অনুসরণ করিয়া সোনারগাঁ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ঈশা খাঁ তখন কোচবিহারে ছিলেন। তিনি সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলে সাহবাজ খাঁ তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, হয় বিদ্রোহীগণকে মোগল সেনার হস্তে সমর্পণ কর, আর না হয় নিজ রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেও। ঈশা খাঁ এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। সাহবাজ খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ঈশা খাঁ তখন কি করিলেন? তিনি পরাজিত মোগল সেনার অনুসরণ করিলেন না, কিন্তু যে সকল হাতী এবং কামান তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল তাহা বাদশাহের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন এবং সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। আকবর অগত্যা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

পুনঃ পুনঃ এই প্রকার নীতির অনুসরণ করিয়া ঈশা খাঁ পনর বৎসর পরে, ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে, তাহার মৃত্যু পর্যন্ত দুই কূল বজায় রাখিতে, অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভৌমিক সঙ্ঘের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে, এবং মোগল বাদশাহের সহিত গুরুতর বিরোধ বর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তারপর এই সঙ্ঘের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন বিক্রমপুরের ভৌমিক কেদার রায়। কেদার রায়ের যুদ্ধ-লালসা প্রবল ছিল। তিনি নীতি অপেক্ষা যুদ্ধকে অধিকতর কার্যকরী মনে করিতেন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার সুবাদার মহারাজ মানসিংহ ঢাকায় উপস্থিত হইয়া, ভয় দেখাইয়া এবং ভরসা দিয়া, কেদার রায়কে বাদশাহের অনুগত হইতে সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। কেদার রায় আরাকানের মগ-রাজার সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া আবার মোগল বাদশাহের শত্রুতাচরণ আরম্ভ করিলেন। পর বৎসর মানসিংহ বৃহৎ একদল সেনা লইয়া কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন। শ্রীপুর এখন বিশাল কীর্তিনাশা নদীর উদর-গত। শ্রীপুরের উপকণ্ঠে উভয় সেনার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। কেদার রায় পরাজিত এবং স্বয়ং গোলার আঘাতে আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। অনুসরণকারী মোগল-সেনা তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া মানসিংহের নিকট উপস্থিত করিল। অত্যল্পকাল পরেই কেদারের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।



শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

রাজপুত্র মৃগয়া করিতে গিয়াছেন। সুন্দর হরিণ-শাবক সম্মুখ দিয়া লাফাইয়া পলাইয়া যাইতে দেখিয়া, তাহার পশ্চাতে তীর ধনু লইয়া ছুটিলেন। ছুটিতে ছুটিতে বহুদূরে গভীর বনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা যে কে কোথায় রহিয়া গেল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। বৃথাই পরিশ্রম করা হইল, কিন্তু হরিণ-শাবককে কিছুতেই তীরবিদ্ধ করা গেল না। এতবার মৃগয়ায় গিয়াছেন, কখনও তাঁহার তীর এরূপ ব্যর্থ হয় নাই। ক্লান্ত রাজপুত্র একটা গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন।

হঠাৎ অদূরে গাছের ফাঁক দিয়া রাজপুত্র যেন সেই হরিণ-শাবককে আবার দেখিতে পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গেই একটা তীর নিক্ষেপ করিয়া তিনি সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। কিন্তু হরিণ-শাবক তাঁহার চোখে পড়িল না, দেখিলেন যে, তাঁহার নিক্ষিপ্ত তীর একটা গাছের গোড়ায় বিঁধিয়া রহিয়াছে। রাজপুত্র নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন।

গভীর বনের মধ্য দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চলিয়াও যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিলেন না, তখন রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি পথ হারাইয়াছেন। মৃগয়ায় আসিয়া এরূপ পথের ভুল কতবার হইয়াছে, সেজন্য তিনি দমিলেন না, আন্দাজ করিয়া

পরীর দৃষ্টি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে একটী সরোবরের তীরে ফাঁকা জায়গায় আসিয়া পড়িলেন। সরোবরে অসংখ্য পদ্ম ফুটিয়া দৃশ্যটিকে অতি মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। চারিদিকে নানাজাতীয় হংসের যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে। রাজপুত্র স্থানটীর শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। সহজলভ্য পাখী শীকারে তাহার মোটেই স্পৃহা হইল না। তিনি সরোবরের নির্ম্মল জল পান করিয়া নিজের পিপাসা দূর করিলেন।



সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, বনের মধ্যে কোন দিকের পথ তিনি ধরিবেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। সেই ফাঁকা স্থানটুকুতে এখনও আলোর রেখা থাকিলেও ভিতরে ঘন অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সেই অন্ধকারে আর বনের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা না করিয়া, রাত্রের মত সামনের একটী বৃক্ষের উপর আশ্রয় গ্রহণ করাই তিনি সমীচীন মনে করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, শুক্লপক্ষের চন্দ্রের আলোকে স্থানটী আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া রাজপুত্র ভয়-ভাবনা ভুলিয়া গেলেন। তিনি বৃক্ষের উপর বসিয়া, কত বিভিন্ন জাতীয় নিশাচর পশু-পক্ষী পরে পরে আসিয়া জলপান করিয়া যাইতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রে পশু পক্ষীর যাওয়া আসা বন্ধ হইলে, সমস্ত স্থানটী একেবারে নীরব

পরীর দৃষ্টি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

হইয়া গেল। রাজপুত্রের তখন ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছে। তিনি মাথার পাগড়ী খুলিয়া, নিজেকে গাছের ডালের সহিত ভাল করিয়া বাঁধিয়া ঘুমের যোগাড় করিতে লাগিলেন। হঠাৎ চন্দ্র-কিরণের আরো জোর হইয়া গেল। রাজপুত্র ঊর্দ্ধে নির্ম্মল সুনীল আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মনে হইল যেন তারকা সমেত আকাশের খানিকটা অংশ পৃথিবীতে নামিয়া আসিতেছে। রাজপুত্র অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

নিজের চোখকে রাজপুত্র যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সরোবর-তট আলো করিয়া আকাশ হইতে এক অপূর্ব্ব রূপবতী পরী নামিয়া আসিয়াছে। পরণে তাহার আকাশের মতই নীল শাড়ী, তাহাতে রাশি রাশি তারকা লাগিয়া রহিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন চন্দ্রের কিরণ বাহির হইতেছে। চকিত চাহনিতে একবার চারিদিক দেখিয়া, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী জলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজপুত্র তাহার চক্ষের নীল তারা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।



রাজপুত্রের সঙ্গের লোকজন মশাল জ্বালিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বনে বনে তাঁহাকে বৃথা অন্বেষণ করিয়া, প্রভাতে সরোবরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ

আহেরিকা

পরীর দৃষ্টি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

একজনের দৃষ্টি পড়িল যে, রাজপুত্র একটী গাছের ডালের উপর নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাকে পাইয়া সকলে একসঙ্গে আনন্দধ্বনি করিল। সেই বিপুল আনন্দধ্বনিতে সমস্ত বন যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন কয়েকজনে গাছে উঠিয়া ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিল। চোখে মুখে সরোবরের নির্মল শীতল জল দিয়া বাতাস করিয়াও কোন ফল হইল না। রাজপুত্র গভীর নিদ্রাতেই মগ্ন রহিলেন।

নিদ্রিত রাজপুত্রকে লইয়া যখন সকলে রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাজা রাণী ও পুরবাসীরা বিস্ময় অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া আনা হইল। কিন্তু তিনি নানা চেষ্টা করিয়াও রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তখন জ্যোতিষীর ডাক পড়িল। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, ভয়ের কোনই কারণ নাই, শীঘ্রই রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইবে। তবে এ বিষয়ে দৈবজ্ঞের সাহায্য একান্ত আবশ্যক।

দৈবজ্ঞ-ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজপুত্রকে একবার দেখিয়াই সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ মন্ত্র-উচ্চারণ করিতে করিতে তিনবার রাজপুত্রকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার কাণে চুপি-চুপি কি যেন বলিলেন। রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন। সকলে আনন্দিত হইয়া উঠিল।

রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু তিনি নির্বাকভাবে কেবল চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন। রাজা-রাণী তাঁহাকে কত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, রাজপুত্রের কাছ হইতে কোনটিরই উত্তর মিলিল না। তখন দৈবজ্ঞ-ঠাকুর আর একবার রাজপুত্রের কাণে মন্ত্র পড়িতেই, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন —"নীল পরী"। এ কথার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া সকলেই দৈবজ্ঞ-ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিতেই দেখিতে পাইল যে, তিনি মৃদুহাস্য করিতেছেন।

রাজপুত্রের মুখে আর কোন কথা নাই, কেবল ঐ এক কথা "নীল পরী"। দৈবজ্ঞ-ঠাকুর বলিলেন, বনের যে স্থান হইতে নিদ্রিত অবস্থায় রাজপুত্রকে আনা হইয়াছে, সেইখানে আবার একবার লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে তিনি নিজেও যাইবেন।

পরীর দৃষ্টি

আহরিকা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

রাজ-আজ্ঞায় সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। শুভক্ষণ দেখিয়া সকলে যাত্রা করিলেন। বনের সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল। দৈবজ্ঞ-ঠাকুরের আদেশমত সঙ্গের লোকজন তাঁহাকে ও রাজপুত্রকে সেখানে রাখিয়া নিকটস্থ বনে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে দুইজনে বৃক্ষের উপর উঠিয়া বসিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহর কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় প্রহরও প্রায় শেষ, সেই সময় হঠাৎ রাজপুত্র—"ঐ ঐ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দৈবজ্ঞ-ঠাকুর উর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন, যেন তারকা-খচিত আকাশের পর্দা একটু করিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুত্রকে লইয়া বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিলেন। এক-খণ্ড বস্ত্রদ্বারা রাজপুত্রের চক্ষু আবৃত করিয়া দিয়া, তাহাকে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।

যথাসময়ে নীল-পরী সরোবরের তটে আসিয়া নামিল। চারিদিক যেন আলোয় ঝলমল্ করিতে লাগিল। দৈবজ্ঞ-ঠাকুর গোপনে সব দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু সাবধান রহিলেন যেন নীল-পরীর চোখের তারার দিকে দৃষ্টি না পড়ে। দৃষ্টি পড়িলে তিনিও যে রাজপুত্রের মত দৃষ্টিহীন হইয়া যাইবেন।

নীল-পরী একবার চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহার সুন্দর ডানা দুইটী সেই স্থানে খুলিয়া রাখিয়া, ধীরে ধীরে গিয়া জলে নামিল। তাহার পর অপূর্ব্ব জলক্রীড়া আরম্ভ করিয়া দিল। সেই নিশীথ রাত্রে সহস্র সহস্র হংস ও পদ্ম তাহার খেলার সাথী হইল।

সময় বুঝিয়া দৈবজ্ঞ-ঠাকুর রাজপুত্রের চোখের ঢাকা খুলিয়া দিলেন। রাজপুত্র দেখিলেন, নীল-পরী জলক্রীড়ায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি তাহার নিকটে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দৈবজ্ঞ-ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিয়া জানাইলেন যে, ডানা-বিহীন অবস্থায় নীল-পরী সাধারণ মানবীর-ই মত। যত কিছু শক্তি ঐ ডানা দু'টীর। এখন নীল-পরীর চোখের তারায় আর মানুষের দৃষ্টিশক্তি নাশ করার শক্তি নাই। রাজপুত্রকে নিঃশব্দে যাইয়া ডানা দু'টী স্পর্শ করিতে হইবে। মানুষের স্পর্শে ডানার অপূর্ব্ব শক্তিও নাশ হইয়া যাইবে।

পরীর দৃষ্টি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

রাজপুত্র ডানার নিকট যাইতেই দেখিলেন যে, নীলপরী ভয়চকিত হইয়া সেইদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহার বিচিত্র বর্ণে উজ্জ্বলবিন্দুর চিহ্নমাত্র নাই। রাজপুত্র তাড়াতাড়ি ডানা-দুটী স্পর্শ করিলেন। নীলপরী রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। চারি-চক্ষের মিলন হইল। [illegible] রাজপুত্র নীলপরীর সুনীল চোখের তারার মধ্যে নিজেরই প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন।



আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল

দেবজ্ঞ-ঠাকুর অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া উভয়ের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ জানাইলেন।



শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সন্ধ্যা-আকাশে নীরবে তখন
আঁধার আসিছে ছেয়ে,
দাওয়ার উপরে ছায়ার মতন
বসে' আছে কালো মেয়ে।
বিরল-বসতি ছোট গৃহখানি
গোটা-দুই কোঠা-ঘর,
অদূরে তাহারি বহিছে 'তুফানি',
সম্মুখে বালুচর।

পল্লীর গৃহ—স্তব্ধ রজনী,
সাঙ্গ যা-কিছু কাজ,
ডাকিল জননী -"উঠে' আয় ননি,
চুল্ বাঁধ্ বিনে আজ?"
চোরের মতন মেয়ে উঠে' এসে
বসিল মায়ের ডাকে,—
শব্দ যা' কিছু—চিরুণী ও কেশে,—
দোঁহে চুপ করে' থাকে।

আহরিকা

কালো মেয়ে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

বেড়ে' উঠে রাত—দ্বিতীয় প্রহর—
চৌকিদারের সাড়া,
গরীবের বাড়ী—বিধবার ঘর—
দিয়ে যায় কড়া-নাড়া;
শেয়ালের ডাক মিলাইয়া আসে
ঝাউ-ডাঙা বালুচরে,—
দুইটি শয্যা পড়ে পাশে-পাশে
নিশীথ-নীরব ঘরে।

জানালার পাশে সন্‌সন্‌ করি'
সাড়া দেয় 'শালবনী'
মা শুধায় ধীরে, ব্যথায় গুমরি'-
"ঘুম এলনাক' ননি?"
উত্তর আশে চাপা নিঃশ্বাসে
কণ্ঠ যে আসে ছেয়ে, -
চেয়ে রয় তাই অন্ধ আকাশে
আইবুড়ো কালো মেয়ে

থম্‌থম্‌ করে গভীর রাত্রি
প্রদীপ-নেবানো ঘরে,
আঁধার পথের যুগল-যাত্রী
তুফানির বালুচরে।
একের যাত্রা শেষ হ'য়ে আসে,
অন্যের শুধু সুরু;
কালের কপালে কোন্‌ পরিহাসে
কেঁপে উঠে কালো ভুরু!

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তা'য়,
বয়স—সে বিশ-পার,
জগতের চোখে কে-বা তারে চায়?
নিরুপায় চারিধার!
তবু এ রাত্রি শেষ হ'য়ে যাবে,
যতই ফাটুক্‌ বুক,—
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে—
দেখা'তে হবেনা মুখ?



কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

সেবাব গবমেব ছুটীটা কোথায় কাটাই ভাবছিলুম, এমনি সময়ে ডাক এলো মামাবাড়ী থেকে।

খামেব মোড়ক খুলতেই একখানা ছোট চিঠি হাত-ফস্কে পায়েব ও'পব প'ড়ে গেল, তুলে নিয়ে দেখলুম—পেঁচো লিখেছে –"সেজ্‌দা, চ'লে এসো শীগ্‌গির। রায়েদের পুকুবেব ছোটবড় মাছ, মুখুজ্জেদেব গাছেব কাঁচামিঠে আম কি এখনো তোমাব মনে সাড়া জাগায় নি ?"

নিজেব মনেই জবাব দিলুম –

সাড়া খুবই জাগিযেছে বে, কিন্তু উপায়ের উপব নির্ভবতাই আমাব বেশী, অতএব জিহ্বা-ভগবান যত লোলুপই হোক এবং মনের গতিও যত দ্রুত চালে চলুক, পা কিন্তু আমাব ঠিক অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে চ'লবে।

সুতরাং এ অনুযোগ বৃথা।

কিন্তু, মুখে ব'ললেও মনটা যেদিন ছুটীর আদেশ পেয়েই দেহটাকে টেনে এনে ট্রেণের কামরাব একটা বেঞ্চে উঠিয়ে দিলে, সেদিনটা ছিল মেঘ্‌লা। মাঝে মাঝে দম্‌কা হাওয়া বুকের হাড়-পর্য্যন্ত কাঁপন ধরাচ্ছিল।

জান্‌লার শার্শি টেনে, বিছানাটা পেতে সটান শুয়ে পড়লুম।

কামরাটা ছোট হ'লেও খালি; মানুষের মধ্যে একমাত্র আমিই আমাব আমিত্ব বজায় বেখে গলা ছেড়ে গান ধ'রলুম,—সেই বহুজন-পবিচিত সুবিখ্যাত গান—

আহেরিকা

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

“যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকা ধারা—
সভয়ে অবনা আবরে নয়ন লুপ্ত চন্দ্র তারা।”

*　　*　　*　　*

গলার স্বরটা বোধ হয় মিইয়ে এসেছিল, এমন সময়ে কাঁধের পাশ থেকে একটা করুণ কণ্ঠস্বর কানে এলো—

বলি, “মশায়ের কতদূর যাওয়া হবে? —নিবাস কোথায়?” প্রশ্নটা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতেই' উঠে বসলুম, দেখলুম—একটি ছোকরা।

ছোকরা গদি-আঁটা বোতামের পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়েই এই প্রশ্ন ক'রছে। উত্তর দেব কিনা ভাবছি, এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আবার প্রশ্ন ক'রলে “মশায়ের নাম?”

তার কৃশ তনু ও হাঁপানি দেখে বুঝলুম সে অসুস্থ, এর এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবার আমার পক্ষে একান্ত দরকার।

বললুম -

“এঁ, আমার নাম? আমার নাম শ্রীযুক্ত বড় খোকা। আদি নিবাস, বড়ি-বাটীতে, উপস্থিত কলিকাতায়। এখন যাচ্ছি মামার বাড়ী। তোমার ...”

ম্লানহাসি হেসে সে বললে—

“আমার আর পরিচয় কিছু দেবার নেই ভাই।— সমাজে, স্বাস্থ্যে, অবস্থায় হীন হ'য়ে কোনও রকমে বেঁচে আছি মাত্র, তাও না থাকারই প্রায়। কবে যে এ-দশা শেষ হবে তাই হ'চ্ছে এখন একমাত্র ভাবনা আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা।

জিজ্ঞাসা ক'রলুম

“তা তোমার অসুখ?”

“অসুখ! ”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব'ললে—

“রক্তহীনতা, আর যা কিছু খাই না কেন হজম হবার উপায় নেই। তার ওপোর বুক-ধড়ফড়ানি। মরার বাড়া হ'য়ে আছি মশায়। বাঁচতে আর তিলমাত্র ইচ্ছে নেই, কিন্তু বাড়ীর কেউ কি তা শোনে? হাতে কাঁধে মাদুলী বেঁধে, ঠাকুর পূজো মানৎ

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ক'রে ডাক্তারের পরামর্শে সেই যে আমাকে হাওয়া-পরিবর্ত্তন ক'রতে পাঠালে, সেই থেকে এই ট্রেণই আমার বাড়ী ঘর মশায়। দেশ-বিদেশের হাওয়া খাচ্ছি খুবই, তবে খাওয়ার কিছু নেই মশায়। এই নেহাৎ যারা তোমার মত লোক যাতায়াত করে তাদেরই কৃপায় একটু কিছু পেটে পড়ে, তাও আর আগের মত তেমন মিষ্টি লাগে না। সবই যেন তেতো, একেবারে মশায় কামড়ে পাড়াগাঁয়ের জ্বরের ধন্বন্তরী কুইনিনের মত।"

জিজ্ঞেস ক'রতে যাচ্ছিলুম

"তা শরীর এখন কেমন ঠেকছে?"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা আর হ'লো না, কাণের পাশ থেকে কে কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলো

"কে হে তুমি? আচ্ছা অভদ্র তো! ডাক তোলা কোন হিসেবে হে! বলি, সামান্য ভদ্রতাটুকুও তোমার নেই?"

চম্‌কে তাকিয়ে দেখলুম আমার সার্টের কলারের ওপোরে ব'সে একটি মশা ঘৃণিত লোচনে এই প্রশ্ন ক'রছে।

নিটোল দেহটি একবার অতি কষ্টে নাড়িয়ে সামনের হাত দুটো একবার একত্র ক'রে পুনরায় প্রশ্ন ক'রলো

"তোমার নাম?"

"শ্রীকালাচাঁদ ধ্রুবন্ধর। আপনার?"

"আমার নামে তোমার দরকার? আমার নাম শ্রীযুক্ত রক্তরাজ চট্টোপাধ্যায় জাতে ব্রাহ্মণ - আমরা সর্ব্বদাই নিজের জাতের মান রাখতে অভ্যস্ত।" আর আমার সামনে গোল ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে, আমার মুখের ওপোর ফেলে প্রশ্ন ক'রলো—

"আর তুমি কে হে ছোকরা? নাম কি? এর বন্ধু বুঝি?"

ইঙ্গিতে কালাচাঁদকে দেখিয়ে দিয়ে বললুম -

"বন্ধু নই, তবে আজ থেকে বন্ধুত্ব ক'রবো ঠিক ক'রেছি। আর নাম তো আগেই ব'লেছি খোকাবাবু। গ্রাম অনেক দূরে,- -যাচ্ছি মাতুলালয়ে। আর কিছু খবর চাই?"

একটু খুসী হ'য়ে রক্তরাজ জবাব দিলে

"না। তবে আমার পরিচয়টাও জেনে নাও, একসঙ্গেই যাত্রা যখন, তখন আর "

আহরিকা

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

ব'লে একটু বিনয়ের হাসি হেসে ফের আরম্ভ ক'রলো "হ্যাঁ, এখন আমার নামটাও জানা দরকার বৈকি। আমার নাম তো ব'লেই-ছি। মস্ত বড় ব্যবসা, দৈনিক দশ মণ রক্ত আয়। তা ছাড়া মূলধনের কথা ছেড়েই নয় দিলুম, কিন্তু জীবন-বামার যে নতুন দিকটা খুলেছি সেদিকটা তেমন আশাপ্রদ কিছু হ'চ্ছে না বলেই যা একটু হতাশ হ'য়ে প'ড়েছি, কিন্তু হতাশ হবার কোনও কারণ নেই, কি বল হ "

ব'লে একবার আমার ও একবার কালাচাঁদের মুখের দিকে তাকাতেই আমরা এক সঙ্গে ভরসা দিলুম

"ঠিক ঠিক! সময় যাবে। তা বরাবর নয়। সুদিন আসবে নিশ্চয়।"

রক্তবাজের ঠোট দুটো খুসীর হাসিতে ভরে উঠলো গদগদস্বরে ব'ললে

"তা যা ব'লেছ' বন্ধু। তামাদের এই ভবিষ্যৎ-বাণী যদি সফল হয় তবে তোমাদের দু'জনের নামে আমি স্মৃতিমন্দির তৈরি ক'রবো - নিশ্চয় ক'রবো, দেখে নিও। এখন এসো, একটু গল্প গুজব করা যাক।"

, "তা দেশে তোমরা নিশ্চয় চা খাও, এক কাপ্ আনাও-না ভাই, -খেয়ে একটু দেহটা হাল্কা করি। প্রায় ঘণ্টা-চারেক ট্রেণে-ঘোরা আমার কুষ্ঠীতে এ-পর্য্যন্ত লেখেনি, কিন্তু তাই ক'রতে হ'চ্ছে। তা চা'-টা—"

পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, ভাড়া ছাড়া বাজে খরচের পয়সা নাই, ব'ললুম –

"আমি তো চা খাই না। নেহাৎ যদি তোমার খাবার ইচ্ছে হ'য়ে থাকে পাশের কামরায় যাও, চা' জলখাবার পাবে। এখন ইংরেজের আমলে উড়ো-জাহাজে উঠে স্বর্গে যাওয়া যায়,— চা-জলখাবার তো কোন ছার।"

রক্তবাজ নিরুপায়ের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, তা ঠিক, কিন্তু বাইরে যা হাওয়া। আর এই শরীর নিয়ে উড়ে যেতে আমার ভয় হয়।—"

মিহি-সুরে এতক্ষণ পরে কালাচাদ ব'লে উঠলো— 'তা যা ব'লেছ দাদা। ইংরেজ-কোম্পানী আমাদের অধিকাংশ দুঃখই দূর ক'রেছে বটে, কিন্তু এখনও বাকী আছে। যেমন অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। এই ধর-না ভায়া অবস্থার কথা—এই আমাদের কথাই বলি,—বাবার বিশাল জমিদারী,—অসংখ্য প্রজা—যেন-'রাম রাজত্বি' , কিন্তু সে সব কি আর এখন আছে। কোন্ দিক দিয়ে উড়ে গেল কিছু বুঝতে পারলুম না। এখন

আহেরিকা

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

দুবেলা পেট-ভরানোই যেন দায় হ'য়ে উঠেছে, গাঁয়ে গাঁয়ে যমদূতের মত ডাক্তারগুলো এসে 'এন্টিম্যালেরিয়া সোসাইটি' খুলছে, ইয়া বড় বড় ইনজেকশান দিচ্ছে,—জঙ্গল কাটছে আর কেরোসিন ছড়াচ্ছে। জ্বালাতন।"

আষাঢ়ের মত মুখ ক'রে বক্তৃবাজ পকেট থেকে একটা চুরোট বার ক'রে ধরালে, ব'ললে—

"খাবে?"

বললুম—"না, আমি খাইনে।"

অগত্যা কালাচাঁদের দিকে এগিয়ে দিতেই সে সরু সরু হাত দুখানি দিয়ে চুরোট-টা চেপে ধ'রলো। দাঁতের পাশ দিয়ে একরাশ চুরোটের ধোঁয়া ছেড়ে ব'ললে—

"সময় থাকতে চুরোট-ফুরোট ঢের উড়িয়েছি দাদা। কিন্তু এখন আর সে দিনও নেই, ফুরসৎ-ও কম। ভগবান না মেরে বাঁচিয়ে রেখেছেন আর কি!—তবে এর চেয়ে ম'রে যাওয়া আমার পক্ষে ঢের ভালো ছিল।—"

একটা দীর্ঘশ্বাস তার অস্থি-পঞ্জর ভেদ ক'রে বার হ'য়ে এলো।

ব'ললুম—

"আহা—"

কিছুক্ষণ চুপ্ চাপ্।

ট্রেণ এতক্ষণ কোনও ষ্টেশনে থামেনি, এখন তার গতি ক'মে আসতেই, কালাচাঁদ গদির পাশে ও বক্তৃবাজ তিন লাফে 'বাথ্-রুমে' গিয়ে আত্মগোপন ক'রলে।

ষ্টেশনও এসে গেল।



ট্রেণ থামতেই একসঙ্গে ফিরিওয়ালারা হেঁকে চ'ললো, "চাই পান সিগারেট, মুড়ি ছোলা ভাজা,—গরম চা—"

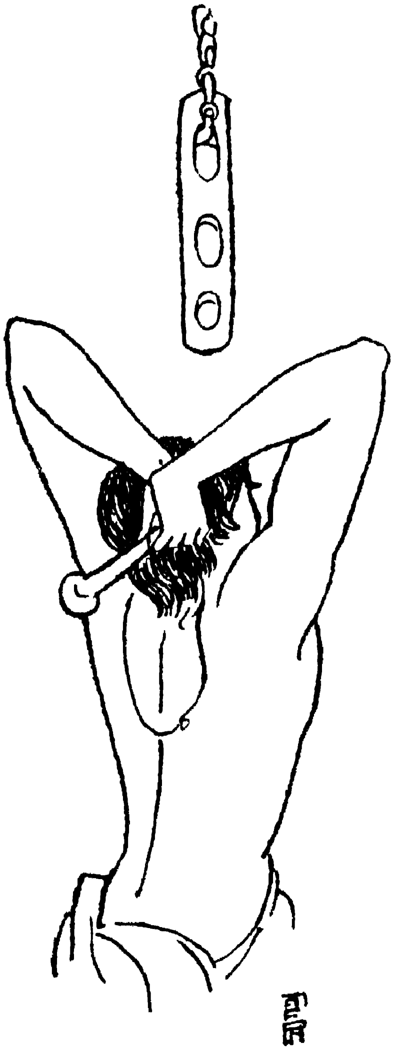
কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদু স্বরে গান ধর'লুম

'জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন'

বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলুম, দেখছিলুম এতগুলি যাত্রীর মধ্যে কে কে আমার এ কামরায় কৃপা ক'রে পদার্পণ ক'রবেন। কিন্তু সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ব'লতে পারিনে, কেউ এলেন না। লোকজনের ব্যস্ততা দেখতে দেখতে ষ্টেশন-মাষ্টারের উচ্চ কণ্ঠস্বর কাণে এলো —



"ঘণ্টা মারো।"

ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা মেরে, হুইসিল দিয়ে ট্রেণ ছাড়লো। ক্রমাগত শব্দ কাণে আসতে লাগলো

"ঘস্ ঘস্ , ঘস ঘস "

বন্ধুদ্বয় দ্রুতপদে বার হ'য়ে এসে ব'সলেন।

আসর আবার সরগরম হ'য়ে উঠলো। বালাচাঁদ ব'ললে, তা যা বল বন্ধু, আজকের দিনটা বেশ ছিল কিন্তু, অনেক দিন তাস খেলিনি, আজ আবার তোমাদের দু'জনকে পেয়ে খেলতে ইচ্ছে ক'রছে —বেশ ভালো হ'তো কিন্তু –"

মুখ-খিঁচিয়ে রক্তবাজ জবাব দিলে—

"আরে রাখো তাস-খেলা—পেটে খাবার নেই, খেলার ঝোঁক। ঐ ক'রেই তো তোমাদের জাতটা উচ্ছন্নে গেল, নইলে আজকাল এত জায়গা থাকতে তোমরা কোন্-ঠেসা হ'য়ে প'ড়ে থাক!—কোথায় ভালো ভালো খাটের, চেয়ারের, কোচের ফাটলে ঢুকে নিজেদের

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

স্বাতন্ত্র সৃষ্টি ক'রবে, জাতি গঠন ক'রবে, তা নয়—শিল্প-বাণিজ্যের আশা নয় ছেড়েই দাও,—এমনি নিজেরাই ম'রতে ব'সেছ! তার চেয়ে দেখদিখি আমাদের—দিনদিন রাজ্য-বিস্তারে আমরা অগ্রণী! পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে জয়যাত্রার ইতিহাস একমাত্র আমাদের জাতের মধ্যেই খুঁজে পাবে—তোমাদের নয়, হুঁ—"

ব'লে বক্তুরাজ একবার আমার দিকে তাকিয়ে সম্মতির অপেক্ষা ক'রতেই আমি মাথা নাড়লুম—

"ঠিক্ ঠিক্ —।"

কালাচাঁদের এবার গলা বার হ'লো। বুকটা টান ক'রে দাঁড়িয়ে ভোবালো গলায় প্রতিবাদ ক'রলে—

"তা ব'লে তুমি তুলবে আমার জাত? আচ্ছা স্পর্দ্ধা তো! নেহাৎ তুমি বন্ধু ব'লে তাই তোমায় রেহাই দিলাম জেনো, কিন্তু অন্য কেউ হ'লে—"

"বটে! অন্য কেউ হ'লে কি ক'রতে শুনি?"

চীৎকার ক'রে কালাচাঁদ ব'ললে—

"গলা-ধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিতাম।"

"বটে,—"

বক্তুরাজ যেন রাগে ফুলে ফেটে যাবার মত হ'লো। বেগতিক দেখে ব'ললুম—

"বন্ধু, আমার একটা কথা যদি রাখো তবে বলি, নইলে—"

দু'জনেই একসঙ্গে জবাব দিলে—

"একশো বার! একশো বার!—বল তোমার কথা, সম্ভব হ'লে নিশ্চয় রাখবো।"

মধ্যস্থ হ'তে চেষ্টা ক'রলুম—

"আর এ পথে ঘাটে রাগারাগি কেন।—"

বক্তুরাজ রগ্-চটা লোক।

চীৎকার ক'রে জবাব দিলে—

"আমাদের কথার মধ্যে তুমি কথা কইতে এসোনা কিন্তু, ভালো কথা ব'লছি, নইলে—"

কি ব'লতে যাচ্ছিলুম; বাধা দিয়ে কালাচাঁদ ব'ললে—

আহেরিকা

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

"সত্যি, তোমার এ অন্যায়। আমাদের মধ্যে আমরা মারামারি কাটাকাটি যা খুসী ক'রবো তাতে তোমাদের কি। তোমরা মানুষ, চিরদিন আমাদের অনিষ্টই ক'রে এসেছো—আজও যে না ক'রবে তার মানে কি।—"

অপ্রস্তুত হ'য়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ফের ব'ললে, "রাগ ক'রোনা ভাই, এ আমরা সত্যি কথাই ব'লছি, দুঃখ করবার নয়। আর দুঃখ ক'রতে হয় ভেবে ক'রো তা'তে আপত্তি নেই। কিন্তু সত্যি ব'লতে গেলে, এ অন্য দেশ হ'লে এতক্ষণ তোমায় শূলে চড়িয়ে তোমার জাতের শাস্তি দিত। কিন্তু এটা নেহাৎ ভারতবর্ষ, নেহাৎ নাকি ক্ষমা আর সেবাই এর ধর্ম্ম, তাই আমরা এখনও চুপ ক'রে আছি, তবে আমাদের আর কেউ হ'লে বা এখানে এলে যে তোমার সম্বন্ধে কি রকম মতামত ভাবী ক'রতেন তা বলা মুস্কিল।"



তাকিয়ে দেখলুম, ওদের দু'জনের মুখই তোলো-হাঁড়ির মত ভারী হ'য়ে উঠেছে, এরা যেন কিছুক্ষণ আগের তারা নয়। বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বার হ'লো না।

ঠিক এমনি সময়ে দেখলুম, বেঞ্চের গদির তল থেকে ও 'বাথ্‌রুম' থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে ছারপোকা ও মশা সোঁ সোঁ ক'রে বার হ'য়ে আসছে।—এক মুহূর্ত্তে আমার চারিদিক ঘেরাও ক'রে তারা চীৎকার ক'রে উঠলো—"বিচার চাই,—আমরা এই বিশ্বাস-ঘাতক মানুষের সন্তানের সম্বন্ধে আজ আমাদের রাজত্বে বিচার চাই।"

চীৎকার ক'রে ওর মধ্যে থেকে কে একজন ব'লে উঠলো, "নিশ্চয় চাই,—বিচার চাই,—নইলে বিদ্রোহ ক'রবো।"

আমি স্তম্ভিত।

হঠাৎ দেখলুম, বক্তুরাজ চট্টোপাধ্যায় ও কালাচাঁদ ধুরন্ধর আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে আদেশ ক'রছে, "আমাদের উচিত এখনি এই হীন পর-অনিষ্টকারীর প্রাণদণ্ড দেওয়া।"

কয়েক ঘণ্টা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

কালাচাঁদ ধুরন্ধর জারী ক'রলো।

"এই ক্ষণেই।"

চারিদিক থেকে একসঙ্গে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো।

"জয়! শ্রীযুক্ত রক্তরাজ চট্টোপাধ্যায়ের জয়!"

"জয়! শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ ধুরন্ধরের জয়!"

তারপরেই দেখি, আমার সমস্ত অঙ্গে কারা যেন অসংখ্য ছুরিকাঘাত ক'রছে।



চীৎকার ক'রতে গেলুম।

"পুলিশ! পুলিশ!—"

কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথাই বার হ'লো না।

* * *

"আরে! উঠে বসুন মশায়, জায়গা দিন। ট্রেণের মধ্যে এত ঘুমও মানুষের আসে কখনো! আশ্চর্য্য!"

চ'মকে উঠে ব'সে তাকিয়ে দেখলুম, রক্তরাজ ও কালাচাঁদের চিহ্নও আমার সামায় নেই।

চারিদিক লোক-জনে ভ'রে গেছে, একা আমিই এতক্ষণ একটা বেঞ্চ্ অধিকার ক'রে নাক ডাকাচ্ছিলুম ম'নে হ'তেই, কেমন একটা লজ্জা পেলে! কিন্তু বেলাও তো আর বেশী নেই, খুব ঘুম ঘুমিয়েছি যা হোক,—একেবারে দশটা থেকে পাঁচটা! হরিবোল! হরিবোল! —এবার মামার-বাড়ী পৌছালুম ব'লে- এবার মাঝে দুটো ষ্টেশন।

একটা হাই তুলে বাইরের দিকে তাকালুম।





প্রবোধকুমার সান্যাল

ছেলের আবদারের আর বিরাম নেই। মা, ঠাকুমা, কাকিমা, পিসি সবাই তটস্থ। বয়স আট বছর, একটিমাত্র ছেলে, পরিবারের মধ্যে তার আদর সকলের চেয়ে,—চৌধুরী বংশের সে কলতিলক। নাম তার নীলু।

নীলুর মাথায় মেয়েদের মতন চুল, বাবা তারকনাথের মানৎ। তার নাকের ডান-দিকে সোণার আংটি, বাঁ পায়ে লোহার কড়া। আট বছর বয়স পর্যন্ত নানা রোগে সে কাতর। তার পরমায়ুর জন্য ৺কালীঘাটে অনেকগুলি ছাগলকে খুন করা হয়েছে, অনেক টাকা গেছে তীর্থের পাণ্ডাদের থলিতে। ডাক্তার ওষুধ, বার-ব্রত, শান্তি স্বস্ত্যয়ন, কলহ বিবাদ। এমনি করেই নীলুর বয়স হোলো আট বছর।

দুরন্ত ছেলে সে নয় কিন্তু জেদী। সেদিন বললে, তার দিকে চেয়ে ও-পাড়ার সন্তু হেসে গেছে, তাকে কেউ মেরে আসুক।

ভীষণ বিপদ, পরের ছেলেকে মারবে কে? কেউ রাজি হয় না দেখে নীলু হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার করতে লাগল। বাড়ীসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত। ঠাকুমা বলেন, আহা, দিয়েই এসো না গা দু ঘা সন্তুকে? ছেলেটা যায় যে! চুপ করো ভাই নীলু, চুপ করো, লক্ষ্মী বাবা আমার। এখুনি গিয়ে সন্তুর মাথা ফাটিয়ে দিয়ে আসছে, দ্যাখো না।

নীলু চীৎকার ক'রে বললে, আমার সামনে এনে তাকে—

নীলু

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

শেষকালে একজন গিয়ে ওপাড়ার সন্তকে ভুলিয়ে এ বাড়ীতে ধ'রে নিয়ে এলো। বাড়ীর হিন্দুস্থানী ঝি ছিল, তার ছেলের নাম মুণ্ডা। মুণ্ডার ওপর হোলো হুকুম জারি, সে দিলে দু' ঘা সন্তকে। সন্ত চ'লে গেল কাঁদতে কাঁদতে। হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল নীলু।



মুণ্ডার মা'র নাম জানকি। জানকি তার ছেলেকে এ বাড়ীতে এনে ছেড়ে দিয়েছে মানুষ হবার জন্য। মুণ্ডা নীলুর সমবয়সী। এ বাড়ীতে তাকে কেউ খেতে দেয় না, বাড়ীর লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে সে মানুষ। মুখে তার সর্ব্বদা হাসি, গায়ে ভীষণ জোর।

কিন্তু গায়ের জোর থাকলেই বা কি! সর্ব্বাঙ্গে তার কালশিরের দাগ, মাথায় কাটা-খোচা, হাতের দুটো আঙুল নখ-ওঠা, মুখে একটা দাঁত ভাঙা, বাঁ চোখের একটা তারায় ক্ষতচিহ্ন। ওইটুকু ছেলের সর্ব্বশরীরে এতগুলি আঘাত—এর পিছনে আছে বিপুল পরিমাণ অন্যায়ের ইতিহাস—সে-ইতিহাস নীলুরই সৃষ্টি।

ছেলে আবদার ধ'রে বসলো, বাপকে ঘোড়া হ'তে হবে, আর সেই ঘোড়ার পিঠে সে চড়বে। চেঁচিয়ে পাড়া মাতিয়ে তুললে। অগত্যা বাপকে হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়া সাজতে হোলো, নীলু উঠল তার পিঠে। সারাদিন বাপের আর নিষ্কৃতি নেই। বাপের শেষ বয়সের একটিমাত্র সন্তান, যা বলবে তাই শুনতে হবে।

শীতের রাত্রে নীলু ধ'রে বসলো, চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জলে মুণ্ডাকে ডুবে থাকতে হবে। জেদ একবার ধ'রলে আর রক্ষা নাই। জানকি তার ছেলের অসুখের ভয়ে কাঠ হ'য়ে

আহেরিকা

নীলু

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

রইল। কিন্তু আর দেরি করা চল্‌ল না। মুণ্ডা হাসিমুখে নাম্‌ল চৌবাচ্চার জলে। রইল সে অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না নীলু মায়ের কোলের ভিতরে ঘুমিয়ে পড়ল। তার পর মুণ্ডা কাঁপতে কাঁপতে উঠে এলো। জানকি তার গা মুছিয়ে কাছে শুইয়ে রাতের বেলা চুপি চুপি কাঁদতে লাগল। তার স্বামী আজ বেচে থাকলে পরের বাড়াতে এমন দুঃখ সইতে হোতো না। মুণ্ডা তার অন্ধের নড়ি।

লেখাপড়া শেখার দরকার নীলুর নেই। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে সে। কিছুই সে করবে না, সে কেবল বেচে থাকুক। বেচে থাকাটাই তার সকলের চেয়ে বড় কৃতীত্ব, মানুষ সে নাই বা হোলো।

মুণ্ডা তাকে ভালোবাসে। মার খেয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, তবু মুণ্ডা তার কাছ ছাড়া হয় না। মুণ্ডা এ বাড়াতে খেতে পায়, থাকতে পায়, কেবল নীলুর কাছে অপমানের গৌরবলাভ করার জন্য। নীলুর মার সইবার একজন ছেলের দরকার। এ ছাড়া মুণ্ডার আর দাম নেই।

শ্রাবণের বর্ষা। অবিশ্রান্ত ঝম ঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। পথে ঘাটে কোথাও লোক চলাচল নেই। নীলু আবদার ধরলে, মুণ্ডাকে একটা ব্যাঙ ধ'রে আনতে হবে।

এমন দুর্যোগে কোনো ছেলেই জলে নামে না—বিশেষ যার মা বাপ আছে। জান্‌কি একটু আপত্তি করলে। ঠাকুমা বললে, নবাবের ব্যাটা, এই কাজটুকু আর করতে পারিসনে? সুখের গা, বিষ্টিতে ভিজলে ক্ষয়ে যাবে। যা, নিয়ে আয়গে একটা ব্যাঙ ধ'রে, হারামজাদা।

মুণ্ডা যাবার জন্যই উৎসুক। ঠাকুমার কথা শুনেই সে এক দৌড়ে পথে বেরিয়ে গেল। এমনি করেই এ বাড়ীর নীলুকে খুশী করতে হয়। কাদলে তার অসুখ করবে, চেঁচালে তার কষ্ট হবে, আবদার ধরা জিনিস না পেলে সে চেচিয়ে বাড়ী মাথায় তুলবে, মা'কে গাল্ দেবে, বাপকে লাথি মারবে, ঠাকুমাকে বঁটি নিয়ে কাটতে যাবে,—আরো যে কি করবে তা প্রকাশ করবার নয়। এমনি করেই অত্যাচারের রথ চালিয়ে সে বড় হয়েছে, এমনি করেই দিন গেছে, বছর গেছে, এমনি করেই চিরদিন চল্‌বে।

মুণ্ডা যখন ফিরে এলো তখন সন্ধ্যা। আকাশ মেঘে আর বৃষ্টিতে অন্ধকার। উঠানে এসে সে যখন দাঁড়ালো তখন তার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে। তার বলিষ্ঠ কষ্টসহিষ্ণু

নীলু

প্রবোধকুমার সান্যাল

শরীর, মুখে বিজয়গর্ব্বের হাসি। কাপড়ের কোঁচড়ে সে ব্যাঙটাকে বেঁধে এনেছে। কোথা থেকে ধ'রে আনল সে কথা আর কেউ শুনতে চায় না। এখান থেকে এক মাইল দূরে আছে চাটুয্যেদের কলাবাগান, সেই বাগানের সংলগ্ন পুকুর। পাঁচিল ডিঙিয়ে সে জলের ধারে গিয়ে বসেছিল, এমন সময় পিছন থেকে উড়ে মালী এসে ধরলো তার গলা টিপে, পিঠে কিল বসিয়ে দিলে দু' চারটে। বললে, সড়া, চুর।



মুণ্ডা তাকে মিনতি ক'রে জানালে, আমি চোর নই। আমি চাই একটা ব্যাঙ, বাবুর ছেলের জন্যে।—এই ব'লে সে তার মায়ের দেওয়া জল খাবারের পয়সাটা ট্যাঁক্ থেকে বার ক'রে দিলে ঘুষ উড়ে মালীর হাতে। মালী খুশী হয়ে চ'লে গেল।—মুণ্ডার এই ইতিহাস শোনবার মানুষ এ সংসারে কেউ নেই। তাই মুখে তার কেবলমাত্র হাসি।

মা বললে, কী শক্ত প্রাণ, ছোটলোকের ছেলে কি না—

বাবা বললেন, মেড়োর জাত, ওরা ছাতু খায়।

ব্যাঙের পায়ে দড়ি বেঁধে রাখা হোলো। এক সময়ে নীলু সেটাকে লাঠির ঘায়ে মেরে ফেললে।

*　*　*　*

সেই নীলু এখন বেশ বড় হয়েছে। লেখাপড়া তার হয়নি। শিখেছে কয়েকটা

নীলু

প্রবোধকুমার সান্যাল

ইংরেজি কথা, সেইগুলো সে যেখানে সেখানে চালিয়ে দেয়। বড় হয়েছে, কিন্তু মানুষ হয়নি। চেহারাটা রোগা, দুর্ব্বল, রক্তহীন। পৃথিবীর কিছুতেই তার উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই। মাসের মধ্যে অন্ততঃ এক সপ্তাহ সে অসুস্থ হয়ে বিছানায় প'ড়ে থাকে। সুস্থ শরীর কেমন তা সে জীবনে জানে না।

কার দোষে তার এমন হোলো কে জানে! হয় ত কারও দোষ নেই, এই তার নিয়তি। মা বাপ প্রভৃতির সম্বন্ধে সে বিরক্ত, তারা যেন শত্রু। বন্ধুবান্ধব তার নেই, সে একা। আজন্ম স্বার্থপর সে, বন্ধুবান্ধব পাবে কোথায়?

অনেককাল পরে একদিন সেই মুণ্ডার সঙ্গে তার দেখা। মুণ্ডা আর তার মা বহুদিন হোলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

নীলু জিজ্ঞাসা করলে, চিন্‌তে পারিস মুণ্ডা?

পারতা হ্যায়।—ব'লে মুণ্ডা তার পায়ের ধূলো নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়ালো।

কোথায় আছিস আজকাল? কি করিস?

মুণ্ডা জানালো সে এখন হাসপাতালে চাকরি করে। কিন্তু তার বলবান দেহটার দিকে নীলু বার বার তাকাতে লাগল। সুস্থ বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ দেহ,—ব্যায়ামের দ্বারা সে দেহ দৃঢ়গঠিত। তৃষ্ণার্ত্ত ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে নীলু তার দিকে তাকাতে লাগল।

এক সময় মুণ্ডার পিঠ চাপড়ে বললে, বড়লোকের ছেলে না হয়ে ভালোই হয়েছে, এই বেশ। ভালো স্বাস্থ্য যদি না থাকে তাহলে—

এই ব'লে নীলু একবার পথের দিকে তাকালো, তার পর নিশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা যাই ভাই, আবার দেখা হবে, কেমন?

মুণ্ডা ঘাড় নাড়লো। নীলু মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।



মৌমাছির জীবন কথা



বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে কত যে রহস্যময় নাট্যলীলার অভিনয় হয়, যাহাদের দৃষ্টি আছে তাহারা এই নাট্যলীলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যায়। মৌমাছির জীবনকাহিনী এমনি একটা অপরূপ-রহস্যে-ভরা! মানুষের জীবন রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে চারিদিক সচকিত করিয়া চলিয়াছে একটা মত্ততার আবেগে। ইহারই অন্তরালে কলগুঞ্জনে মুখরিত মৌচাকের রঙ্গমঞ্চে প্রেমের আর মৃত্যুর অভিনয় চলিতেছে। এই অভিনয়ের রূপকথাই আমরা এখানে বর্ণনা করিব। শুধু কি প্রেমের আর মৃত্যুর অভিনয়? প্রেমের আর মৃত্যুর সঙ্গে আবদ্ধ আত্মদানের মহিমা, দারিদ্র্যের দুঃখ, ঐশ্বর্য্যের দাপ্তি, লোভ, আলস্য, স্বার্থপরতার শোচনীয় পরিণতি।

মৌচাকের রঙ্গমঞ্চে ঋতুতে ঋতুতে পট পরিবর্ত্তন হয়। লীলার বৈচিত্র্যে মৌচাকের জীবন তাই কাব্যের মত রমণীয়, আরব্যোপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। বসন্তের আবির্ভাবে বনে বনে জীবনের চাঞ্চল্য জাগিয়াছে। মৌমাছির মৌচাকের প্রাসাদেও সেই চাঞ্চল্যের ঢেউ লাগিয়াছে। শীতের ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে মক্ষীরাণী—মধুমাসের মলয় হাওয়ার স্পর্শে। এইবার তাহার ডিম পাড়িবার পালা। সহচরীবৃন্দের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মক্ষীরাণী মৌচাকের কক্ষে কক্ষে যাইতেছে এবং প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করিয়া ডিম পাড়িতেছে। মৌচাকের সর্ব্বত্র এখন কর্ম্মের ব্যস্ততা।

বসন্ত আরও আগাইয়া গিয়াছে। মক্ষীরাণী যে ডিমগুলি পাড়িয়াছিল, তাহাদের গর্ভ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে নূতন মৌমাছির দল। রঙ্গমঞ্চে তাহাদের কাজ আরম্ভ

আহেরিকা

মৌমাছির জীবন কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

হইয়াছে। এই নূতন মৌমাছিদের মধ্যে আছে তিনটী শ্রেণী। প্রথম হইতেছে পুরুষ মৌমাছি - ইংরাজীতে যাহাকে বলে “ড্রোন”,—দ্বিতীয় হইতেছে পরিচারিকা মৌমাছি—যাহাদের কাজ ঘর তৈয়ারী, বাচ্চা-পালন, মধু সংগ্রহ ইত্যাদি, তৃতীয় শ্রেণী হইতেছে রাজকন্যার দান - যাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভাব হয় মক্ষীরাণীর। মক্ষীরাণীর কাজ কেবল ডিম-পাড়া।

কর্ম্মী-মৌমাছিরা এখন হইতে কর্ম্মী বলিয়াই অভিহিত হইবে। ইহাদের সমস্ত জীবন ত্যাগের কঠিন সাধনা। মৌচাকের একনিষ্ঠ সেবায় ইহাদের জীবন অতিবাহিত হয়। কর্ম্মী-মৌমাছিরা সকলেই মেয়ে। পুরুষ-মৌমাছিরা কোন কাজ করে না। আলস্যে নবাবের মত বসিয়া বসিয়া কেবল খায় আর ঘুমায় কর্ম্মীরা জীবন ভরিয়া পরিশ্রম করিয়া যায়। তাহারা পুরুষের সংস্পর্শে আসে না ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করে। তাহাদিগকে সন্ন্যাসিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকাল হইল। কর্ম্মীরা ছুটিল বনে বনে ফুলে ফুলে মধুর সন্ধানে। সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ফুল হইতে মৌচাক এবং মৌচাক হইতে ফুলে তাহাদের যাতায়াতের বিরাম নাই। পাখা তাহাদের ক্লান্ত হইয়া আসে—কিন্তু সেই ক্লান্তিকে তাহারা দূর করিয়া দেয় মৌচাকের স্বার্থের কথা ভাবিয়া মধু চাই—প্রচুর মধু চাই—নহিলে বাচ্চারা খাইবে কি? মৌচাকের জীবন-স্রোত অব্যাহত গতিতে চলিবে কি করিয়া? অনেক সময় মধু আনিয়া ফিরিতে সন্ধ্যা অনেকখানি অতিক্রম করিয়া যায়। বেচারা মৌমাছি ফিরিয়া আসিয়া দেখে—মৌচাকের রাজ্যের প্রজা ইতিমধ্যে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে মাথা রাখিবার পর্য্যন্ত স্থান নাই। বেচারাকে অগত্যা বাহিরে কাটাইতে হয় এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হয় মৃত্যু—ঠাণ্ডায় মৃত্যু। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কর্ম্মীরা ছয় মাসের বেশী বাচে না।

মক্ষীরাণীর জীবনও কঠোর ত্যাগের জীবন। পুরাতন আবাস পুত্র-কন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেখানে আর ঠাঁই নাই। এবার আত্মদানের দিন আসিয়াছে। মৌচাকে যে মধু আছে তাহাতে কুলাইবে না। বাচ্চাদিগকে আশ্রয় দিতে হইবে—আহার দিতে হইবে। মক্ষীরাণী স্থির করিল, পুরাতন গৃহ ছাড়িয়া যাইব--নূতন যাহারা আসিতেছে তাহাদিগকে স্থান দিবার জন্য। কিন্তু পুরাতন আবাস ছাড়িয়া গিয়া স্থান

মৌমাছির জীবন কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

লইব কোথায়? সে ভাবনা করিবার প্রয়োজন নাই। যদি ঠাঁই মিলে বাঁচিব,—যদি না মিলে মরিব। সেই মরণেও সুখ আছে।

নির্দ্দিষ্ট দিন আসিল। মক্ষীরাণীকে ঘিবিয়া দাঁড়াইল বিশ্বস্ত পরিচাবিকাব দল। এইবাব বাঁধন ছিঁড়িবাব সময় আসিয়াছে। সহসা পাখাগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পর অসীম শূন্যে ঝাঁপ দিয়া রাণী তাহার পরিচারিকাব দল লইয়া চলিল অজানাব মধ্যে নূতন আশ্রযেব সন্ধানে। পিছনে পড়িয়া বহিল বহু দিবসের স্মৃতি-বিজড়িত পুরাতন মৌচাব —যেখানে গুঞ্জন-গীতি—প্রাণেব চাঞ্চল্য--মধুব প্রাচুর্য্য। আর সম্মুখে? গৃহ নাই, আহার নাই—শুধু অচেনা অজানা বিপুল জগত! এত ত্যাগেব তুলনা কোথায়?

সেই অজানা জগতে যদি আশ্রয় মিলিয়া গেল, ভাল। মক্ষীবাণী তাহার পবিচারিকাদের লইয়া সেখানে নূতন উপনিবেশ গঠনে মনোনিবেশ কবিল। নূতন মৌচাকে নব নব কক্ষ-নির্ম্মাণ সুরু হইল--বাণী ডিম পাড়িতে আবম্ভ করিল—জীবনেব চাকা নব উদ্যমে তাহাব আবর্ত্তন সুরু কবিয়া দিল।

কিন্তু ওদিকে পুবাতন আবাসের সংবাদ কি? সেখানে রাজকন্যার দল বড় হইয়াছে। তাহাদেব মধ্যে বাণী হইবে কে? মৌচাকে তো দুইটি রাণী থাকিতে পাবে না। বাজকন্যাদেব মধ্যে যে বড এবং ক্ষমতাশালিনী সে আপনার সিংহাসনেব পথ নিষ্কণ্টক করিবাব জন্য আপনাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ভগ্নীগুলিকে যমালয়ে পাঠাইয়া দেয়। যদি মৌচাকের কর্ম্মীবা বাজকন্যাকে তাহাব জিঘাংসাবৃত্তি চবিতার্থ কবিতে বাধা প্রদান কবে—তবে অবিবাহিতা বাণী নূতন উপনিবেশ স্থাপন কবে। কিন্তু হত্যাকার্য্যে যদি বাধা উপস্থিত না হয়, তবে রাজকন্যা ভগ্নীদিগকে মারিয়া ফেলিয়া মৌচাকের একচ্ছত্র বাণী হইয়া বসে।

এইবাব রাণীব জীবনে আসে সৃষ্টিব কামনা। মৌচাক ভরিয়া পুরুষ মৌমাছিরা হাজাব হাজার অবস্থান কবিতেছে। এই অগণিত বাজপুত্রদের মধ্যে কাহার গলায় রাজকুমারী বরমাল্য প্রদান করিবে? প্রকৃতি এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছে অপূর্ব্ব উপায়ে।

মক্ষিরাণীর অন্তরে সৃষ্টির আহ্বান আসিয়া পৌঁছিল। রাজকুমারী প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া শূন্যে উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত রাজপুত্রও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ

আহরিকা

মৌমাছির জীবন কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ধাইয়া চলিল। রাজকুমারী উড়িতে লাগিল উঁচু হইতে আরও উঁচুতে। রাজকুমারেরাও তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। রাজপুত্রদের মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল তাহারা ক্রমে ক্রমে পিছাইয়া পড়িল। রাজকুমারীর কিন্তু ওড়ার শেষ নাই। অবশেষে অবশিষ্ট রহিল একটি রাজপুত্র; সর্ব্বাপেক্ষা সে ক্ষমতাশালী। তাহার পাখার ক্লান্তি নাই। অসীম শূন্যে রাজকুমারী তাহাকে বরমাল্য প্রদান করিল। পরমুহূর্ত্তে বরের মৃতদেহ মাটিতে গিয়া পড়িল। চিরবৈধব্য লইয়া গর্ভিণী রাণী রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। মৌচাক হইতে আর কোথাও রাণী বাহির হয় না। সারাজীবনে রাণী ১৫,০০.০০০ ডিম পাড়িতে সক্ষম।

মৌচাকের রঙ্গমঞ্চে এই যে অপূর্ব্ব নাট্যলীলা চলিতেছে,-- এই লীলায় পুরুষ মৌমাছির কাজ শুধ্ খাওয়া আর ঘুমানো। বংশ-রক্ষার জন্য সহস্র সহস্র মৌমাছিদের মধ্যে শুধ্ একটি মৌমাছির প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাকী মৌমাছিদের সৃষ্টি তবে কেন? মরিবার জন্য--- অগৌরবের মৃত্যুর মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার জন্য। প্রকৃতি এমনি করিয়া কতই না অপচয় করিতেছে! ফাল্গুনে আমের বনে কত যে মুকুল আসিতেছে, তাহাদের সবগুলি কি ফলের মধ্যে সার্থকতা লাভ করে? অধিকাংশই অকালে যায় ঝরিয়া। -কে বলে প্রকৃতি নির্ভুল, সম্পূর্ণ?

এই যে অপূর্ব্ব নাট্য—এই নাট্যের চূড়ান্ত দেখিতে পাই গ্রীষ্মের শেষের দিকে। পুরুষেরা এই সময় মৌচাক হইতে বাহির হইয়া আসে এবং শুইয়া শুইয়া মনের আনন্দে রৌদ্র পোহায়। তাহার পর ভিতরে ফিরিয়া যাইবার পথে আকণ্ঠ মধ্ পান করিয়া মাতালের মত চিৎপাত হইয়া পড়িয়া থাকে। এত মধু খায় যে নেশায় ঘুমাইয়া পড়ে। কর্ম্মীদের আর কত সহ্য হয়? এইবার তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ যায় ভাঙ্গিয়া। অলসদের কর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে আর কতকাল প্রশ্রয় দেওয়া যায়? এমনি বসিয়া বসিয়া খাইলে শীতের দিনে মৌচাকে মধুর চিহ্নমাত্র থাকিবে না। অলসদের মাথায় তখন নামিয়া আসে পরিচারিকাদের ক্রোধের বজ্রাগ্নি। ঘুম হইতে পুরুষেরা তাহাদের স্ফীত দেহ লইয়া যখন জাগে, তখন দেখিতে পায়, মেয়েরা তাহাদের ঘেরিয়া লইয়াছে; তাহাদের অবস্থা সপ্তরথী-পরিবৃত অভিমন্যুর মত অসহায়। অভিমন্যু যুদ্ধ করিবার সময় পাইয়াছিল। অলস পুরুষ-মৌমাছিগুলি সে সুযোগও পায় না। চক্ষের নিমিষে বিদ্যুৎ-

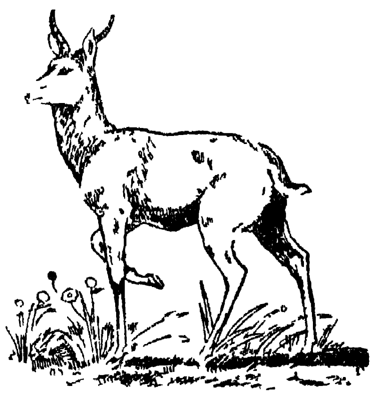
মৌমাছির জীবন কথা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায

গতিতে মেয়েবা বাঘিনীব মত পুরুষগুলোকে আক্রমণ কবে। সেই আক্রমণেব চাপে বেচাবা পুরুষগুলি দম আট্‌কাইয়া মবিয়া যায়।

যুদ্ধ যখন থামিয়া যায়, তখন মৌচাকে দেখা যায় শুধু মৃতদেহ—অলস ঘৃণ্য পুরুষ-মৌমাছিদেব ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ। বিজয়িনী কর্ম্মীবা নিষ্কণ্টক বাজ্যে সগৌববে আপনাদেব সেবা কার্য্য কবিয়া যায।

শীতকাল আসিতেছে। এইবার মৌমাছিদের ঘুমাইবাব সময়। হেমন্তেব বনে শেষ কুসুমগুলি হইতে তাহাবা এখন মধু চয়ন করিতেছে। শীত আসিবে, মৌমাছিবা গভীব ঘুমে মগ্ন হইবে। তখন বাসায় জীবনেব কোন চাঞ্চল্য দেখা যাইবে না। শুধু দেখা যাইবে ক্ষীণ পক্ষ-সঞ্চালন—দেহকে উত্তপ্ত বাখিবাব জন্য।





শ্রীগিরিজাকুমার বসু

দুটি বোন্ নীলিমা আর অনিমা। আমার তারা নাত্‌নী। নীলিমা যেন জ্যোৎস্না আর বিদ্যুতে মেশান। কখনো শান্ত, কখনো চপলা—কখনো স্নিগ্ধ, কখনো তীব্র। নীলিমা লেখাপড়ায় অনেকটা এগিয়েছে বড়ো ব'লে আর অনিমা খুব ছোট বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছিল ব'লে। তাদের বিদ্যের কথা কিন্তু আমি বলতে বসিনি, তাদের দুষ্টুমির কেবল একটু বিবরণ দোবো। গরমি কাল, অমাবস্যার রাত। তারা থাকে পাবনায়, সেখানে আমি গেছি। খুব গরম বোধ হওয়াতে, তাদের বাড়ীর ছাতে বেড়াচ্ছিলুম—রাত তখন আন্দাজ নয়টা। ছাতে উঠতে হোতো একটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িটা ছাতের সঙ্গে আট্‌কানো নয়, অর্থাৎ সেই কাঠের সিঁড়িটাকে অন্য দরকারে অপর জায়গায়ও নিয়ে যাওয়া যেত। খানিকক্ষণ পরে, ছাত থেকে নাব্‌তে গিয়ে দেখি, কাঠের সেই সিঁড়িটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। নীলিমা, অনিমা এবং বাড়ীর আরও অনেকের নাম ধরে ডাক্‌লুম, কাকুরই সাড়া পেলুম না। ছাতের ওপর থেকে ডাক্‌লে শুনতেই বা পাবে কেন? বিশেষতঃ যখন নোতুন জায়গায়, গাঢ় অন্ধকার, নেড়া ছাতের ওপর থেকে ঝুঁকে, নীচের দিকে মুখ ক'রে ডাকতে সাহস পাচ্ছিলুম না। কি করা যায়, ভেবে অস্থির হ'চ্ছি এমন সময় দেখলুম সদর রাস্তা দিয়ে লণ্ঠন হাতে নিয়ে একজন

দুই বোন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আহেরিকা

ভদ্রলোক চ'লেছেন। ওদের বাড়ী ছিল সদর রাস্তার উপর, ছাত থেকে রাস্তা দেখা যেত। চিৎকার ক'রে তাকে ডাকতে লাগলুম—ও মশায়! ও লণ্ঠন-হাতে মশায়, ও বাবু মশায়! ঠিক কোন্ দিক থেকে শব্দটা আসছে, ঠাওরাতে না পেরে তিনি এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। আমি আবার চিৎকার ক'রে তাঁকে ব'ললুম, সামনে, নিতাই-বাবুর বাড়ীতে ঢুকে বলুন যে তাদের ছাতে কে একজন উঠেছে। বাবুটি স-লণ্ঠন বাড়ীতে ঢুক্‌লেন, দেখে, আমি আশ্বস্ত হ'লুম।

এর মিনিট পাঁচেক পরেই সিঁড়ি ছাতে লাগানো হোলো। আমি নেমে এসে দেখ্‌লুম, নীলিমা আর অনিমাই সেটা লাগিয়েছে। আমার ছাতে থাকা সত্ত্বেও সিঁড়ি সরিয়ে নেওয়া খুবই অন্যায় হ'য়েছে, যে তা ক'রেছে, তাকে ধ'রতে পারলে উত্তম শিক্ষা তাকে দেওয়া উচিত, এই মুহূর্ত্তে তাঁর খোজ করা হোক্ ইত্যাদি অনেক কথা নীলিমা আর অনিমা ব'ল্‌লে। তখন আমার বিশ্বাস হ'য়েছিল যে আর যেই ওর জন্যে অপরাধী হোক্ এরা দু বোন্ অমন কাজ নিশ্চয় করে নি। বাড়ীর ঝি, চাকর, বামুন একে একে সকলেই যখন



ব'ল্‌লে যে তারা সিঁড়ি সরায়নি এবং সরাবার কথা জানেও না তখন সকলে খুব বিস্মিত হ'য়ে গেল—সিঁড়ির তো আর হাত পা নেই যে নিজেই স'রে প'ড়বে। যাই হোক্,

দুই বোন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

যখন অপরাধীর সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আর কি হবে, ব্যাপারটাকে চাপাই দেওয়া হোলো। রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে আলো নিবিয়ে বিছানায় শুলুম। শোবার দু-মিনিট পরেই গা চিড়্-বিড়্ ক'রতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লুম, হয় ভালো ক'রে মশারি গোঁজা হয়নি ব'লে মশা ঢুকেছে, নয়তো ছারপোকা কাম্‌ড়াচ্ছে। মাথার বালিশের কাছেই দেশ্‌লাই ছিল, জ্বেলে দেখ্‌লুম—মশাও ঢোকেনি, ছারপোকারও দেখা নেই। দেশ্‌লাইয়ের কাঠিটা মশারির বাইরে ফেলে, মশারি গুঁজে, আবার শুলুম। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার সেই রকম অস্বস্তি বোধ হ'তে লাগ্‌লো, যেন কি কামড়াচ্ছে। এবার দেশ্‌লাই জ্বেলে, বাঁ হাতে জ্বলন্ত কাঠিটা ধ'রে, ডান হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা সরালুম। সরিয়েই দেখি চাদরের নীচে পাতা খুব মোটা কালো কুট্‌কুটে একটা কম্বল। দারুণ গরমে ঐ রকম পদার্থের উপর শুলে দেহের ভিতর কি রকম ক'র্‌তে থাকে তা আর কাউকে খুলে বল্‌তে হবে না। সেই রাতে বাড়ী-সুদ্ধ সবাইকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'র্‌লুম, অত গরমে বিছানায় মোটা পশমের



কম্বল পাতাটা কার বুদ্ধিতে হ'য়েছে। যে চাকর বিছানা ক'রেছিল, সে দিব্যি গেলে বল্‌লে, বিছানা করবার সময় ঐ কম্বল সে পাতে নি। নীলিমা আর অনিমার মা বেশ

দুই বোন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ক'রে দেখে ব'ল্লেন, ওদের দু-বোনের বিছানা কর্‌বার সময়, ওরা যে ঘরে শোয় সে ঘরের খাটের নীচে তিনি ঐ কম্বল দেখেছিলেন। নিশ্চয়ই ওদের কেউ দুষ্টুমি ক'রে সেটা আমার বিছানায় পেতে দিয়ে গেছে। আমি ব'ল্লুম, এত রাত্তিরে আর গোলমালে কাজ নেই, কাল সকালে যা হোক্ ব্যবস্থা করা যাবে।

খুব ভোরবেলাই আমি তারপর দিন উঠ্‌লুম—হঠাৎ নজর পড়্‌লো আগের রাত্রের সেই রহস্যময় সিঁড়িটার উপর। সিঁড়িটার এক পাশে একটা মস্ত পেরেক ছিল, তাতে নীল শাড়ীর খানিকটা ছিন্ন অংশ বেধে আছে। মনে হোলো, কাল রাতে অনিমা একটা নীল শাড়ীই তো প'রেছিল বটে। সিঁড়ি সরানো যে তার কাজ বুঝ্‌তে বাকি রইলো না। তার ঘুম ভাঙ্‌তেই, তার শাড়ী ধ'রে টানাটানি। 'কি করেন, কি করেন' ব'লে সে চেঁচাতে, বাড়ীসুদ্ধ লোক সেখানে হাজির। দেখা গেল সত্যই তার শাড়ীর খানিকটা ছেঁড়া। তখন তাকে দোষ স্বীকার ক'র্‌তেই হোলো। কম্বলের ব্যাপারেও যে সে-ই লিপ্ত ছিল, বোঝা গেল। কিন্তু সিঁড়ি সে একলা সরাতে তো পারে নি, নীলিমাও তার মধ্যে অবশ্য ছিল।

নীলিমাকে প্রশ্ন ক'রতে সে অবশেষে বললে, বুদ্ধিটা অনুর, তবে সে তার সাহায্য ক'রেছিল বটে।



বাদশাহী গল্প

যদুনাথ সরকার

(ফার্সী হইতে)

শাহ্‌জাহানের প্রজাবাৎসল্য

এই বাদশাহের হৃদয় সর্ব্বদা রাজ্যের খবর লইতে ব্যস্ত থাকিত। একদিন দুপুর-রাত্রে রাজস্বের কাগজ-পত্র দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানা কাগজ হইতে জানিতে পারিলেন যে কোন একটি মহালের খাজনা গতবৎসর অপেক্ষা কয়েক হাজার টাকা বেশী করা হইয়াছে। অমনি ইহার কারণ জানিবার জন্য রাজস্বসচিব (দেওয়ান) প্রধান মন্ত্রী সাদুল্লাঃ খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাক্রমে তখন সাদুল্লাঃ রাজস্ব-বিভাগের তোষাখানার মধ্যে হিসাবের কাগজ হাতে লইয়া বসিয়াছিলেন; রাত জাগিয়া হিসাব ঠিক এবং কাগজ-পত্র তৈয়ারী করিতে হওয়ায় তাহার চক্ষু দু'টি ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। বাদশাহের দূত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং মন্ত্রী ঠিক কি অবস্থায় ছিলেন তাহা বর্ণনা করিল। শাহ্‌জাহান একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তুমি সজাগ থাকিয়া রাজ্যের সব নিয়মগুলি চালাইতেছ এবং তত্ত্বাবধান করিতেছ, এই বিশ্বাস করিয়া আমি একটু বিশ্রাম-ভোগ করিতাম। কিন্তু যখন আমার বিশ্রাম তুমি নিজেই লইয়াছ, তখন আমাকেই রাত জাগিতে হইবে।" সাদুল্লাঃ খাঁ নিজের দোষের জন্য কিছু কারণ দেখাইয়া মিনতি করিলেন, তাহার পর বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহালের জমা-বৃদ্ধির কারণ কি? এই পরিবর্ত্তন কেন হইল? আমার রাজত্বকালে ত' চাষের উপযুক্ত কোন জমি পতিত ছিল না, যে, তাহা চাষ করাইয়া তাহা হইতে খাজনার পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। এই মহালের কর্ম্মচারীর নিকট সন্ধান কর।"

পরে সেখানকার কর্ম্মচারী লিখিয়া পাঠাইল যে, সে বৎসর নদী সরিয়া যাওয়ায় কতকটা জমি দেখা দিয়াছে, এবং এই নূতন জমির জন্য খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। বাদশাহ আবার জানিতে চাহিলেন যে, এই জমি সরকারী খাস-মহাল, অথবা লাখরাজ-

দানের ভূমির সঙ্গে লাগা। খুঁজিয়া জানা গেল যে উহা দানের ভূমির মধ্যে। তখন বাদশাহ বলিলেন, "এই সব লাখরাজ-ভোগী অসহায় পিতামাতাহীন অথবা বিধবা প্রজাদের ক্রন্দনে নদী শুকাইয়া গিয়াছে। ওজমিতে তাহাদের সত্ত্ব। ওজমি সরকারী জমির মধ্যে আনা শুধু ঐ বেচারাদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা।" এবং সাদুল্লার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ঐ মহালের হতভাগ্য ফৌজদার একটি দ্বিতীয় শয়তান, তাহাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া মারিলে ঠিক হইত, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রাণনাশ করা উচিত নয়। এখন তাহাকে শুধু কাজ হইতে ছাড়াইলেই শাস্তি দেওয়া হইবে, এবং ইহা দেখিয়া ভবিষ্যতে অন্য কেহ এরূপ ন্যায্য-সত্ত্ব-নাশকারী কর্ম্ম করিবে না। অতিরিক্ত যে খাজনা আদায় হইয়াছে তাহা সরকারী কোষাগার হইতে সেই সেই প্রজাদের ফেরৎ দেওয়া হইক।"

নূরজাহানের জন্ম ও বিবাহ

"জাহাঙ্গীরনামা" নামক ইতিহাসের লেখক সময় উপযুক্ত নয় দেখিয়া এবং উভয় পক্ষের মান রাখিয়া চলা আবশ্যক বলিয়া এই কাহিনীর আদি ও অন্ত বর্ণনা করিতে অনেকগুলি ঘটনা চাপা দিয়াছেন এবং বিষয়টি অন্যরূপ করিয়া সাজাইয়াছেন। কিন্তু আমি (অর্থাৎ খাফি খাঁ) অনুসন্ধান করিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, এবং সুজার চাকর মুহম্মদ সাদিক্ তব্‌রেজী লিখিত "মন্‌হজ্-উল-সাদিকাইন্" নামক গ্রন্থে পড়িয়াছি, তাহা এইরূপ:—নূরজাহানের পিতা ঘিয়াস্-বেগ পারস্য দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন এবং শাহ্ তহ্‌মাস্প নামক রাজার অধীনে খুরাসানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। পরে তাঁহার নিকট অনেক রাজস্ব বাকী হওয়ায় এবং অন্যান্য বিপদ ঘটায়, তিনি অত্যন্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, এবং দেশত্যাগ করিয়া নিজের স্ত্রী, দুই কন্যা এবং এক পুত্র সহিত হিন্দুস্থানে আসিবার পথিকদলের সঙ্গে জুটিলেন। পথে তাঁহার উপর আরও বিপদ আসিয়া পড়িল এবং সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। তাঁহার অবস্থা এমন শোচনীয় হইল যে এই পাঁচ ছয় জন লোকের চড়িবার ও জিনিষ বহিবার জন্য শুধু দুইটি উট অবশিষ্ট ছিল, এবং তাঁহারা পালাক্রমে তাহাতেই চড়িতেন। তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী থাকায় তাঁহাকে উটে

নূরজাহানের জন্ম ও বিবাহ

যদুনাথ সরকার

চড়ানই বেশী আবশ্যক হইয়াছিল। কান্দাহারের নিকট পৌঁছিলে নূরজাহানের জন্ম হইল। শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, এবং ক্ষুধার্ত্ত, পথশ্রমে ক্লান্ত ও পীড়িত মাতার স্তনে কন্যার পানের জন্য যথেষ্ট দুগ্ধ দেখা দিল না। তখন তাঁহারা মেয়েটিকে একখানা কাপড়ে জড়াইয়া ভগবানে সমর্পণ করিয়া রাত্রিকালে পথিকদলের মধ্যে বাখিয়া দিলেন। প্রাতে যখন সকলে যাত্রা আরম্ভ করিবে, শিশুর ক্রন্দন মালিক মাস্‌দ নামক ঐ দলপতির কোন চাকরেব কানে পৌঁছিল। সে উহাকে তুলিয়া প্রভুর কাছে আনিল। মেয়ের মুখ দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, এবং নিজের সন্তান না থাকায় সন্তানের মতন পালন করিতে লাগিলেন। মেয়েটিকে স্তন্‌পান করাইবার জন্য খুঁজিয়া তাহার মা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোক পাওয়া গেল না। পথিকদের নেতা তখন ঘিয়াস্‌-বেগ ও তাঁহার স্ত্রীকে আদর কবিয়া কাছে আনিলেন এব, তাঁহাদের চড়িবার উট এবং জিনিষ-পত্র দান কবিলেন। মেয়ের মা'ই তাহার ধাত্রী নিযুক্ত হইলেন, এবং তাঁহাদের ভরণপোষণেব বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

মালিক মাস্‌দ প্রতিবৎসরই পারস্য হইতে পথিকদল লইয়া ভারতে আসিতেন এবং বাদশাহ আকবরকে নিজের বাণিজ্য দ্রব্য হইতে বাছিয়া ভাল ভাল উপহার দিতেন। আকবব বলিলেন, "তোমার এবারকার কোন উপহারই যে আমার উপযুক্ত বোধ হইতেছে না।" যাত্রী-দলপতি উত্তর করিলেন, "আমরা কাপড়-বিক্রেতা; আমাদের কোন্ উপহার এই সম্রাটের যোগ্য হইতে পারে? কিন্তু এ বৎসর আমি কয়েকটি সজীব অমূল্যরত্ন সঙ্গে আনিয়াছি। যদি আপনি তাহাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি করেন, তবে বলিতে পারি যে এমন উপহার ইরাণ ও তুরাণ হইতে ভারতবর্ষের সম্রাটদের জন্য এ-পর্য্যন্ত কখনও আসে নাই।" তাহার পর বাদশাহ তাহাদিগকে উপস্থিত করিতে বলিলেন এবং ঘিয়াস্‌-বেগ ও তাঁহার পুত্র আবুল্‌হসন্‌কে নিজের কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এবং কার্য্যদক্ষতায় দিনদিন তাঁহাদের পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

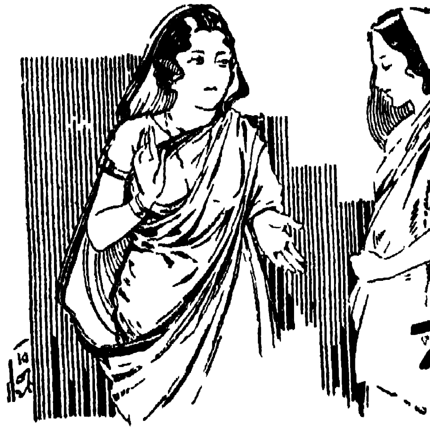
মালিক মাসুদের স্ত্রীর বাদশাহের অন্তঃপুরে যাইবার অনুমতি ছিল। তিনি নূরজাহান ও নূরজাহানের আপন মাতার সহিত তথায় যাতায়াত করিতেন এবং উৎসবের দিনে বেগমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গৌরব ও নগদ টাকা, গহনা, কাপড় প্রভৃতি উপহার পাইতেন।

নূরজাহানের জন্ম ও বিবাহ

যদুনাথ সরকার

তুর্কী-জাতির আস্তাখলু শ্রেণীর আলীকুলী নামক এক যুবক প্রথমে পারস্যরাজ শাহ্ তহ্মাস্পের পরিবেষণকারী ভৃত্য ছিল, পরে ভারতে আসিয়া মুলতানের শাসনকর্ত্তার অধীনে কাজকর্ম্ম ভাল করায় খ্যাতিলাভ করে এবং বাদশাহের নিকটস্থ কর্ম্মচারীদের দলভুক্ত হয়। আকবরও তাহাকে ভালবাসিতেন; তাহাকে শেরাফ্‌কন্ অর্থাৎ 'ব্যাঘ্রহন্তা' উপাধি দিয়া তাহার সহিত তাড়াতাড়ি নূরজাহানের বিবাহ দিয়া ফেলিলেন, এবং বাঙ্গালায় এক জাগীর দান করিলেন। শেরাফ্‌কন্ কিছুদিন মহারাণার সহিত যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া পরে জাগীরে গিয়া বাস করিতে লাগিল।

জাহাঙ্গীর সম্রাট হইয়া তাঁহার দুধ-ভাই কুতবুদ্দীন খাঁ কোকল্‌তাশ্‌কে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন এবং বিদায় দিবার সময় গোপনে শেরাফ্‌কন্ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দিলেন। শেরাফ্‌কন্ দরবারে তাহার প্রতিনিধির চিঠি হইতে এই গোপনে কথাবার্ত্তার সংবাদ পাইল, এবং "প্রেম ও কস্তুরীর গন্ধ লুকান যায় না" এই প্রচলিত বচন অনুসারে বাদশাহের অভিপ্রায় বুঝিয়া লইল। সেইদিনই জেলার সংবাদলেখক কর্ম্মচারীকে কহিল, "আজ হইতে আমি আর বাদশাহের চাকর নই" অস্ত্রসজ্জা করা ছাড়িয়া দিল। কুতবুদ্দীন খাঁ বাঙ্গালায় পৌঁছিয়া শেরাফ্‌কন্‌কে দেখা করিবার জন্য কত চিঠি লিখিলেন, কিন্তু সে আসিল না। তখন কুতবুদ্দীন সরকারী কাজের ভাণ করিয়া তাহার জাগীরের নিকট পৌঁছিলেন এবং শেরাফ্‌কন্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শেরাফ্‌কন্ অর্দ্ধ-আস্তীন জামার নীচে বর্ম্ম ও তরবারি পরিয়া দু-চার জন অনুচরসহ কুতবুদ্দীনের কাছে আসিয়া দেখা করিল। কুতবুদ্দীন সম্ভাষণ ও কুশল জিজ্ঞাসার পর বাদশাহের প্রস্তাবটি মিষ্টভাবে শেরাফ্‌কনের সম্মুখে উপস্থিত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন এবং সম্রাটের হুকুম মানিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। কিন্তু সেই সিংহহৃদয় বীর বুঝিল যে কথায় রাগ প্রকাশ করা বৃথা, এবং কুতবকে মারিয়া নিজে মরা ভিন্ন মানের সহিত প্রাণ লইয়া সে স্থান হইতে বাহির হওয়া অসম্ভব। তখন শেরাফ্‌কন্ আস্তীনের নীচে হইতে ছোরা বাহির করিয়া কুতবুদ্দীনের পেটে এমন জোরে ঘা মারিল যে তিনি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। শের ছুটিয়া পলাইবে এমন সময় সুবাদারের একজন কাশ্মীরী চাকর পথরোধ করিয়া তরবারের আঘাত করিল; শের তাহাকে মারিয়া ফেলিল; কিন্তু ইতিমধ্যে কুতবের আর সব অনুচর পৌঁছিয়া অনেক অস্ত্রাঘাতে শেরের প্রাণ লইল।



রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

অপরাহ্নে কাদম্বিনী যখন কাজে আসিল, কর্ত্রী ক্ষণপ্রভা প্রথমেই তাহাকে প্রশ্ন করিল, "তোমার ছেলেটাকে নাকি স্কুলে প'ড়তে দিয়েছ ?"

কাদম্বিনী কহিল, "হ্যাঁ মা।"

ক্ষণপ্রভা কহিল, "বল্লুম খেতে পর্‌তে দেব, এখানে থাক্, এই ফাইফরমাসটা খাট্‌বে, ছেলেদের স্কুলে দুধ জলখাবার দিয়ে আস্‌বে, তা হ'ল না, স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিলে ? লেখাপড়া শিখে কি কর্‌বে, জজ ম্যাজিষ্টার হবে ?"

কাদম্বিনীর ইচ্ছা হইল, বলিয়া ফেলে, 'যদি বরাতে থাকে, হবে,' কিন্তু তাহা না বলিয়া শুধু কহিল, "খোকার বড্ড ইচ্ছে স্কুলে ভর্ত্তি হয়, লেখাপড়া শেখে, তাই।"

ক্ষণপ্রভা কহিল, "বেশ, দেখুক চেষ্টা ক'রে, কেষ্ট বিষ্টু একটা কিছু হ'তে পারে যদি। তা ত' হ'ল, মাসে মাসে স্কুলের মাইনে গুণ্‌বে কোত্থেকে ?"

কাদম্বিনী কহিল, "আপনার দয়ায় মাইনে লাগ্‌বে না, - মাষ্টার মশায় তাকে ফ্রি ক'রে নিয়েছেন।"

ক্ষণপ্রভা অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কহিল, "ওঃ,—তা তুমি মা হ'য়ে ছেলের ভবিষ্যতটা একবার ভাব্‌লে না ? স্কুলে দাও আর যা কর, সেই ত দু'দিন পরে পরের বাড়ী কাজ ক'রে খেতে হবে, তা আগে থেকে তাই করানই ত'ছিল ভাল,—লেখাপড়ার কি দাম, তা ত' তোমরা বোঝ না,—এই ব'লে রাখ্‌লুম, শেষকালে একূল ওকূল দুকূল যাবে। দু'পাতা ইংরিজি পড়্‌লে, বাবুর তখন চাকরের কাজ করতে লজ্জা কর্‌বে।"

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

কাদম্বিনীর মনে বড ব্যথা লাগিল। আজ না হয় অদৃষ্টের ফেরে পরের বাড়ী সে রাঁধুনীর কাজ করিতেছে। সে কহিল, "মা, আশীর্ব্বাদ করুন, খোকাকে যেন কোনদিন চাকরের কাজ না করতে হয়।"

ক্ষণপ্রভা ভ্রূ কুচ্‌কাইয়া কহিল, "আমাকে ঠাট্টা করা হ'চ্ছে?"

কাদম্বিনী জিভ কাটিয়া কহিল, "অমন কথা বল্‌বেন না মা,—আপনি মনিব,—আমার যে জিভ্‌ খসে যাবে।"

ক্ষণপ্রভা মনে মনে খুশী হইল, কিন্তু বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না, কহিল, "কি জান বাছা, দু'দিন পরে জজ-ম্যাজিষ্টারের মা হবে, ঠাট্টা ক'রতেও ত' পাব।"

কাদম্বিনীর চোখে জল আসিল। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমরা দুখী মানুষ, আপনি দয়া ক'রে দু'টি খেতে দিচ্ছেন, তাই বেঁচে আছি। আমাকে কেন অমন কথা বলছেন মা?"

ক্ষণপ্রভা সদয় হইয়া কহিল, কাঁদচ কেন বাছা,—বেশ ত', লেখাপড়া করার সখ হ'য়েছে, দু'দিন করুক্‌ তারপর কাজে লাগিয়ে দিয়ো।"

কাদম্বিনী আর কি বলে, শুধু কহিল, "হ্যাঁ মা, তাই দেব।"

তাহার পুত্র নির্ম্মল প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটী আলো লইয়া তাহার মনিব-বাড়ী আসিত। বারান্দা কিম্বা বাহিরের ঘরে একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। মাতার কাজ শেষ হইলে তাহার সঙ্গে বাড়ী ফিরিত। সেদিনও যথাসময়ে নির্ম্মল আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসিয়া মনিবপুত্র বিজনকুমার তখন মাথা দোলাইয়া দোলাইয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল। নির্ম্মল লণ্ঠনটী ঘরের কোণে রাখিয়া কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে তক্তপোষের নিকট গিয়া দাঁড়াইল, এবং তক্তপোষের একটী কোণে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "কি প'ড়ছ ভাই,—ভূগোল বুঝি?"

বিজন ধমক্‌ দিয়া উঠিল, "ও, স্কুলে ভর্ত্তি হ'য়ে একেবারে লায়েক্‌ হয়ে গেছ? আমার যা খুশী প'ড়ছি, তোর কি রে! যা এখান থেকে।"

"কি হ'য়েছে রে বিজু?" এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষণপ্রভা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

বিজন কহিল, "এই দেখ না মা, ছোঁড়াটার আস্পর্দ্ধা—, আমায় বলে কিনা, ভাই,—আমার গায়ের ওপর ব'সে জিজ্ঞেস করে কিনা, কি পড়ছিস্ রে।"

নির্ম্মল জড়সড় হইয়া তক্তপোষের কোণে বসিয়াছিল,—এ কি হইল? সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, কি দোষ তাহার হইয়াছে। বিজন তাহার সমপাঠী,—সমপাঠীকে ভাই সম্বোধন করিয়া পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কি দোষ সে করিয়াছে? কিন্তু সে যে বিজনদের বাড়ীর রাঁধুনীর ছেলে, মনিবের ছেলেকে ভাই সম্বোধন করিয়া পড়ার কথাটা জিজ্ঞাসা করাটাই যে অপরাধ, শিশু নির্ম্মল তাহা বুঝিবেই বা কেমন করিয়া।



ক্ষণপ্রভা কথাটা তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিল, কহিল, "মনিবের ছেলের সঙ্গে কি এক বিছানায় বস্‌তে হয়—নেমে ব'স্।"

নিশ্মল ভয়ে ভয়ে তক্তপোষ হইতে নামিয়া মেজের উপর দাঁড়াইল।

ক্ষণপ্রভা কহিল, "ভাই ব'ল্‌তে হয় কাকে তাও জানিস্ নি! মনিবের ছেলেকে ভাই বল্‌লে যে তাকে অপমান করা হয়, তোর মাকে জিজ্ঞেস্ করিস্ সে তোকে বুঝিয়ে দেবে। আমিও তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি,—ভাই ব'লে কাদের ডাক্‌বি জানিস এই তোর মত ঝি-রাঁধুনীর ছেলে যারা, তাদের।"

নির্ম্মলের মুখ কালী হইয়া গেল, তাহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

এইবার বিজনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে ক্ষণপ্রভা কহিল, "তা বুঝি জানিস্

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

নি বিজু—বামুনদিদিব ছেলে জজ ম্যাজিষ্ট্রাব হবে, তাই ত' তার মা তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছে।"

বিজন কহিল, "তাই না কি মা! ও যদি জজ ম্যাজিষ্ট্রাব হয় তাহ'লে বেহারা চাপরাসী হবে কারা?"

ক্ষণপ্রভাব হাসি যেন আব থামিতে চায় না। শেষে অনেক কষ্টে হাসি থামাইয়া সে কহিল, "খুব কথাটা বলেছিস্ বিজু—তোব মাথা আছে দেখ্ছি। সাধে আব ক্লাসেব মধ্যে তুই ফাষ্ট হ'স্।"

পুত্রেব প্রশংসায় মাতাব বুক ভবিয়া গেল। অথচ আব একজনের কচি ছেলেব মনে আঘাত দিতে সেই মা-ব বুকে এতটুকু আঁচড়ও লাগিল না।

বিজুব দিকে চাহিয়া ক্ষণপ্রভা কহিল, "নে পড়্,—শুধ শুধু তোব পড়া কামাই হ'য়ে গেল।" তাবপব নির্ম্মলেব দিকে চাহিয়া কহিল, 'যেখানে বোজ বোজ ব'সে থাকিস্, সেইখানে গিয়ে বস্‌বি, বুঝ্‌লি ও-ব পড়াব আব ক্ষতি কবিস নি।" এই বলিয়া ক্ষণপ্রভা ভিতবে চলিয়া গেল।



নির্ম্মল মুখ নীচু কবিয়া ধীরে ধীবে ঘবের কোন্‌টীতে গিয়া বসিল। যতক্ষণ না তাহাব জননীব কাজ শেষ হইল, ততক্ষণ দুই হাঁটুব মধ্যে মুখ ঢাকিয়া সেইখানে সে বসিয়া বহিল। যেন কত সে অপবাধ কবিয়াছে!

পথে বাহির হইয়া নির্ম্মল কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "আর কখনও আমি ওদের তক্তপোষে ব'স্‌ব না মা।"

তাহার ছেলের ঐ স্পর্দ্ধার কথাটা ক্ষণপ্রভা ভিতরে গিয়াই কাদম্বিনীকে জানাইয়া

দিয়াছিল এবং ঝি-রাঁধুনীর ছেলেদের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে এমনই কুফল ফলিয়া থাকে, তাহাও বলিতে ভোলে নাই।

কাদম্বিনী অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কাজ কি বাবা ওদের তক্তপোষে ব'সে। হাজার হ'ক ওরা মনিব।"

নির্ম্মল অপরাধীর মত কহিল, "আমি ত' আগে কোনদিন বসি নি, আজ ব'সেছিলুম, স্কুলে ত এক বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসি, তাই ব'সেছিলুম মা। কই, মাষ্টারমশায় ত' উঠিয়ে দিলেন না, মেজেতে বস্‌তে বল্‌লেন না।"

কাদম্বিনী কহিল, "স্কুলে সব ছেলেই সমান যে,—সেখানে গরীব বড়লোকের তফাৎ নেই,—মনিবের ছেলে, ঝি-রাঁধুনীর ছেলেতে কোন তফাৎ নেই। নিজেদের বাড়ীতে বড়লোকরা গরীবদের তফাৎ ক'রে রাখে, ঝি-রাঁধুনীদের ত' রাখবেই। তুই একটা কথা শিখে রাখ্‌বি,—নিজেদের মান নিজেদের কাছে—বড়লোকের ছেলেদের কাছে থেকে তুইও তফাতে থাক্‌বি।"

নির্ম্মল কহিল, "হ্যাঁ মা, তাই থাক্‌ব। তুমি আমায় যা ব'লে দাও, তাইত আমি মনে ক'রে রাখি মা, আমি ত' কোনদিন ভুলি না।"

কাদম্বিনী কহিল, "তা আমি জানি বাবা।"

নির্ম্মল কহিল, "হ্যাঁ মা, মা-ঠাক্‌রুণ বিজুকে বলছিলেন, আমি না কি জজ-ম্যাজিষ্টার হ'ব, তাই তুমি আমায় স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিযেছ?"

কাদম্বিনীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। এদের প্রাণে কি এতটুকু মায়া-দয়া নেই। দুধের বাছা, তাহাকে এইরূপ উপহাস করা! হে ভগবান, যেন ক্ষণপ্রভার কথাই সত্য হয়! ভগবানের কাছে মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়া কাদম্বিনী জোর দিয়া কহিল, "হ্যাঁ বাবা, জজ্-ম্যাজিষ্টার হ'বি ব'লেই ত' স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিযেছি। মা-ঠাক্‌রুণ ঠিক কথাই বলেছেন। এখন থেকে খুব মন দিয়ে প'ড়বি,—সব পরীক্ষায় ফাষ্ট হ'বি, জলপানি পাবি,—তবে ত' জজ-ম্যাজিষ্টার হ'তে পারবি।"

নির্ম্মল উৎসাহভরে কহিল, "তুমি যা যা ব'লছ—ঠিক তাই ক'রব। তুমি যখন ব'লচ, আমি ঠিক জজ্‌ ম্যাজিষ্টার হব।"

* * * *

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

বৎসর ঘুরিয়া গেল। কাদম্বিনী ক্ষণপ্রভার গৃহে সেই রাঁধুনীর কাজ করিতেছে। সেইদিন হইতে নির্ম্মল আর সন্ধ্যার সময় এ বাড়ীতে আসে না, নিজেদের কুঁড়ে ঘরে বসিয়া পড়ে। মাতার কাজ যে সময় শেষ হয়, ঠিক সেই যময় মনিবদের গৃহদ্বারে গিয়া পৌছায় এবং তাহাকে আলো ধরিয়া গৃহে লইয়া আসে। বাড়ীতে অপমান করিবার সুযোগ না পাইলেও স্কুলে বিজন তাহাকে রাঁধুনীর ছেলে বলিয়া মাঝে মাঝে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ক্ষণপ্রভাও নির্ম্মলের পড়া লইয়া কাদম্বিনীকে মাঝে মাঝে খোঁচা দিতে ছাড়ে না। নির্ম্মল ও কাদম্বিনী চুপ করিয়া শুনিয়া যায়, কোন উত্তর দেয় না।

ভাল ছেলে বলিয়া বিজনের স্কুলে বিশেষ খ্যাতি ছিল, প্রতি বৎসর সে প্রথম হইয়া উপরের ক্লাশে উঠিত। এবারও সকলে আশা করিয়াছিল, সেই প্রথম হইবে, কিন্তু বাৎসরিক পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল, তখন দেখা গেল, নির্ম্মল প্রথম স্থান এবং বিজন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে, কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, কি অঙ্ক, কি ভূগোল, কি ইতিহাস, কি স্বাস্থ্য সব বিষয়ে বিজনের চেয়ে সে বেশী নম্বর পাইয়াছে। বিজন মুখ কালী করিয়া বাড়ী ফিরিল।

মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ও স্কুলে আর প'ড়ব না মা ?"

পুত্রের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া মাতা কহিল, "কেন বাবা, কি হ'য়েছে বাবা ?"

বিজন কহিল, "মাষ্টার মশাই নির্ম্মলকে ফাষ্ট ক'রে দিয়েছেন।"

ক্ষণপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ—কি বল্‌লি, তুই ফাষ্ট হতে পারিস্ নি—রাঁধুনীর ছেলেটাকে ফাষ্ট ক'রে দিয়েছে। অ্যাঁ, বলিস কি রে! নিশ্চয় মাষ্টাররা ব'লে দিয়েছে—না হয় ও বই দেখে লিখেছে—বাড়ীতে দু' দু'টো মাষ্টার তোকে পড়ায়, আর সে নিজে প'ড়ে ফাষ্ট হ'ল, এও আবার কথা! উনি আসুন,—এর একটা বিহিত ক'র্‌তে হবে—স্কুলে এই সব জুচ্চুরি।"

তাহার জননীকে পরীক্ষার খবর দিবার জন্য নির্ম্মলও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ক্ষণপ্রভাকে সম্মুখে দেখিয়া সে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধুলা লইতে গেল।

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

দুই পা পিছাইয়া গিয়া ক্ষণপ্রভা কহিল, "ঢের হ'য়েছে, অত ভক্তিতে আর কাজ নেই। শুনেছি, শুনেছি তুই ফাষ্ট হ'য়েছিস্,—আমার বিজনের মুখে চুণ-কালী দিয়েছিস্। জানি, জানি, জুচ্চুরি করে ফাষ্ট হয়েছিস্, তাতে অত গুমোর কিসের রে! আদিখ্যেতা ক'র্‌গে যা তোর মা'র কাছে।"



নির্ম্মল যেন কেমন এক রকম হইয়া গেল।

কাদম্বিনী অদূরেই দাঁড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া আসিয়া দুই হাত বাড়াইয়া পুত্রকে কোলের ভিতর টানিয়া লইল। আজ আর সে সহ্য করিতে পারিল না, কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "আপনারও ত' পেটের ছেলে আছে মা, পরের ছেলেকে অমন আঁতে ঘা দিয়ে কথা বল্‌তে নেই।"

ক্ষণপ্রভা গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! দাসী-বাঁদীর অত কথা কিসের—আমায় গাল দেওয়া!—দূর ক'রে দিলে খাওয়া জুটবে কোত্থেকে তাও দেখ্‌ব। চুরি ক'রে দু'বেলা গাদা গাদা ভাত, মাছ তরকারি নিয়ে যাস্—"

তাহার কথা শেষ হইল না, নির্ম্মল বলিয়া উঠিল, "আমার মাকে চোর ব'ল্‌বেন না—ব'লছি—" সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল।

কাদম্বিনী পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, "চল্ বাবা, এখানে থেকে আমাদের কাজ নেই।"

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

ক্ষণপ্রভা নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, কাদম্বিনী নির্ম্মলকে লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল।

পথে যাইতে যাইতে নির্ম্মল কহিল, "ও বাড়ীতে আর তুমি কাজে যেও না মা,— আমি বড় হ'য়েছি, তুমিই বা আর কাজ ক'র্‌বে কেন - আমি কাজ ক'রব, পয়সা আন্‌ব।"

কাদম্বিনীর চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। মার অপমান পুত্রের বুকে যে কতখানি বাজিয়াছে তাহা সে বুঝিল। চোখের জল মুছিয়া সে কহিল, "তোমাকে যে মানুষ হ'তে হবে বাবা, তোর এখন কাজ ক'র্‌লে চল্‌বে কেন? ততদিন আমায় পরের বাড়ী কাজ ক'র্‌তেই হবে। অন্য বাড়ীতে কাজ খুঁজে নেব।"

* * * *

দীর্ঘ প'নর বৎসর পরের কথা। কাদম্বিনার আশা ছিল তাহার ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া ভাল চাকুরী করিবে। জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে, এমন আশা সে কোন দিন করে নাই। এমন কি সে কথা সে ভাবিতেও পারে নাই। নির্ম্মল সেই জজ্-ম্যাজিষ্ট্রেট-ই হইয়াছে। নিম্নশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাট্রিক, আই-এ, বি-এ, এম্-এ প্রত্যেক পরীক্ষায় সে সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছে। তারপর—আই-সি-এস্ পরীক্ষায় প্রথম হইয়া বিলাতে গিয়া পাকা ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া দেশে ফিরিয়াছে। সম্প্রতি সে নবাবগঞ্জ মহকুমার হাকিম হইয়া আসিয়াছে। লোকের মুখে তাহার সুখ্যাতি আর ধরে না। ছোট বড় গরাব বড়লোক সকলের সহিত সে সমান ব্যবহার করে। কি অমায়িক—বিলাত-ফেরত হাকিম, একটুকু সাহেবিয়ানা নাই! আর এক বিষয়ে সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল, প্রত্যহ আদালতে আসিবার সময় এবং অন্য কাজে বাড়ীর বাহির হইবার সময় সে তাহার জননীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিত। চাপরাসীরা দেখিয়াছে, তাহার বন্ধুবান্ধবরা দেখিয়াছে, আরও কত লোক দেখিয়াছে! আশ্চর্য্য হইবারই কথা, এখনকার বি-এ এম-এ; পাশ ফেল্ করা ছেলেরাই পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করাটা,—পদধূলি লওয়া ত' দূরের কথা—অসভ্যতা বলিয়াও মনে করে। বিলাত-ফেরতদের ত' কথাই নাই! যাক্।

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

সেদিন সন্ধ্যার পর নির্ম্মল তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া আফিসের কাগজপত্র দেখিতেছিল, এমন সময় আর্দ্দালীর সহিত একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্ম্মল তাহার দিকে চাহিয়া সমাদর করিয়া কহিল, "আসুন, আসুন বিনোদ বাবু, বসুন।"

বিনোদ মিউনিসিপ্যাল আফিসের কেরাণী। কুণ্ঠিতভাবে চেয়ারে উপবেশন করিয়া এ কথা সে কথার পর কহিল, "আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছি, স্যার।"

নির্ম্মল কহিল, "কি বলুন?"

বিনোদ কহিল, "আজ প্রায় এক মাস হ'ল আমার এক দূর-সম্পর্কের ভগিনী, আর তার এক ছেলে আমার ঘাড়ে এসে প'ড়েছে, আমি ছা-পোষা মানুষ, কি ক'রে চালাই বলুন স্যার? অথচ ফেল্‌তেও পারি নি, তাদের মাথা গোঁজ্‌বার স্থান নেই, এক মুঠো খাবে এমন অবস্থাও তাদের নেই। একদিন যথেষ্টই ছিল, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছে স্যার। ছেলেটার একটা কিছু না ক'রে দিতে পারলে ত' আর চলে না। আদালতে একটী পিয়নের চাকরী খালি হ'য়েছে, –আপনি যদি দয়া ক'রে তাকে চাক্‌রীটি দেন্, আমি বেঁচে যাই স্যার। ছেলেটী ম্যাট্রিক অবধি প'ড়েছে।"

নির্ম্মল কহিল, "দেখি কি ক'র্‌তে পারি,—এর ভেতর বার চোদ্দখানা দরখাস্ত প'ড়েছে –তার মধ্যে আট দশজন ম্যাট্রিক পাশ। অবশ্য ম্যাট্রিক পাশ নিতে হবে এমন কোন কথা নেই।"

বিনোদের মনে আশা হইল। সে তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি তাকে সঙ্গে করে এনেছি স্যার, যদি হুকুম দেন তাকে হুজুরের সাম্‌নে নিয়ে আসি।"

নির্ম্মল কহিল, "বেশ ত' আনুন্।"

বিনোদ তখনই বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরে একটী যুবককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

যুবকটী কোন রকমে কপালে হাত ঠেকাইয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইতেই বিনোদ বলিয়া উঠিল, "ব'সে, গড়্ হ'য়ে প্রণাম কর। অন্য হাকিম হ'লে এতক্ষণ তোমায় ঘর থেকে বার ক'রে দিতেন।"

রাঁধুনীর ছেলে

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল

যুবকটী অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি হেঁট হইতেই নির্ম্মল কহিল, "থাক্, হ'য়েছে। "তোমার নাম কি ?"

যুবকটী কহিল, "শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়।"



নির্ম্মল তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "কি ব'ল্‌লে, বিজন ? তোমাদের বাড়ী কি মহেশপুর ?"

যুবকটী কহিল, "আজ্ঞে।"

নির্ম্মল তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজনের নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া কহিল, "এত রোগা হ'য়ে গেছ, হঠাৎ তোমায় আমি চিন্‌তে পারি নি, কিছু মনে ক'র না ভাই। আমায় চিন্‌তে পার কি ? আমি যে নির্ম্মল।"

বিজন হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদবাবু কহিল, "আপনি একে চেনেন্ স্যার ?"

নির্ম্মল কহিল, "চেনেন্ কি ব'ল্‌ছেন, বিনোদবাবু! আমরা যে ছেলেবেলায় এক সঙ্গে প'ড়েছি। শুধু তাই নয়, এঁদের খেয়েই আমি মানুষ। আমার মা যে এঁদের বাড়ী রাঁধ্‌তেন।"

বিনোদবাবু দুই চোখ বড় করিয়া নির্ম্মলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! বিজন থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

কৈলাস

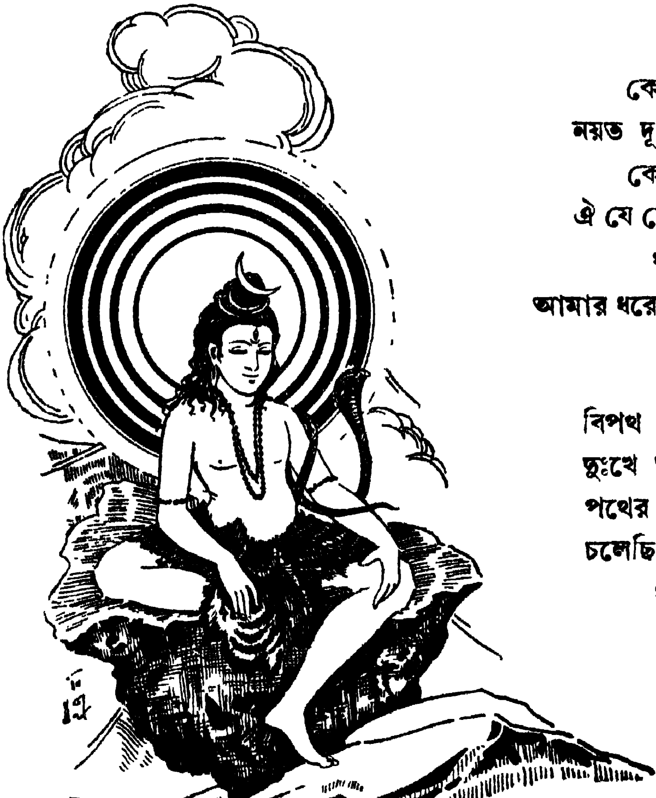


গান

কথা, সুর ও স্বরলিপি—

শ্রীসরলা দেবী

কে যাবি কৈলাস !
নয়ত দূরে, নয় দূরে ভাই !
কে যাবি কৈলাস !
ঐ যে রে তার সোনার আভাষ !
ধরে না উল্লাস !—
আমার ধরেনা, ধরেনা, ধরেনা উল্লাস !



বিপথ ঘোরা অবোধ মোরা
দুঃখে তাপে ছিলেম নিরাশ
পথের রেখা দেখতে পেয়ে
চলেছি আজ পিতার সকাশ !
ধরেনা উল্লাস !



কৈলাস

শ্রীসরলা দেবী

ধাপে ধাপে ঐ সিঁড়িতে চড়ি,
কখনও বা যাই গড়াগড়ি,
আবার উঠি আবার পড়ি,
কে দেয় রে নূতন আশ্বাস !
ধরেনা উল্লাস !

অমল শ্বেত শিখর পরে'
দাঁড়িয়ে পিতা মোদেরই তরে
চাঁদা মুকুট মাথায় প'রে
হাসেন শিব সুন্দর হাস !
ধরেনা উল্লাস !

স্বর-লিপি

মিশ্র-ভূপালী—একতালা।

গা মা গা রা সা ধসা | া সা—া—া —া—না | সা—া সা গা গা—
কে — যা বি কৈ — লা — — — — স ন য় ক দূ রে —

গা -া মা পা পা, ধপা | গা মা গা রা সা রসা | না সা—া
ন য় দূ রে ভা ই কে যা বি কৈ - লা — —

—া—া—া | া সা পা পা পা পা ধর্সা | র্সা না—া ধা পা—া।
— — স ঐ — যে রে তা র সো না র আ ভা য

পা ধা পা মা গরা গা | মা—া—া—া—া গমা | পা পা—া পা—া—া
ধ রে - না - উ ল্লা — — — স আমার ধ রে - না —

পা পা ধা না—া ধপা | পা ধা পা মগা রা গা | মা—া—া—া—া—া
ধ রে — না — - ধ রে — না — উ ল্লা — — — — স

কৈলাস

শ্রীসরলা দেবী

গা মা গা রা সা রসা না সা--া—া- া- া মা পা পা না না—া
কে — যা বি কৈ - লা — — — - স বি প থ ঘো রা —
অ ম ল শ্বে ত

র্সা র্সা—া না ধা না | র্সা - া গা র্রা া সা | না ধা না না র্সা —রা
অ বো ধ মো রা — দুঃ — খ তা পে ছি লে ম নি রা
শি খ র প রে - দাঁ ড়ি য়ে পি তা মো দে র্ই ত রে

র্সা—া—া—া —া—া | না র্সা--া র্সা র্সা রা না া গা না না া
- — - --- — শ্ প থে র রে খা দে খ্ তে পে যে
— — — — — — চাঁ দা মু কু ট মা থা য প ’রে

র্সা র্সা পা মা গা —া গা গা মা পা পা ধপা
চ লে — ছি যে — পি তা র স কা শ
হা সে ন শি ব — সু — ন্দ র হা স

গা মা গা রা সা রসা | না সা—া—া—া —সসা ।
ধ রে — না উ ল্লা — — স আমার

সা সা পা পা—া—া | পা পা ধর্সা র্সা ণধা পা ।
ধ রে — না — — ধ রে — না -- —

পা ধা পা মগা রা গা | মা—া—া—া—া পমা
গা মা গা রা সা রসা | না সা—া—া—া—া ॥
কে — যা বি কৈ — লা — — — — স

কৈলাস

শ্রীসরলা দেবী

প্‌া প্‌া ন্‌া না না—া | সা সা ৰা না সা—া | সা সা গা
ধা পে ধা পে ঐ — সিঁ ড়ি তে চ ড়ি ক খ ন

গা গা -া | গা মা মা গা া া ' গা পা —া ক্ষা পা
বা যা ই গ ড়া গ ড়ি - আ বা ব ট ি

গা মা গমপা মা গা —া | গা গা —া গা গা ||
আ বা ৰ প ড়ি - কে দে য় নূ ত ন

গা ৰা গা মা া মা ' গা গা া ৰা সা ৰসা |
আ - - শ্বা -- স ধ ৰে - না উ —

না সা া —া -া সা ॥
ল্ল — — - — স





বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দাদার কাছে পদে পদে এই হার মিন্নু কিছুতেই সইতে পারছে না। দাদা যা খুশী চাল দিয়ে বেড়ায়, আর সে তার ইস্কুলের বিষয় একটা কোনো গল্প ফাঁদতে গেলেই সবাই তাকে হেসে উড়িয়ে দেয়, তার কোনো কথায় কেউ এক বিন্দু উৎসাহ দেখায় না। মেয়ে বলে তার অনেক দুর্গতি। দাদা এবার ফোর্থ ক্লাশে প্রমোশান পেয়ে বড়ো ইস্কুলে উঠে গেছে—এখন থেকে তাকে দস্তুরমতো গাড়ি-ঘোড়া বাস-মোটার বাঁচিয়ে ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে যেতে হয় বলে তার কি অহঙ্কার! আর সে কিনা জুজুর ভয়ে গাড়িতে চড়ে ইস্কুল করছে! তাকে দিয়ে পৃথিবীর কোন্ কাজটা হবে শুনি—দাদা একদিন এরোপ্লেন চড়ে বিলেত যাবে, আর সে বাড়িতে বসে' বসে' উনুন ফোঁয়াবে, বার্লি জ্বাল দেবে, কাঁথা সেলাই কর্‌বে—মা তো তাকে অহনিশ এই বলেই বকে চলেছেন। যেখানে দাদার জন্যে আসছে একটা ফাউন্টেন পেন, সেখানে তার জন্যে বড়ো জোর এক গজ্ রিবন, দাদার জন্যে যেখানে দু'আনার টিফিন, সেখানে তার জন্যে বরাদ্দমাত্র এক পয়সার আলু-কাব্‌লি। কিছু বলতে গেলেই মা ধম্‌কে ওঠেন; ও ছেলে, ও বড়ো হয়ে কত পয়সা রোজগার করে আন্‌বে। তোরা মেয়েরা তো খালি শুষে নিস্—তোদের জন্যে যা খরচ, সে তো কেবল জলে ফেলা?

কিন্তু মেয়ে হয়েছে বলে এই অপমান মিন্নু আর সইতে পারছে না। সে বড়ো হ'তে পারবে না, এমন কোনো কথা আছে নাকি? ক্লাশের পরীক্ষায় এবার তো সে সেকেণ্ড হয়েছে। দাদা ছুটে এসে বল্‌লে,—জানি, দু' জনের মধ্যে তো? আজ্ঞে না, তাদের ক্লাশে গোনা-গুন্‌তি বত্রিশটি মেয়ে। দাদা তবু নিরস্ত হবে না, টিপ্পুনি কেটে বল্‌বে—ভারিতো তোদের ষ্ট্যাণ্ডার্ড—একশোর মধ্যে কুড়ি পেয়ে ফার্ষ্ট হয়; আমাদের ছেলেদের কথায় তাকে সোজাসুজি ফেল করা বলে।

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দাদার সঙ্গে কথায় সে পেরে ওঠে না, তাই অগত্যা সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে বসে। দাদা তক্ষুনি ঠাট্টা জুড়ে দেয়,—মেয়েরা ঐ কেবল কাঁদতেই পারে, আমরা হ'লে কাজে দেখিয়ে দিতুম। কিন্তু ঐ কান্না আর এস্রাজ বাজানো ছাড়া তোরা আর কি করতে পারিস, সত্যি করে বল্ দিকিনি?

ইস্! মেয়ে হয়েছে বলে মিনুও অমনি ভেসে আসেনি। বয়সে না হোক্, দাদার চেয়ে সে কোনো অংশে কম নয়, তার হাতেও পাঁচটা করে আঙুল আছে। বেশ, তাই সে প্রমাণ করবে। পড়ে'-পড়ে' আর সে দাদার বিদ্রূপ সইবে না। বাড়ীর যতো আদর দাদাকে, আর শাসন ফলাবার বেলায় এই মিনু। তাকে দিয়ে বাবা মা-র টাকা পয়সার দিক থেকে কোনো লাভ নেই, সে তাই একটা খোলামকুচির সমান। আচ্ছা, মিনু দেখে নেবে, কাঁচের মতো সে ঠুন্‌কো নয়, মনে তার অসীম জোর।

সে দিনের ব্যাপারটা ভারি সঙিন্ হয়ে দাঁড়াল। মিনুদের গানের শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তার বিদায় নেবার উপলক্ষে মেয়েদের দিয়ে ছোট খাটো একটা নাচ আর 'ট্যাব্‌লো' হবার কথা। মিনুর অবিশ্যি একটা পার্ট আছে, এবং তাদের হেড্-মিস্‌ট্রেস্ বলে দিয়েছেন যে যারা যারা প্লে করবে তারা যেন একখানা করে নতুন ধোলাই শাড়ি নিয়ে আসে—রঙে ছুপিয়ে নিতে হবে। অতএব মিনুর একখানা নতুন শাড়ি চাই—এবং এক্ষুনি তা কিনে ডাইং-ক্লিনিংএর দোকানে দিয়ে আর্জেন্ট ধুইয়ে আনতে হবে।

কথাটা সে পাড়্‌লো গিয়ে বাবার কাছে কিন্তু টিপ্পনি কাট্‌তে এলো দাদা,—"একেবারে কোরা শাড়ি কিনতে হবে তোকে কে বল্‌লে? নিয়ে তো যাবি কাচিয়ে, তোদের হেড্-মিস্‌ট্রেস্ বুঝবে কি করে যে এ পুরোন না আন্‌কোরা। যেমন তোর বুদ্ধি, কি শুনতে কি শুনিস্—মাথার ঠিক নেই।"

মিনু রেগে লাল হয়ে বল্‌লে,—"না আমার নতুন শাড়ি চাই। তুমি কেন সব-তাতে সর্দ্দারি করতে আস? তুমি মেয়ে-ইস্কুলের জান কী?"

দাদা বল্‌লে,—"জানি, মেয়েগুলো হচ্ছে আস্ত বোকা—যেমন খুশী তাদের বাঁদর-নাচ করানো যায়। নতুন শাড়ি কাচো, তারপর রঙে ছুপিয়ে নাচো।" দাদা হেসে একেবারে চৌচির।

আহেরিকা

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ছলছল চোখে মিনু বাবার কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলো। বাবা তাকে উল্টে ধমকে উঠলেন,—"এই মেয়েটার ফ্যাসানের জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে গেলাম। দাঁড়া. কালই আমি তোর নাম কাটিয়ে আনছি।"

ধমকের ধাক্কায় মিনু নাকে-মুখে কেঁদে উঠলো, আর অমনি দাদা ধুয়ো ধরলো,—"নতুন শাড়ি কাচো, তারপর.'বঙে ছুপিয়ে নাচো। নাচ্‌তে যদি না পারো তো আঁজলা ভরে হাঁচো।"

ফল হলো এই মিনুর আর পার্ট করা হলো না। দাদার জন্যে সেদিনো একটা ওপেন-ব্রেষ্ট কোট এসেছে, আর তার বেলায় একখানা শাড়ির জন্যে বাবার ব্যাগে পয়সা নেই! দুত্তোর ছাই, এ-বাড়িতে সে আর একদিনো থাকবে না, যেদিকে চোখ যায় সটান বেরিয়ে পড়বে। তার জন্যে যখন কারুর মায়া নেই, তখন তাদের জন্যে তার দুঃখ করতে ভারি বয়ে গেছে।

আজ রবিবার বিকেলে পাঁচটায় তাদের প্লে। নাচের কতোগুলি কায়দা সে আয়ত্ত করে রেখেছিলো, কিছুই তার দেখানো হলো না—বাড়ীতে বসে থেকে মুখ বুজে এই লজ্জা সে বইবে কি করে? না, আজই সে বেরিয়ে পড়বে—মা—বাবা বুঝুন, মেয়ে হয়েছে বলে নিতান্ত ফ্যাল্‌না নয়- -তাকে আর ফিরে আসতে না দেখে দাদারো চোখ দুটো এক সময় ছল্‌ছল্‌ করে উঠুক।

কিন্তু কোথায় সে যাবে? দাদা অনেক দিন চাল দিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে যে খালাসী হয়ে নাকি বিলেত চলে যাওয়া যায়—জাহাজে নাকি ছোট-ছোট-ছোকরা-চাকরের দরকার। কিন্তু সে যে নেহাৎ মেয়ে। হোলেই বা না হয় মেয়ে, তার ছেলে সাজতে কতক্ষণ? দাদার সেই স্যুট পরে মাথায় টুপি এঁটে বেরিয়ে পড়লেই হলো। তার তখনকার চেহারার কথা মনে করতেই মিনু ফুর্ত্তিতে নেচে উঠলো। হ্যাঁ, ছেলের পোষাকে বেরিয়ে পড়াই ভালো—চট্ করে কেউ কিছু সন্দেহ করতে পারবে না। এমনি ফ্রক্ পরে বেরুলে ধরা পড়তে তার বড়ো রাস্তায়ো যেতে হবে না। মেয়ে হওয়ার কতো অসুবিধা। তা হোক্, সে যে এই ফাঁকে স্যুট পরতে পাবে—এই ঢের।

দাদার ট্রাঙ্কের চাবিটা ঐ পেরেকে লট্‌কানো আছে। ট্রাঙ্ক খুলে মিনু দাদার পাম-বিচের স্যুটটা বার করলে। কোট তার গায়ে বেশ হয়, কিন্তু প্যাণ্ট?—এক লাফে

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সে দাদার মতো অতো লম্বা হয় কি করে? কুছ্ পরোয়া নেই। তার পায়ের ঝুলটা মেপে নিয়ে প্যাণ্টের ওপর সরকারি কাঁচি চালানো—কল চালিয়ে তার মুড়ি ভেঙে নিতে কতক্ষণ? দুপুর বেলা মা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন, বাবা কোর্টে, দাদা গেছে বন্ধুর বাড়ি ক্যারম্ খেলতে। আসুক না একবার ফিরে—মিন্নু প্যাণ্ট পরে কোমরে বেল্ট বাঁধতে লাগলো—মিন্নু চলে গেছে বলে দুঃখ না করলেও অন্ততঃ তার স্যুট নেই দেখে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বে। কেমন মজা? 'দাদা তখন কেঁদে খুন, নাইকো কোট—প্যাণ্টালুন।'

তার পর জুতো, —একটু ঢলঢলে হচ্ছে বটে তা ন্যাকড়া ঢুকিয়ে মিন্নু তার পায়ের মাপে জুতসই করে নিলো, কিন্তু চুল, চুল নিয়ে হলো তার ভাবনা। মেয়েদের অনেক ঝঞ্ঝাট। এতো বাজোর চুল নিয়ে তার কি হবে? কিন্তু নিজ হাতে মানানসই করে বব্ ই বা সে করবে কি করে? থাকগে ও—কতোদিনের চেষ্টায়, কতো মাথা ঘসে এই চুল সে এমন ফাঁপিয়েছে—ফুলিয়েছে, তা কেটে ফেলবার চিন্তায় তার মুখ ম্লান হয়ে গেলো। থাক্‌গে ও—রুমাল দিয়ে বেশ আঁট্ করে বেঁধে তাতে সে টুপি চাপালো। চুলের জন্যে সামান্য বড়ো টুপিটা দিব্যি খাপে-খাপে বসে গেছে দেখছি।

বাঃ, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে মিন্নু নিজেকে আর চিনতে পারছে না। 'হ্যালো, হাউ ডু ইউ ডু?' বাঃ, একেবারে খাঁটি সাহেব, খালাসির পোষ্ট তার মারে কে? তার পর কিছু পয়সা, না? মিনু তার সাবানের ফাঁকা বাক্স খেঁটে দেখলো মোটে সাড়ে চার আনা জমেছে য়্যাদ্দিনে। তাই সই। জুতো না মস্‌মসিয়ে মিন্নু সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো—সদর পেরিয়ে—একেবারে রাস্তায়। শিরদাঁড়া খাড়া করে তার পর গ্যাট্ গ্যাট্ করে চল্লো—মিনু দুনিয়ার কারো তোয়াক্কা রাখে না। তবে এক কথা, কাউকে গুড মর্নিং বলে টুপি তোলা চলবে না—তা হলেই সব বেফাঁস হয়ে যাবে।

বড়ো রাস্তায় পড়ে মিনু ট্র্যাম-মোটারের ভিড়ে হাঁপিয়ে উঠলো। হ্যা, দাদা একা রাস্তা পেরোতে পারে আর সে পারবে না? আর ঐ তো পাঁচ নম্বরের বাস্· ঐ বাস্‌এ সে গেলো বছর ন'দিকে আনতে বাবার সঙ্গে হাওড়া গিয়েছিলো। আর জাহাজের খালাসিই হ'তে চাও বা খান্‌সামাই হ'তে চাও—হাওড়া তোমাকে যেতেই হবে। অতএব, মিন্নু হাত তুলে ড্রাইভারকে বল্‌লে,—বাঁধ্‌কে।

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হ্যাঁ, বাস্‌এর টিকিট সে কাটবে বৈ কি, পয়সা তার নিজের কাছেই আছে। টিকিট কেটে মিনু দেখলে পকেটে মোটে আর দু'টি আনি। এ দিয়ে সে কোন দূর দেশ জয় করে আসবে না জানি? তবু তার পকেটে আট পয়সা এখনো আছে, পৃথিবীতে কত মহাপুরুষ তাঁদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে একেবারে রিক্ত হাতেই বেরিয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে পয়সা নেই বলে পিছিয়ে থাকবে—এমন ভীরু মেয়ে মিনু নয়। হাওড়া ষ্টেশানে নেমে মিনুর মাথা ঘুরে গেলো। সেই বিরাট জনতার সমুদ্রে পড়ে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এখন কোথায় সে যায়, কাকে সে ডাকে। ফ্যাল ফ্যাল করে সে চারদিকে তাকাতে লাগলো। বাড়ি ফিরে যাবার উপায় নেই—পকেটে দু' পয়সা কম। তা ছাড়া এ পোষাকে এখন বাড়ি ফিরে গেলে দাদা আর তাকে আস্ত রাখবে না, যে-কাঁচি দিয়ে সে তার প্যাণ্টালুনের পা কেটেছে, সেই কাঁচিতে দাদা তার কান কেটে দেবে নিশ্চয়। না, বাড়ি ফেরার নামও সে মনে আনবে না—ঐ বাড়িতে তার কেউ নেই। ভাইয়ের মধ্যে এক ঐ দাদা তাই তাকে ঘিরেই যতো আদর উথলে উঠেছে—আর সে হ'লো কিনা মার ষষ্ঠ কন্যা। তার আর আর বোনেদের বিয়ে হ'য়ে গেছে, তাই হাতের কাছে মিনুকে পেয়ে তারই ওপর যতো ধমক আর হুম্‌কি। না, সে এই অবিচারের প্রতিশোধ নেবে, সে কক্‌খনো বাড়ি ফিরে যাবে না। যা থাকে অদৃষ্টে, সে তার নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে।

সারি সারি প্লাটফর্মে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ফটকের সামনে বিস্তর ভিড়। ঐ নয় নম্বরের ট্রেণটাই বোধ হয় আগে ছাড়বে। মিনু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দলে পড়ে কখন নিরাপদে প্লাটফর্মে ঢুকে পড়েছে তার খেয়াল ছিলো না—হয়তো পরনে তার সাহেবি পোষাক দেখেই তাকে সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়েছে, কিম্বা ঐ বড় দঙ্গলটার সঙ্গে মিশে যাওয়াতে আলাদা করে তার কাছে কেউ আর টিকিট চায় নি। মিনু বুক ফুলিয়ে হেঁটে একটা ইণ্টার ক্লাশ কামরায় এসে উঠলো। গাড়িতে ভিড় থাকলে কি হবে, এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরাটিকে দেখে সামনের বেঞ্চিতে একটি বুড়ো ভদ্রলোক তার বিছানা গুটিয়ে তাকে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিলো।

ট্রেণ তারপর সময় বুঝে ছেড়ে দিলো। যাত্রিদের ভাঙা ভাঙা কথাবার্ত্তা শুনে মিনু বুঝতে পারছে গাড়িটা চলেছে কাশী—কিন্তু সেটা যে কতদূরে মিনু তার দুই চোখে কোনো

কূল পাচ্ছে না। তারপর বেলা যতোই গড়িয়ে গিয়ে চারিদিক অন্ধকারে কালি হয়ে উঠতে লাগলো ততোই তার, বলতে লজ্জা হয়, ভীষণ কান্না পেতে লাগলো। জানালার বাইরে চেয়ে মিনু দেখতে পেলো, গাছ-পালা-আকাশ-মাটি সব তার থেকে অবিশ্রান্ত দূরে সরে যাচ্ছে—সামনে তার আঁকড়ে ধরবার আর কিছু নেই। তাকে না পেয়ে বাড়িতে বাবা-মা কেমন দিশেহারা হয়ে উঠেছেন সেই কথা ভাবতেই কান্নায় তার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে উঠলো। কিন্তু না, কাঁদবে কি? বাবা-মা বুঝুন, একবার হারিয়ে গেলে তার দাম কেমন এক নিমিষে ছেলের সমান হ'য়ে ওঠে।

না এতো সহজেই সে মুষড়ে পড়বে না, ঐ ভদ্রলোকদের ল্যাজ ধরে সে কাশী গিয়েই হাজির হবে। যা থাকে অদৃষ্টে, কাশী—কাশীই সই। সেখান থেকে আবার সে নতুন পথ খুঁজে নেবে। বেরিয়ে এসে আবার যদি সে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যেই হাত-পা ছুঁড়তে থাকে তো সবাই তাকে একবাক্যে বলবে—ভুয়ো। একবাক্যে বলবে—মেয়ে। বিপদে পড়ে বিপদকে বশ করতে না পারলে সে আবার একটা মানুষ কী।

কিন্তু আসানসোলে হঠাৎ টিকিট-চেকার উঠতেই মিনুর মুখ ব্লটিং কাগজের মতো সাদা হয়ে এলো। ত্রস্ত চোখে কামরার চারিদিকে সে চাইতে লাগলো কেউ তার হয়ে একখানা হাফ-টিকিট দেখায় কি না। কিন্তু সে-গুড়ে বালি, চেকার শেষকালে তারই কাছে এসে হাত পাতলে—টিকিট?

মিনু চোখ বড়ো করে বললে—টিকিটের আমি কি জানি? এইটুকু ছেলের কাছে টিকিট থাকে নাকি?

চেকার বললে,—তবে তোমার টিকিট কার কাছে আছে দেখিয়ে দাও।

মিনু বেমালুম তার পাশের বুড়ো ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—কই, আমার হাফ-টিকিটটা দেখান নি?

ভদ্রলোক আৎকে উঠলেন, বিঘৎখানেক হা করে বললেন,—হাফ-টিকিট? ছোড়া বলে কি? তোমার টিকিট আমি কোথায় পাবো?

মিনু ভড়কে গিয়ে বললে,—কোথায় পাবেন তার আমি কি জানি? ছেলে-মানুষের টিকিট বড়োদের কাছেই থাকে। আমি তো আর নিজে রোজগার করি না।

ভদ্রলোক জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, মারমুখো হয়ে বললেন,—তোর টিকিট

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার কাছে থাকবে কেন ? আমি তোব কে ? আমার সঙ্গে তোকে নিয়ে যাব কোন আক্কেলে ? তারপর সহযাত্রিদের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন,—বাপের জন্মে একে আমি চিনিও না। ছোট ছেলে বলে খাতির করে তখন একটু জায়গা ছেড়ে দিয়েছিলুম বলে এখন একেবারে আমার ঘাড়েব ওপর দিয়ে পা চালাতে চাইছে ?



গাড়ীময় তুমুল সোবগোল পড়ে গেলো, চেকাব মিনুব আবো সামনে এসে গর্জ্জন করে উঠলো—তুমি কোথায় যাবে ?

মিনু ঘাড় উচিয়ে চেকারেব মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে বল্‌লে, তা আমি কী জানি।

চেকার রুক্ষ গলায় বল্‌লে—তবে কে জানে ?

সেই বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে ছোট্ট আঙুলটি বাড়িয়ে মিনু বল্‌লে,—ও।

—ও তোমার কে হয় ?

মিনু ঢোক গিলে বল্‌লে,—ও আমার জ্যাঠামশাই।

—জ্যাঠামশাই ? ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন,—আমি ঐ ম্লেচ্ছ ছেলেটার জ্যাঠামশায় ? পাজিটা বলে কি ? আমার নাম কি বল্ দিকি ?

মিনু বল্‌লে,—তা আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভদ্রলোক বেগে বলতে লাগলেন, শুনুন কথা। আমার নাম জানে না, ধাম জানে না—দিব্যি ভাইপো ফলাচ্ছে। আচ্ছা তোর বাবার নাম কি? তা তো জানিস।

মিনু স্বচ্ছন্দে বলে ফেল্‌লো,—শ্রীমোহিতকুমার বসু।

—বসু! ভদ্রলোক গাড়ী ফাটিয়ে হেসে উঠলেন: আর আমাব নাম হচ্ছে শ্রীশিবপদ সান্যাল। এই দেখুন আমার পৈতে। সুটকেশের ওপর এই দেখুন আমাব নাম পেণ্ট কবা—S. P. Sanyal. আমার দুনিয়ায় কোন ছোট ভাইই নেই—আজ কিনা হঠাৎ আমি জ্যাঠামশায় হয়ে গেলুম। সহযাত্রিদেব দিকে চেয়ে আবাব তিনি হাঁক পাড়লেন—এ ছেলে কাব সঙ্গে এসেছে?

কাব সঙ্গে আবাব আসবে। সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো—এ গাড়ীতে কেউ এর অভিভাবক নেই মশাই।

চেকার মিনুর মুখের সামনে হাত নেড়ে ফেব গর্জ্জন কবে উঠলো, বলো, তোমাব টিকিট কোথায়?

ততক্ষণ মিনুব চোখে জল এসে গেছে। লোকগুলি কি নিষ্ঠুর—অসহায় একটি ছেলেব বিপদে কেউ এগিয়ে বুক দিয়ে সাহায্য করতে আসছে না? কয়েকটা তো মোটে টাকা—সে বড়ো হয়ে নিশ্চয় সেই ঋণ শোধ করে দিতো। এতোটুকু কারু মায়া নেই। মিনু উঠে দাঁড়িয়ে কোনের আবেকটী ভদ্রলোককে লক্ষ্য করে বল্‌লে—আপনি আমার টিকিটটা দয়া করে কিনে দিন না। আপনি যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে আমিও না হয় যাবো।

ও বাবা? কী সর্ব্বনাশ? সেই কোনের ভদ্রলোক তড়াক্ কবে লাফিয়ে উঠলেন, কেন, আমি কেন তোমার টিকিট কাটতে যাবো? আমি কী দোষ কবলাম। জ্যাঠামশাই ছেড়ে এবার মামা পাকড়ালে নাকি?

চেকার চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠলো,—এ তো দেখছি ভারি দুদে ছেলে।

ভদ্রলোক দু'জন সমস্বরে চীৎকার করে উঠলেন,—জোচ্চোর, জোচ্চোব—এইটুকু বয়স থেকেই জোচ্চুরিতে পাকাচ্ছে। ভীষণ ধড়িবাজ, পাকা পকেটমার!

চেকার ফের হুঙ্কার দিলো—শিগ্‌গির তোমাব লোক দেখিয়ে দাও, নইলে এখানেই নামিয়ে দেব বল্‌ছি।

বাহাদুরী

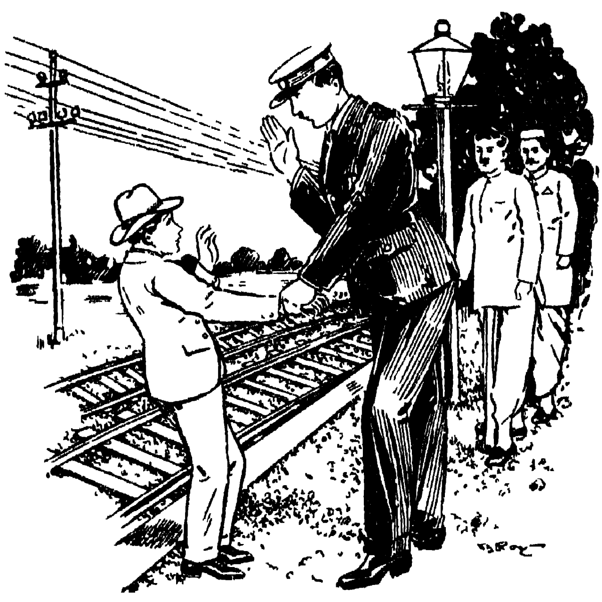
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ততক্ষণে মিনুর কান্না এসে গেছে; ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বল্‌লে,—এদের ভেতর থেকে কেউ রাজি না হলে আমি লোক পাবো কোত্থেকে? আচ্ছা, দাঁড়ান্‌—একটা কথা মনে হতেই মিনুর মনে সাহস এলো, বল্‌লে—আমার সঙ্গে আসুন দেখি অন্য কামরায় লোক পাই কি না। বলে' সে সুড়ুৎ করে দরজা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লো।

পালালো, পালালো, ধর ঐ প্যাণ্টালুন-পরা ছোঁড়াকে, বিনা-টিকিটে ট্র্যাভেল করছিলো, ধর্‌ ধর্‌ ওকে। বলে চেকার তাকে তাড়া করলে।

মিনু মোটেই পালাচ্ছিল না, সত্যিই সে প্ল্যাটফর্ম ধরে দৌড়ে গাড়ীতে চেনা লোক খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, হটাৎ পেছনে একটা সোরগোল শুনে চমকে সে চেয়ে দেখলো ট্রেন চলতে সুরু করেছে।

ভয়-পাওয়া খরগোসের মত মিনু ভাসা-ভাসা চোখে ট্রেনের চলে যাওয়ার দিকে চেয়ে রইলো। ততক্ষণে চেকার তার ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরেছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সে বল্‌লে, —এইটুকু বয়সেই যে পেকে একেবারে ঝুনো হ'য়ে গেছ দেখ্‌ছি। স্যুট পরে ভেবেছ আমার চোখে ধূলো দেবে। এখুনি পুলিশে হ্যাণ্ড্‌-ওভার করে দিচ্ছি—পঁচিশ ঘা বেত তো হোক্‌।



দেখতে দেখতে তাদের ঘিরে ভিড় দাঁড়িয়ে গেলো। মিনু ভাঙা-গলায় বল্‌লে, আর কতক্ষণ গাড়ি দাঁড় করালেন না কেন, আমি ঠিক টিকিটের পয়সা এনে দিতুম।

বাহাদুরী

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পয়সা এনে দিতে! পয়সা তোমাকে দেওয়াচ্ছি। চেকার তাকে হিঁচড়ে টানতে লাগলো। মিন্নু বললে,—বা রে, হাত ছাড়ো। লাগে না আমার?

—জোচ্চুরি করে রেল-কোম্পানিকে ঠকিয়ে পিট্‌টান দিচ্ছিলে—তার আবার লাগবে কি শুনি? না, চলে না, তোমাকে কোলে বসিয়ে দুধ ভাত খাওয়াচ্ছি। বলে চেকার তার মাথা বাড়িয়ে বিশাল একটা চড় মারলো।

মুহূর্তে প্রকাণ্ড একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেলো। চড় খেয়ে মিন্নুর মাথার টুপিটা রুমাল-সুদ্ধ ছিট্‌কে উড়ে পড়লো, আর অমনি তার স্তূপীকৃত চুল পিঠে-বুকে দু কাঁধে গুচ্ছ-গুচ্ছ হয়ে জড়িয়ে গেলো। টুপি-মাথায় তাকে খানিকটা ঢ্যাঙা দেখাচ্ছিলো, মুখটা দেখাচ্ছিলো খানিক চোয়াড়ে- এখন সে হটাৎ অনেক ছোট হয়ে গেছে, মুখখানি একেবারে সদ্য-ফোটা জুইয়ের মতো সুকুমার। কান্না লেগে সে মুখখানি ভোর-বেলাকার বিষণ্ণ তারাটির চেয়েও করুণ দেখাচ্ছে।

সমবেত সবাই বিস্ময়ে শব্দ করে উঠলো,- এ কী! এ যে দেখছি মেয়ে। ছোট্ট একটি খুকি? এই ছদ্মবেশে ও এলো কোত্থেকে?

তারপর তার ওপর সুরু হ'লো যতো প্রশ্ন, অতল সান্ত্বনা, অঢেল আদর।

—কিচ্ছু তোমার ভয় নেই, খুকি। আমি থাকতে কেউ তোমাকে আর কিচ্ছু বল্‌তে পারে না। তোমাকে আমি ছেড়ে দেব, তোমার আবার টিকিট লাগবে না-হাতি! পুলিসের সাধ্য কি তোমার গায়ে হাত তোলে? তুমি বলো, কোত্থেকে তুমি এলে—কেন এলে—কার সঙ্গে এলে? কান্না কিসের? আমি তোমাকে ঠিক বাড়ী পৌঁছে দেব, চলো আমার সঙ্গে ঐ রিফ্রেসমেন্ট্ রুমে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না? খেতে-খেতে আমাকে সব বল্‌বে, কেমন? চেকার স্নেহে গলে গিয়ে মিন্নুকে অফুরন্ত আদর করতে লাগলো। এবং মিন্নু তার এই জীবনের নতুন উপন্যাসটুকু তার কাছে আগাগোড়া বিবৃত করলে।

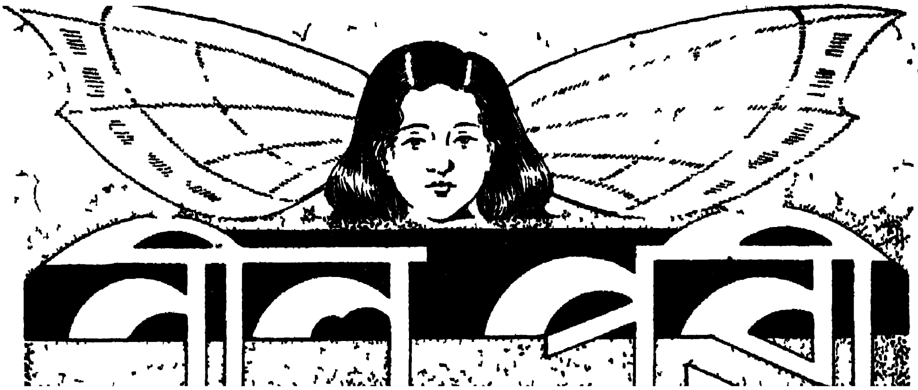
তারপরের ব্যাপারটা খুবই সোজা। ফিরতি-ট্রেণে চেকার নিজে মিন্নুকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হ'লো—তাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে। কী মজা, এবারো তার পয়সা লাগবে না। বাড়ী ফিরে যেতে মিন্নুর আর এখন দুঃখ নাই! সে বুঝেছে, পৃথিবীতে মেয়ে হওয়ারো সুবিধা কিছু কম নয়। ভাগ্যিস মেয়ে হয়েছিলো বলেই সে এমন শুভে-

লাভে বাড়ি ফিরতে পাচ্ছে, তার বদলে দাদা এলে তাকে এতক্ষণ সটান থানায় গিয়ে পচতে হ'তো।

থাকো তোমরা বাড়ির লোক সমস্ত রাত জেগে, কাল সকালের আগে মিন্নুর তোমরা দেখা পাচ্ছ না। কাল বুঝবে মিন্নুকে ফিরে পাওয়ার দাম, কাল ভুলবে টুপি আর প্যান্টালুনের শোক। তোমরা রাত ভ'রে জাগো আর কাঁদো,—মিন্নু দিব্যি সেকেণ্ড-ক্লাসে ষ্টেশনের দিক্‌কার লোয়ার-বার্থে শুয়ে আরো বড়ো হবার বৃহত্তর স্বপ্ন দেখুক। *

* শ্রীযুত তারকদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে। সঃ।





শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

সমস্ত পরীরাজ্যের ভেতর পুষ্পলার মত দুরন্ত ও চঞ্চলা পরী আর দু'টী ছিল না,—তার স্বভাব যেমন একগুঁয়ে বায়নাও তেমনি বিদকুটে, তাকে নিয়ে তার বাপ-মা একেবারে জ্বালাতন হ'য়ে উঠেছিল।

যেদিন সে জন্মাল, পরীরাজ্য-জুড়ে সে কি উৎসব—ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে উঠ্‌ল, হুলুধ্বনি হ'ল, বাড়ীতে বাড়ীতে লাল পতাকা উড়ল, আর চারিদিকে ফুলের ছড়াছড়ি, দিক্‌বিদিক্‌ থেকে পরীরা হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে ছুটে এলো তাকে একবার দেখবার জন্য। রাজার মেয়ে হ'য়েছে, এতো আর কম কথা নয়।

ফুলের উপর তার ফুলের মত দেহটা শোয়ানো রয়েছে, দেখে সবাই খুশী হ'ল,—যেন পদ্মের একটা কলি। কি রঙ, কি সুন্দর দেখ্‌তে, কচি তুল্‌তুলে নিখুঁত মুখখানি, ছোট ছোট হাত-পাগুলি, পিঠের দু'পাশ দিয়ে পাত্‌লা ফিন্‌ফিনে রেশমের মত দু'খানা পাখা-যে কি সুন্দর দেখতে, আর কেমন মানিয়েছে তা বলবার নয়—যে দেখে সেই গালে হাত দেয়, এ যেন 'রাজকন্যা ত' রাজকন্যা', যেন কাঁচা সোনার একটা পুতুল—দূর থেকে দেখলে মনে হয়,—যেন নীলসাগরের তল থেকে কে একটা মুক্তোর দানা এনে রেখে গেছে!

মেয়ে পেয়ে রাজরাণী আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেল—ধন-ভাণ্ডার খুলে দিলে, মাসের পর মাস ধ'রে উৎসবের আয়োজন করলে, তারপর অনেক ভেবে, অনেক পরামর্শ ক'রে তার নাম রাখ্‌লে—পুষ্পলা।

১৯

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

তার পুষ্পের মত দেহ, ফোটা-ফুলের মত হাসি তার মুখের ওপর লেগেই রয়েছে। অতএব পুষ্পলা নাম তার বেমানান হ'ল না, কিন্তু হ'লে কি হয়, তার মন-ভোলান রূপ—প্রাণ-মাতান হাসি, সবই সত্য, কিন্তু তবু তাকে নিয়ে তার বাপ-মাকে যা নাকাল হ'তে হ'য়েছে সে কথা মনে হ'লে এখনও গা শিউরে ওঠে!

পুষ্পলা যত বড় হ'তে লাগল, ততই সে এমন অবাধ্য আর এমন দুরন্ত হ'তে লাগল যে সে কথা বলবার নয়, তার মা হয়ত ডাকলে, পুষ্পলা এদিকে আয়,—পুষ্পলা এদিকে আয়,—পুষ্পলা ওদিক থেকে জবাব দিলে, আমি এখন যাব না। তার বাপ হয়ত ডাকলে, পুষ্পলা প'ড়তে এস, কিন্তু কোথায় পুষ্পলা, সে হয়ত তখন কোন একখানা শাদা মেঘের ওপর চড়ে আকাশের ওপব ঘুরে বেড়াচ্ছে, নতুবা হয়ত পর্ব্বতের সব চেয়ে উঁচু চুড়োটায়—যেখানে বরফ জমে-জমে রূপোর পাতের মত হ'য়ে রয়েছে তার ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে—একবার পা পিছ্‌লে গেলে কি রক্ষে আছে,—কোথায় গিয়ে পড়বে, সে তার হুঁস নাই,—নয়ত বলা নেই কওয়া নেই, কারও ফুল-বাগানে ঢুকে গাঁদা, দোপাটী থেকে আরম্ভ ক'রে যত রকম ফুল আছে, সব দু'হাত দিয়ে ছিঁড়্‌ছে। ফুটন্ত গোলাপের ওপর চলে বেড়াতে তার ভারি আমোদ হয়,—কিন্তু তাতে যে দলগুলো খ'সে যায়—আর ফুলগুলো দেখতে বিশ্রী হ'য়ে যায়, এ তাকে হাজার বার ক'রে বল্‌লেও শুন্‌বে না।

তাকে নিয়ে মহামুস্কিল হ'তে লাগল, সমস্ত পরীরাজ্যের ভেতর ভারি একটা চাঞ্চল্যের সাড়া জেগে উঠল, রাজার মেয়ে লেখাপড়া শিখ্‌বে না এ হ'তেই পারে না—মন্ত্রী, পরিষদ, বুড়ো বুড়ো পরী যারা ছিল তারা রাজা-রাণীকে বাছা বাছা উপদেশ দিতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ফল হ'ল না, পুষ্পলা কারো কথা শোনেও না কাউকে গ্রাহ্যও করে না। রাজা-রাণী হাজার জেদ ক'রে, হাজার মিষ্ট কথা ব'লে তাকে লেখাপড়ায় মন দেওয়াতে পার্‌লে না।—কেউ কেউ মনে করতে পারে যে, পরীদের নাকি আবার লেখাপড়া শিখতে হয়! কিন্তু সত্যই হয়। স্বর্গরাজ্যই হ'ক আর মর্ত্তরাজ্যই হ'ক আর পরীরাজ্যই হ'ক লেখাপড়া না শিখলে চলবার উপায় নেই, তবে লেখাপড়া না শিখ্‌লে যে মোটেই শেখা যায় না, এমন নয়,—আমাদের ছেলেমেয়েরা যেমন বই না-পড়েও যা হ'ক্ কিছু শেখে,—কিন্তু তাতে ত' আর সত্যিকারের পাকা জ্ঞান হয় না,—সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে হ'লে,—ভাল ক'রে মনোযোগ দিয়ে প'ড়্‌তে হয়,—কি ক'রে শিখ্‌ব এ-কথাটা

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

মনে রাখতে হয়। তবে স্বর্গরাজ্যের খোকা-খুকুদের লেখাপড়ার সঙ্গে আমাদের খোকা-খুকুদের লেখাপড়া এক না হ'তে পারে, তারা হয়ত অন্য রকম পড়ে, আমরা অন্য রকম পড়ি—পরীদের যা লেখাপড়া তা আমাদের সঙ্গে মেলে না,—তারা যা শেখে, আমাদের ভাষায় আমরা তাকে বলি যাদুবিদ্যা।

কিন্তু থাক সে কথা—তারপর ব্যাপার হ'ল কি, তাড়না ক'রে, শাসন ক'রেও কোন রকমেই রাজা তাকে বশে আনতে পারলে না। কাজেই বাধ্য হ'য়ে তাকে রাজ্য থেকে বার ক'রে দিতে হ'লো। পুষ্পলা দুরন্ত হ'ক্, অবাধ্য হ'ক্, কিন্তু তার বাপ-মাকে সত্যই সে অত্যন্ত ভালবাসত, তাই তার এমন অভিমান হ'ল যে বলবার নয়, সে ঝর্ ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে, আচ্ছা আমি এক্ষুণি চলে যাব—এবং সত্যই তক্ষুণি সে বেরিয়ে প'ড়ল।

রাজরাণী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে নীচের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছোট নীল বর্ণের পাখা দু'টোর ওপর ভর দিয়ে, সাদা কালো মেঘের উপর মেঘ পার হ'য়ে, আকাশের ভেতর দিয়ে পুষ্পলা উড়ে চলেছে।

পুষ্পলা যে স্থানটায় এসে নাব্‌ল, সে স্থানটার নাম হ'ল বসন্ত-নগর—পৃথিবীর সব-চেয়ে পরীরাজ্যের কাছাকাছি আর একটা রাজার রাজ্য। সেখানকার মানুষগুলো যেমন সুন্দর, সে দেশটাও দেখ্‌তে তেমনি সুন্দর, তার ওপর এর আগে সে আর কখন পৃথিবী দেখেনি, কাজেই সে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেল। সে আপন মনে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল, বেড়ার গায়ে আঙ্গুরের গাছগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে—তাতে থলো-থলো আঙ্গুর ঝুলে রয়েছে, খেজুর গাছের তলায় পাকা-পাকা খেজুর প'ড়ে একেবারে বিছিয়ে রয়েছে, আর সে সব খেজুর এত বড় এবং খেতে এমন সুন্দর যে বল্‌বার নয়, ছোট-ছোট কুল-গাছ বড়-বড় পাকা কুলে একেবারে আলো হ'য়ে রয়েছে; সে প্রাণ ভ'রে আঙ্গুর খেলে, খেজুর খেলে, কুল খেলে, তারপর নিকটের একটা ঝরণা থেকে খানিকটা জল খেয়ে, এক জায়গায় চুপ ক'রে ব'সে থাকল।

কিন্তু ভাল লাগ্‌লে কি হয়, যত বেলা প'ড়্‌তে লাগ্‌ল, ততই তার ভয় হ'তে লাগ্‌ল, কোথায় সে যায়—একটা থাক্‌বার জায়গা ত' চাই—রাজার মেয়ে সে, সে ত' আর কখন

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

বন্‌-বাদারের গাছের তলায় বা মাঠের ওপরে পড়ে থাকেনি—একটা প্রকাণ্ড মোষ বড় বড় ছু'টো শিং নেড়ে তার পাশ দিয়ে চ'লে গেল, সে একেবারে ভয়ে আঁতকে উঠ্‌ল, রাস্তা দিয়ে চল্‌বার সময় একটা প্রকাণ্ড কোলা-ব্যাঙ্‌ প্রজাপতি মনে করে হাঁ করে তাকে ধ'র্‌তে এল—সে ভয়ে পালিয়ে গেল, একেত' পরীরা মানুষদের চেয়ে আকারে অনেক ছোট, তার ওপর পুষ্পলা একেবারে ছেলেমানুষ, অতএব তাকে প্রজাপতি মনে করা ব্যাঙ্‌টার কিছুমাত্র অসম্ভব হয়নি।

রাস্তা দিয়ে চল্‌তে চল্‌তে সে দেখ্‌তে পেলে সুমুখে নগরের রাজ-বাটী। সে মনে মনে ভাব্‌লে বেশ হ'য়েছে, একবার কোন রকমে রাজবাড়ীতে ঢুক্‌তে পারা চাই। কিন্তু ওরে বাবা, সেখানে ঢোকা যাবে কি ক'রে, চারিদিকে দ্বারী পাহারা হাতে বন্দুক, পিস্তল। দোরের ছ্'পাশে যে ছু'জন দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে খোলা তরওয়াল বন বন ক'রে ঘুরাচ্ছে একবার গলাটায় ছুঁইয়ে দিলে শুধু ক্যাচ্‌ ক'রে যা একটা শব্দ হবে—তার পর বাস।



সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে কি করা যায়—হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো, যদি কোন-রকম ক'রে একবার রাজকুমারী হওয়া যায়, তাহলে রাজ-বাড়ীতে ঢুক্‌তে আর কেউ তাকে বাধা দেবে না এবং তা'হলে স্বচ্ছন্দে সে রাজার কাছে তার মনের কথা ব'লে, সেথা যে কোন একটা কাজ ক'র্‌তে পারে এবং থাক্‌তেও পায়,—হাঁ, ঠিক হ'য়েছে—সে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল, তা'হলে সে রাজাকে ব'ল্‌বে যে তাকে যেন রাজ-সভার যাদুকর করে। এই

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে খুশীতে তার মন ভ'রে গেল। কিন্তু রাজকুমারী হওয়া যায় কি ক'রে--তা'তো আর ''র জানা নেই, তার মনে মনে দুঃখ হ'তে লাগ্‌ল, কেন সে লেখা-পড়া শিখ্‌ল না তারপর যে কটা যাদু সে জান্‌ত মনে মনে সেইগুলোকে ভেবে তার ভেতর একটাকে বেছে নিয়ে যেই একবার পরখ্‌ ক'রবার জন্যে সে মুখে ব'ল্‌লে,- কি আশ্চর্য্য। রাজকুমারী হওয়া ত' দূরের কথা,—নিমিষের মধ্যে সে (কাল বেড়াল হ'য়ে গেল।

আর করা যাবে কি, বেড়াল হ'য়েই সে রাজবাড়ীতে ঢুকে প'ড়ল, তারপর এ-ঘর ঘর পার হ'য়ে সে খুঁজে বেড়াতে লাগ্‌ল কোথায় রাজা আছে। অবশেষে সে দেখ্‌তে পেলে একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরের ভেতর পালঙ্কের ওপর রাজা-রাণী ব'সে গল্প ক'রছে। সে আস্তে আস্তে সেখানে এসে হাজির হ'ল।

রাজামশাই বেড়াল কোনদিনই দেখ্‌তে পারত না, দেখ্‌লেই দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত -তাকে দেখেও কি ব'লতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাণী আগে কথা কইলে,—কাল বেড়াল পেলে রাণীর ভারি আনন্দ হ'ত, ব'ল্‌লে, বাঃ। বেশ একটা কাল পুষী বেড়াল '। আমি ওটাকে পুষ্‌ব। কাজেই রাজা আর কিছু ব'ল্‌তে পারলে না।

ও-দিকে পুষ্পলা যে বেড়াল হ'য়ে গেছে, এ-কথা তার মনেই নেই। সে একটু ভেবে ব'ল্‌লে, রাজামশাই,—আমাকে তোমার রাজসভার যাদুকর কর। কিন্তু সে ত' আর তখন পরী নয়, আর মানুষও নয় যে তার কথা রাজারাণী শুন্‌তে পাবে - তার মুখ থেকে শুধু বার হ'ল, মিউ- মিউ -মিউ—। রাণী একেবারে ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—চেঁচিয়ে ব'ল্‌লে দাসী, দাসী, শীঘ্র একবাটী দুধ আন্‌ আর খানিকটা মাছ আন, বেড়ালটার খিদে পেয়েছে।

মাছ আর দুধ ঐ দু'টো জিনিষকেই পুষ্পলা মনে মনে ভারি ঘৃণা করত, তার বাড়ীর কথা মনে প'ড্‌ল, এই জন্যে কত দিন যে তার বাপ মার কাছে বকুনি খেয়েছে, কত দিন এই খাবার ভয়ে সে পাহাড়ের ওপর লুকিয়ে কাটিয়েছে, মেঘের ওপর বসে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, করা যায় কি, বেড়াল হ'য়ে থাক্‌লে নিশ্চয় তারা জোর ক'রে দুধ আর মাছ খাইয়ে তবে ছাড়্‌বে,—সে আর একবার তার

আহরিকা

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

যাদুর কথা ভাব্‌তে লাগ্‌ল, তারপর যেই আর একটা যাদু বললে, অমনি সে আবার পূর্ব্বেরই মত পরী হ'য়ে গেল। রাজা-রাণী একেবারে অবাক হ'য়ে গেল, রাজা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, তুই কে?

পুষ্পলা হাত-জোড় ক'রে ব'ল্‌লে, রাজা মশাই, আমি সত্যই বেড়াল নই, আমাকে মাপ কর, আর দয়া ক'রে আমাকে তোমার রাজসভার যাদুকর কর।

তাকে দেখে রাণী ভারি খুশী হ'ল, বল্‌লে, আহা, বেশ মেয়েটী, ওকে আমরা রাখ্‌ব,—তুমি ওকে রাজসভার যাদুকর ক'রে দাও।—

রাজা ঘাড় নাড়্‌লে, বললে, না তা হয় না, আমাদের যাদুকর আছে আর সে খুব পুরোনো লোক, তাকে তাড়ানো যায় না—

পুষ্পলা তক্ষুণি ব'ল্‌লে, কিন্তু আমি তার চেয়ে ভাল যাদু জানি। রাণী ব'ল্‌লে, তবে এক কাজ কর, তোমার যাদুকরকে নিয়ে এস, একদিন এর সঙ্গে যাদুর লড়াই হ'ক্, তারপর যে জিত্‌বে সেই রাজসভার যাদুকর হবে, আর যে হার্‌বে তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দাও।

হ'লও তাই। রাজবাড়ীর সাম্‌নে যে প্রকাণ্ড মাঠটা প'ড়ে আছে সেখানে যাদুর লড়ায়েয় ব্যবস্থা হ'ল--চারিদিক থেকে লোক কাতারে কাতারে যাদুর লড়াই দেখ্‌তে এলো। একদিকে পুষ্পলা দাঁড়াল আর একদিকে দাঁড়াল সেই পুরানো যাদুকর।—কিন্তু এই লোকটা ভাল যাদু জান্‌ত না,—সেখানে ত' আর কেউ যাদু জানে না, তাই এক রকম ক'রে চলে যাচ্ছিল, তা ছাড়া অনেক লোক তার ওপরে ভারি চটা ছিল, তারা মনে মনে প্রার্থনা ক'রতে লাগল যেন পুষ্পলার জয় হয়।

লড়াই আরাম্ভ হল'। যাদুকর তার হাতের রুমাল নেড়ে যেই যাদু বলা,—আর অমনি কোথা থেকে রূপোর পাতের মত অসংখ্য মাছ দেয়ালের গায়ে, জান্‌লায়, দুয়ারের গায়ে এসে লেগে থাক্‌ল। সকলে একেবারে অবাক হ'য়ে গেল, তার দলের লোকরা জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল।

এইবার পুষ্পলার পালা, তাকে এমন যাদু ব'ল্‌তে হ'বে যে, মাছগুলো অমনি

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

অদৃশ্য হ'য়ে যাবে,—সে অনেক ভেবে—একটা যাদু ব'ল্‌লে, কিন্তু আশ্চর্য্য।—মাছগুলো অদৃশ্য হওয়া দূরে থাক—সেগুলো ঠিক পাখীর মত হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগ্‌ল। দেখে সবাই খুব জোরে জোরে হাততালি দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগ্‌ল, ঠিক হ'য়েছে। রাজা-রাণীও ব্যাপার দেখে ভারি খুশী হ'য়েছিল, তখনি প্রমাণ হ'য়ে গেল যে পুষ্পলা ঐ যাদুকরের চেয়ে অনেক ভাল যাদু জানে।- রাজা হুকুম দিলে, এক্ষুণি ঐ যাদুকরকে দেশ থেকে বার ক'রে দেওয়া হ'ক। তারপর পুষ্পলা হ'য়ে গেল রাজসভার যাদুকর। পুষ্পলা খায় দায় আর বেড়ায়, বিশেষ তাকে কিছু কর্‌তে হয় না, মাঝে মাঝে রাজ-সভায় গিয়ে বসা- আর বেড়িয়ে বেড়ান'। সে আগেকার মত আর আকাশের ওপর ঘুরে বেড়াতে পারে না,—পাহাড়ের ওপর উঠ্‌তে পায় না,- ফুটন্ত গোলাপের ওপরও আর চল্‌তে পায় না, তার খালি বাড়ীর কথা মনে পড়ে,—কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে যে তার বাপ মায়ের জন্য কেঁদেছে!



ক্রমে এমন হ'ল যে কিছুতেই তার মন টেঁকে না, কিছু একটা করবার জন্য সে ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌ল। আগেই ব'লেছি পুষ্পলা ভারি চঞ্চলা, একটা কাজ যে মন দিয়ে ক'র্‌বে, তা তার দ্বারা হবার উপায় নেই,—সে ভাব্‌তে লাগ্‌ল কি করা যায়—রাজার মেয়ে সে, কোথায় স্ফুর্ত্তি ক'রে খাবে-দাবে, আমোদ ক'রে বেড়াবে, না দাসী বাঁদীর মত চাকরী ক'র্‌তে হ'চ্ছে—তার মনে মনে ভারি দুঃখ হ'তে লাগ্‌ল। শেষে অনেক ভেবে

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর হাইত

ভেবে ঠিক ক'র্‌লে যে, রাজকুমারকে যদি বিয়ে করা যায়, তবে ঠিক হয়; তারপর রাজারাণী যখন মারা যাবে তখন সে এই দেশের রাণী হ'তে পার্‌বে।

কিন্তু রাজকুমারকে একথা বলা যায় কি ক'রে? রাজকুমার দেখ্‌তে অবশ্য খুব ভাল, পছন্দও তার হয়, কিন্তু হ'লে কি হবে,—তার এমন বেয়াড়া স্বভাব যে ব'ল্‌বার নয়,—সারাদিনটা হয়ত আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নয়ত আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছে, কারো সঙ্গে কথাও কয় না, এমন কি পুষ্পলা এতদিন রয়েছে তার সঙ্গে একদিনও একটা কথা কয় না।

ক'দিন খুঁজে খুঁজে শেষে একদিন একটা সুযোগ পেলে,—দ্যাখে যে রাজকুমার বাগানের ভেতর একটা গাছের মাথার দিকে চেয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। সে মনে ভাব্‌লে, বাঃ, এ ত' বেশ সুযোগ,—সে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল; রাজকুমার দেখতেও পেলে না, সে তেমনি করে চেয়েই আছে, কিন্তু হঠাৎ একটা কথা পুষ্পলার মনে পড়ে গেল, যদি রাজকুমার পরীকে বিয়ে না করতে চায়— তখন!—সে মনে মনে ভাবলে, না, পরী হয়ে কিছু বলা উচিত নয়, তার চেয়ে রাজকুমারী হ'য়ে বলাই ভাল, সে আর একবার রাজকুমারী হবার জন্য যাদু বললে, কিন্তু এবারও উল্টো ফল হ'ল, রাজকুমারী না হ'য়ে সে আবার কাল বেড়াল হ'য়ে গেল।

বাপের মত রাজকুমারও বেড়াল দেখ্‌তে পার্‌ত না,—হঠাৎ বেড়ালটার ওপর নজর পড়াতে রাগে তার গা জ্বলে উঠ্‌ল, পাশ থেকে একটা লাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বেড়ালটাকে তাড়া ক'র্‌লে।

পুষ্পলা তখন দে-ছুট্‌—ওরে বাপ্‌রে সে কি ছুট্‌!—বন-বাদাড় ভেঙ্গে, নালা-খানা ডিঙিয়ে, পাঁচিল টপ্‌কিয়ে; ছ'বার সে বাঁশের কঞ্চিতে আট্‌কে গেল, একবার একটা গর্ত্তের ভেতর প'ড়ে গেল, কাঁটায় তার সারা গা ছোড়ে গেল, আর পায়ে যে কতগুলো কাঁকর ফুট্‌ল তা আর ব'ল্‌বার নয়। ছ'দিন সে গায়ের ব্যথায় ন'ড়্‌তে পারে না,—কিন্তু সেকথা কাউকে ব'ল্‌বার নয়!

কিন্তু দুঃখ কষ্ট ত' আর চিরকাল থাকে না,—পুষ্পলারই বা থাক্‌বে কেন? সেও একদিন মুক্তি পেয়ে গেল।

একদিন হ'ল কি, রাজা-মশায় রাজসভায় ব'সে আছেন, সেখানে এক পাল লোক,

নীল পরী

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়

মন্ত্রী, পরিষদ প্রজা, আম্‌লা, একেবারে রাজসভা গিস্‌-গিস্‌ করছে। হঠাৎ রাজার মাথা এমন কন্‌ কন্‌ ক'রতে লাগ্‌ল যে সে আর বস্‌তে পারে না।—দু'হাত দিয়ে মাথা ধ'রে একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। কেউ কেউ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, বদ্যি ডাক, বদ্যি ডাক। কিন্তু বদ্যি ত' আর এক্ষুণি ভাল ক'রে দিতে পার্‌বে না—তার ওষুধ খেলে হয়ত ভাল হ'তে কত দিন লাগ্‌বে। তাই রাণী ব'ল্‌লে, না, বদ্যি ডেকে কাজ নেই, তার চেয়ে যাদুকরকে ডেকে আন, সে এক্ষুণি ভাল ক'রে দেবে।

একজন গিয়ে পুষ্পলাকে ডেকে আন্‌লে। সে এসে ব্যাপার সব দেখ্‌লে, বল্‌লে, এক্ষুণি সব ভাল হ'য়ে যাবে।—কিন্তু কি ক'রে যে ভাল হবে সে ভেবেই পেলে না। তার ত' আর সব যাদু জানা নেই।—কিন্তু হ'লে কি হবে, ভাল তাকে ক'রতেই হবে, নতুবা তাকেও রাজা থেকে তাড়িয়ে দেবে। সে আস্তে আস্তে রাজার সমস্ত গায়ের ওপর হাত বুলিয়ে দিলে, তারপর ভেবে ভেবে যেমন একটা যাদু বলা, আর অমনি সে কি ব্যাপার!—শুধু পরবার একটুখানি কাপড় ছাড়া, রাজার গা থেকে সমস্ত কাপড়,—রাজপোষাক কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সে কি দৃশ্য! এক পাল লোকের মাঝখানে সিংহাসনের উপর রাজা একেবারে গা-খোলা! —রাণী ত' দু'হাত দিয়ে চোক ঢেকে ফেল্‌লে, চারিদিক থেকে সকলে হাঃ হাঃ ক'রে উঠ্‌ল, রাজা লজ্জায় একেবারে জড়সড় হ'য়ে গিয়ে সিংহাসনের তলায় গিয়ে লুকাল,—আর পুষ্পলা, একধারে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল।

রাজা সিংহাসনের তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে লাগ্‌ল—বাঁধ—বাঁধ—ওকে শীঘ্রই এক গাছা শেকল দিয়ে বেঁধে ফেল।

কিন্তু তখন এমন একটা ব্যাপার হ'য়ে গেল যে, পুষ্পলাকে কেউ বাঁধ্‌তে পার্‌লে না। হঠাৎ কেমন ক'রে চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। কিছুই দেখা যায় না—একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকগুলো পুষ্পলাকে ত' ধ'রতে পারলে না, মাঝে প'ড়ে তারা অন্ধকারের ভেতর ছুটোছুটি ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ পরে আলো হ'লো, তারা পুষ্পলাকে আর সেখানে দেখতে পেলে না। হঠাৎ ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে, আকাশের ভেতর দিয়ে তিন জন পরী শোঁ শোঁ ক'রে ওপর দিকে উড়ে চ'লেছে।

আহেরিকা

লাল পরী





জীব ও রূপনারায়ণ-

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

জীব গোস্বামী ছিলেন রূপ ও সনাতনের সহোদর অনুপমের পুত্র। জীব অতি সুদর্শন ছিলেন, তাঁহার পিতৃব্যেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা চৈতন্যের পাগল—এই সমস্ত কথা বাল্যে যখন তাঁহার মা-র বলিতেন, তখন বালকের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িত। অল্প বয়সে তিনি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু ভক্তির আকর্ষণে তিনি একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। এই সংসার তাঁহার নিকট অল্প বয়সেই অসার মনে হইত। পিতৃব্যদের পরিত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য, বৈষয়িক লোকের তাঁহার অতুল্য রূপ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—এসকালের আকর্ষণ তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। যাঁহাকে চৈতন্য আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কে রোধ করিবে? একদিন ষোড়শ-বর্ষীয় বালক জীব মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া?"

মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাস লইবার পদ্ধতি বলিতে লাগিলেন, কারণ—শুধু তাঁহার স্বামীর ভ্রাতারা নহেন, তাঁহার স্বামীও মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে সন্ন্যাসদশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাধুজনের মত কিরূপে দীক্ষা লইতে হয়, কিরূপে গৈরিক বস্ত্র পরিতে ও দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়—এই সকল কথাই বলিলেন।

বালক বলিল, "আমার পিতৃব্যেরা অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাস লইয়া জঙ্গলের বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ও তথাকার কন্দমূল ফল খাইয়া কিরূপে থাকেন?"

জীব ও রূপনারায়ণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

মাতা বলিলেন, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ও শ্রীচৈতন্যের প্রতি ভালবাসার দরুণ তাঁহারা দৈহিক কষ্টকে কষ্টের মধ্যেই গণ্য করেন না।"

পরদিন জীব দণ্ড হস্তে গৈরিক পরিয়া মাতার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মা, আমায় কি সন্ন্যাসীর মত দেখায় না? এখন হইতে সকলে আমাকে প্রণাম করিবে—আমি একজন সাধু!"

সুন্দর বালককে গৈরিক বাসে বড়ই মানাইয়াছিল। মা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন সুন্দর চাচর কেশ মাথায় করিয়া কি কেহ সন্ন্যাসী হইতে পারে?" বালক ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা কাল দেখিবে।" পরদিন মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক-পরিহিত কিশোর জীব মাকে বলিল, "মা, প্রণাম, তোমার স্নেহের দুলালকে চিরদিনের জন্য বিদায় দাও। আমি ব্রাহ্মণ, আমার পিতা ও পিতৃব্যদের যে গতি আমারও তাহাই। আমি বিষয়-ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। মা, আমি চলিলাম, তোমার স্নেহের ছেলেটাকে আর দেখিতে পাইবে না।" জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতাকে প্রণাম করিল। বজ্রাহতের ন্যায় মাতা জ্ঞানহারা হইয়া রহিলেন।

রূপ-সনাতনের পরিবারবর্গ ফতেয়াবাদে বাস করিতেছিলেন, তথা হইতে জীব সন্ন্যাস লইয়া প্রথমতঃ নবদ্বীপে আসিলেন। তিনি শ্রীবাসের বাড়ীতে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনা চৈতন্যের পদরজে পবিত্র হইয়াছিল।

বালক সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই আঙ্গিনায় গড়াইয়া পড়িলেন। নবদ্বীপ হইতে যাইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট তিনি কয়েকবৎসর উপনিষদের শিক্ষালাভ করেন। পরে বৃন্দাবনে আসিয়া স্বীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অচিরে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইল। রূপ ও সনাতনের পরে বৈষ্ণব-সমাজে তেমন প্রতিষ্ঠা আর কাহারও হয় নাই। তিনি পচিশখানি সংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তি। এই পুস্তকগুলির মধ্যে 'ষট্‌সন্দর্ভ'ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উত্তরকালে জীব গোস্বামীই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র কর্ণধার ছিলেন। কোন পণ্ডিত বা সামাজিকের শাস্ত্রবিষয়ে দ্বিধা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা জীব-গোস্বামীর নিকট বৃন্দাবনে পত্র লিখিতেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই শিরোধার্য্য হইত।

জীব ও রূপনারায়ণ

আহরিকা

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

বৃন্দাবনে রূপ, সনাতন ও জীব যেভাবে জীবন যাপন করিতেন, একটি ঐতিহাসিক আখ্যায়িকার দ্বারা তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

একবার কামরূপের রাজধানী এগারসিন্দুরের নিকটবর্তী পাচাদিয় গ্রামে লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামক এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাহার সাধ্বী পত্নীর নাম কমলা দেবী। ইঁহাদের একমাত্র সুদর্শন পুত্র ছিলেন, রূপনারায়ণ। অল্প বয়সে তিনি লেখাপড়ায় অমনোযোগী ও দুরন্ত ছিলেন। সংশোধনের সমস্ত চেষ্টা বিফল হওয়াতে একদিন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পত্নীকে আদেশ করিলেন, বালককে অঙ্গার খাইতে দিতে। সাধ্বী কমলা দেবী স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া ভাতের থালার একপার্শ্বে একটুকরা কয়লা রাখিয়া তাহা পুত্রকে পরিবেশন করিলেন। কিন্তু রূপনারায়ণের দৃষ্টি সেই কয়লা-টুকুর দিকেই সর্ব্বাগ্রে পড়িল। মাতার নিকট প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া কারণ জানিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অন্নের থালা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। প্রথম একবর্গী নামক এক গ্রামের টোলে আসিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন, তারপর নবদ্বীপে আসিয়া [illegible] টোলে নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তথা হইতে অনুমান ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরীতে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত দেখা করেন, কিন্তু উদ্ধত যুবক ঠাকুরের স্নেহ প্রবল বন্যার পাশ কাটাইয়া কাশীতে আসিয়া সংস্কৃতশাস্ত্র আরও বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করেন। সর্ব্বশেষে রূপনারায়ণ বোম্বায়ের পুনা নগরীতে যাইয়া পাঠ সমাপ্তি-পূর্ব্বক 'ভারতী' উপাধি লাভ করেন।

তেজস্বী উদ্ধত যুবক এখন পণ্ডিত-শিরোমণি হইলেও তাহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "আমি দিগ্বিজয়ী, যদি কোন পণ্ডিতের গৌরব থাকে, তবে সেই গৌরব পরীক্ষা করিবার কষ্টিপাথর আমি। আমার সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হউন।"

বহু পণ্ডিতকে ঘায়েল করিয়া, একবোঝা জয়-পত্র সঙ্গে লইয়া তিনি বৃন্দাবনের দিকে ছুটিলেন, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন, রূপ ও সনাতনের মত পণ্ডিত তখন ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। দৈন্যের অবতার ভ্রাতৃদ্বয় রূপনারায়ণের গর্ব্বিত আক্রমণের উত্তরে বলিলেন, "ভাই, তুমি ভুল শুনিয়াছ, লোকে আমাদের সামান্য গুণ বাড়াইয়া তোমাকে বলিয়াছে।

আহেরিকা

জীব ও রূপনারায়ণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আমরা দীনহীন কৃষ্ণকৃপা-পিপাসু, তোমার মত পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।"

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিলেন, "সে হইলে ছাড়িব না। তর্কে না পার আমাকে জয়-পত্র লিখিয়া দাও।"

সদাশয়তার আতিশয্যে এবং বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও দৈন্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে তাঁহারা জয়-পত্র লিখিয়া দিলেন, কারণ বৈষ্ণবের নীতি 'অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।'

এই জয়পত্র হাতে করিয়া সরস্বতী মনে করিলেন, তিনি ভারতের বিদ্যারাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। কিন্তু কে যেন বলিল, বৃন্দাবনেই এই দুই ভ্রাতার এক পাণ্ডিত্যাভিমানী ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন। তিনিও বড় কম নহেন। রূপনারায়ণ অমনি যাইয়া জীব গোস্বামীর কুটীরে উপস্থিত। তাঁহার পিতৃব্যদ্বয়ের স্বাক্ষরিত জয়-পত্র দেখিয়া যুবক জীব গোস্বামী অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তখনি সরস্বতীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচদিন পর্য্যন্ত বিচারে সমকক্ষতা চলিল, কিন্তু ষষ্ঠ দিনে জীবের নিকট রূপনারায়ণ পরাস্ত হইলেন। সপ্তম দিনে উপনিষদ ও অদ্বৈতবাদের বিচার সমাধার পর জীব গোস্বামী ভক্তি-শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রূপনারায়ণের নিকট তাহা সম্পূর্ণ নূতন। সপ্তম দিনের ব্যাখ্যায় পাথর গলিয়া জল হইয়া গেল—অহঙ্কার ও দর্প রসাতলে গেল। অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া রূপনারায়ণ রূপসনাতনের নিকট যাইয়া তাহার অকৃত্রিম দৈন্য ও অনুতাপ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তারপর তিনি বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পক্কপল্লীর রাজা নৃসিংহের সভাপণ্ডিত এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। রূপনারায়ণ সঙ্গীত-শাস্ত্রেও কৃতী ছিলেন, রাজসভায় তাহারও আলোচনা চলিল।

এদিকে জীবকে রূপগোস্বামী বলিলেন, "তোমার বিচার-জয়ের প্রবৃত্তি এখনও দূর হয় নাই—তুমি বৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য নও, সর্ব্বতোভাবে অহঙ্কার বিলুপ্ত না হইলে বৃন্দাবন-বাসের যোগ্যতা হয় না, তুমি বৃন্দাবনের সীমানার মধ্যে থাকিতে পারিবে না।"

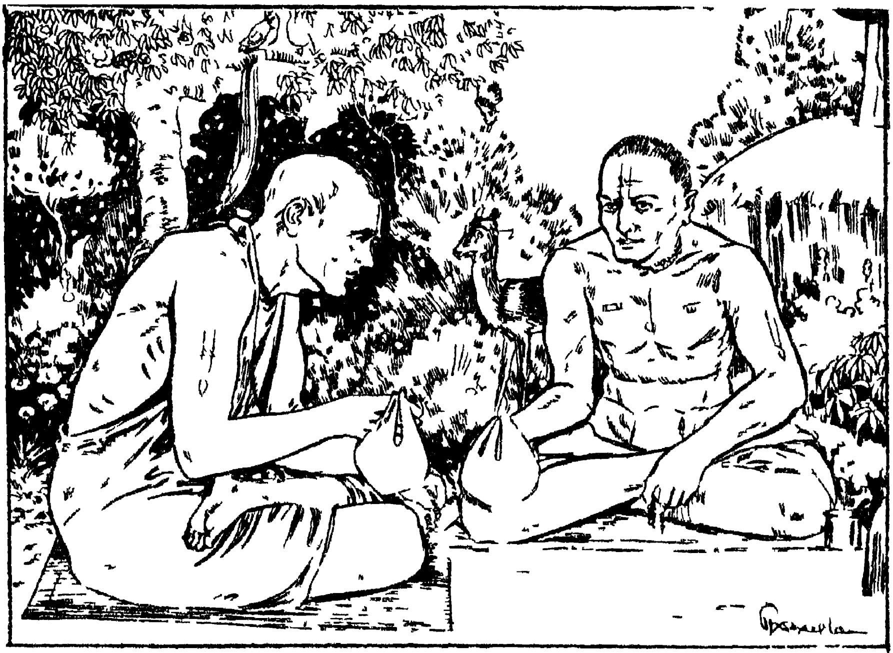
পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জীব বৃন্দাবন ছাড়িয়া যমুনা তীরে এক কুটীরে বাস করিয়া প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া একবৎসর কাটাইলেন।

জীব ও রূপনারায়ণ

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

একদিন সনাতন রূপকে বলিলেন, "বলত ভাই, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান গুণ কি?"

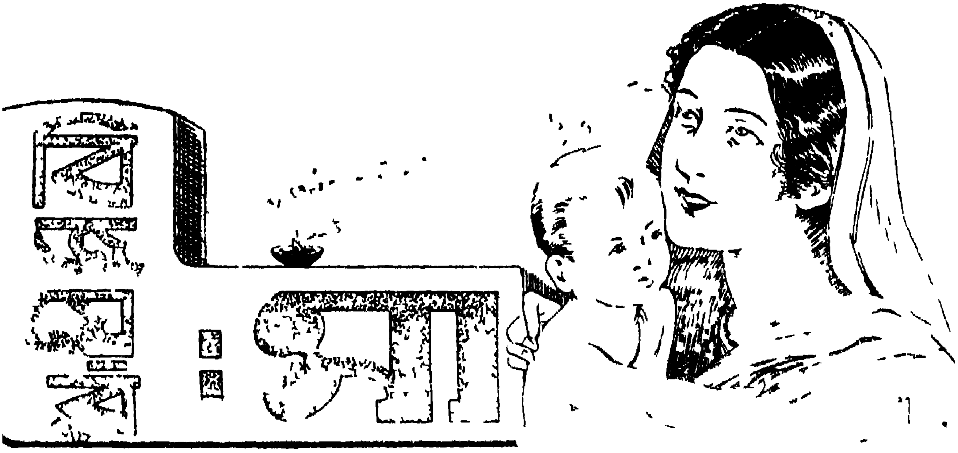
রূপ বলিলেন, "জীবে দয়া।"



সনাতন বলিলেন, "তবে তুমি জীবের প্রতি এত নিষ্ঠুর কেন?"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া রূপ জীব গোস্বামীকে বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আসিতে অনুমতি দিলেন।*

* [illegible] দীনেশবাবুর বৃহৎ বঙ্গ [illegible] পাণ্ডুলিপি হইতে এই কাহিনী গৃহীত হইয়াছে।



শ্রী তমাললতা বসু

প্রথম পত্নী বিয়োগের এক বৎসর পরে যখন যোগেন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী ষোড়শী শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করে বাড়ীতে এনেই তাঁর মাতৃহারা এক বৎসরের শিশু বিজয়কে তার হাতে সমর্পণ করে বললেন, "এই মাতৃহারা শিশুটিকে তোমার হাতে সমর্পণ করলুম, এ যেন একদিনও এর মার অভাব না জানতে পারে এই তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ।"

সেইদিন সেই শুভমুহূর্ত্তে শ্যামাসুন্দরী সেই সুন্দর ফুলের মত ছেলেটিকে বুকে তুলে নিয়ে এক অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করেছিলেন, আর সেইদিন থেকে তাকে মায়ের মত স্নেহ-যত্নে আদরে লালন পালন করে বড় করে তুলেছেন।

বিজয় শ্যামাসুন্দরীর আদরে একদিনও মার অভাব জানতে পারেনি। সে জানতো তিনিই তার নিজের মা। কেউ কোনদিন সে কথা তাকে বলেও-নি।

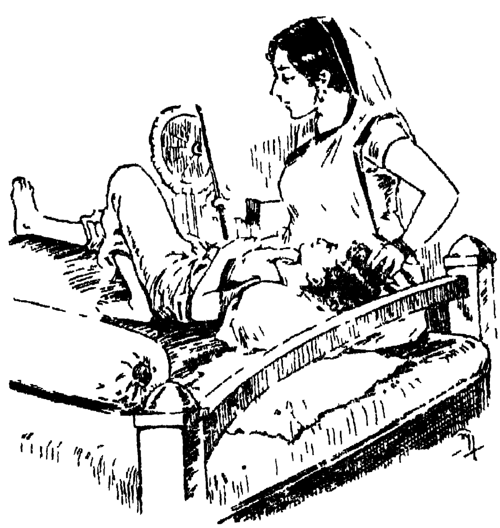
শ্যামাসুন্দরীর নিজেরও এতাবৎ কোন সন্তান সন্ততি জন্মলাভ করে নি, বিজয় যখন বারো বছরের ছেলে, তখন শ্যামাসুন্দরী বিনয়কে প্রসব করলেন।

তারপর বিনয় তখন ক্ষুদ্র শিশু। এমন সময় হঠাৎ বিজয় একদিন ভীষণ টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লো, শ্যামাসুন্দরী আহার নিদ্রা ভুলে তার

বিজয়ের মা

শ্রীকমলপ্রভা বসু

সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন, বিনয়কে দিনান্তে একবার দেখবারও অবকাশ ছিল না। সে সময়ে শ্যামাসুন্দরীর মা এসে মেয়ের বাড়ী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, "তোর সব বাড়াবাড়ি বাছা, এই কচি ছেলেটাকেও একবার দেখতে হয়--সব সময়েই রোগী নিয়ে ব্যস্ত থাকবি--"



শ্যামাসুন্দরী কাতরভাবে বলতো, "মাগো, বিনয়কে দেখবার তোমরা আছ, কিন্তু আমার বিজয়কে যে আমি ছাড়া দেখবার কেউ নেই মা।"

"সব তোর সৃষ্টিছাড়া কথা মা।" বলে মা চলে যেতেন।

যোগেনবাবু নার্স রাখবার কথা বললে, শ্যামাসুন্দরী ব্যাকুল হ'য়ে বলতেন, "না গো নার্স রাখতে হবে না, সে কি আমার চেয়ে আমার বিজুর যত্ন করতে পারবে--সে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না। ও-কথা আমায় আর বোলো না।"

অগত্যা যোগেন্দ্রনাথ বারম্বার সে কথা বলতে সাহস করতেন না। কারণ ডাক্তাররা বলেছিলেন যে, যদি আপনার ছেলে এ যাত্রা বাঁচে তবে শুধু আপনার স্ত্রীর সেবার গুণে। এর সেবার কাছে নার্সরাও হার মেনে যায়।

এমনি করে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেড়মাস পরে বিজয় যেদিন সুস্থ হ'য়ে পথ্য করলে সেদিন শ্যামাসুন্দরীর শুষ্ক মুখে হাসি ফুটে উঠলো, সেদিন তিনি উঠে নিয়মিত স্নান আহার করলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিলেন।

ক্রমে বিজয় বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো, সে ম্যাট্রিক পাশ করলে, এমনি সময়ে যোগেন্দ্রবাবু হঠাৎ ভীষণ জ্বরে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন। কিছুতেই যখন রোগ বাগ মানলে না, তিনি বুঝলেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না, তখন একদিন পাঁচজনকে ডেকে এনে তাঁর বিষয় সম্পত্তি জমীদারী যথা-সর্ব্বস্ব উইল করে শ্যামাসুন্দরীর নামে

আহরিকা

বিজয়ের মা

শান্তিমালতী বসু

লিখে দিলেন। পাঁচজনে আপত্তি জানালে, শ্যামাসুন্দরী বললেন, "এ হোতে পারে না—সব আমার নামে কেন?"

যোগেন্দ্রনাথ বললেন, "এই ঠিক হ'লো, না হ'লে ছেলেরা মানবে কেন? যে কাল পড়েছে—"

"বিজয়ের জন্যে অমন, আমার ভার উচিৎ।"

"তা ভেবেই এই কাজ করেছি,—লোক চেনবার ক্ষমতা আমার আছে। সেই বুঝেই যোগ্য হাতে আমি ভার দিয়ে যাচ্ছি জেনো।"

তারপর ক'দিন পরেই যোগেন্দ্রনাথ নাবালক ছেলে দুটিকে তাদের মায়ের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে, নিশ্চিন্তে চোখ বুজলেন।

তারপর যথাসময়ে আবার শ্যামাসুন্দরীকে নাবালক ছেলে দুটির মুখ চেয়ে বুক বেঁধে উঠে দাঁড়াতে হ'লো। তাদের দিয়ে যথাসময়ে খুব সমারোহে যোগেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ-কাজ করলেন।

ক্রমে ক্রমে শ্যামাসুন্দরীর স্নেহ ছায়ায় বিজয় লেখা পড়া করতে লাগলো, শেষে বিজয় এম, এ, পাশ হ'লে, শ্যামাসুন্দরী তার বিবাহের সম্বন্ধ করতে লাগলেন। এক জায়গায় বিবাহের কথাবার্ত্তা ঠিক হ'লে কন্যাপক্ষীয়েরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলে যে শ্যামাসুন্দরী বিজয়ের বিমাতা, আর তাঁরি নামে বিষয় সম্পত্তি সব।

তাঁরা বিবাহে আপত্তি ক'রে বললেন, "ছেলের তো কিছু নেই, কি ক'রে মেয়ে দিই— পরে কি হয় বলা যায় না তো?"

বিজয় সে কথা শুনে ছোট শিশুর মত ছুটে এসে স্নেহময়ী মাতা শ্যামাসুন্দরীকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললে, বললে, 'মা, ওরা বলে কিনা তুমি আমার সৎ-মা, আপন মা নও। ওদের মেয়ে এনোনা মা, এনো না।"

শ্যামাসুন্দরী হেসে সস্নেহে আঁচলে ছেলের চোখ মুছিয়ে বললেন, "আচ্ছা তাই হবে।" তারপর যত সম্বন্ধ আসে, ওই এক কথা সবার মুখে। শ্যামাসুন্দরী বিষয় লিখে দিতে চাইলেন। বিজয় বললে, "তা হ'লে আমি বিয়ে করবো না মা, তুমি আর সম্বন্ধ করো না।"

শেষে এক বড় লোকের সুন্দরী একমাত্র কন্যার সঙ্গে খুব সমারোহেই তার

বিজয়ের মা

আহেরিকা

শ্রীঅমলাপ্রভা বসু

বিবাহ হ'য়ে গেল। তারা কোন বিষয়ে কোন আপত্তি করলেন না। শ্যামাসুন্দরী মনমত বধু পেয়ে বুকে তুলে নিলেন, বধূও তাকে মায়ের মত ভক্তি যত্ন করতে লাগলো।

তারপর কিছুদিন এখানে আসবার পর তার বড়লোক পিতা কন্যাকে বেশীদিন পাড়াগাঁয়ে থাকার আপত্তি তুলে এখানে রাখলেন না—যদিও শ্রীরামপুর তেমন পাড়াগাঁ নয়। এর তার বিশেষ অনুরোধে বিজয়কেও কলকাতায় তার বাসা করে না পড়তে রাজী হ'তে হ'লো।

ফন্দীবাজ বড়লোক-শ্বশুর শেষে সরল-চিত্ত বিজয়কে এমন বশ ক'রে ফেললেন যে সেই মাতৃ-অনুগত সন্তান বিজয়ও আর কলকাতা ছেড়ে শ্রীরামপুরে যেতে চাইতো না। ক্রমে সে বি.এ. পাশ করে হাইকোর্টে প্রাকটিস করতে লাগলো।

শ্যামাসুন্দরী বিজয়ের এই ব্যবহারে একেবারে মুসড়ে পড়লেন। এধারে বিনয় ম্যাট্রিক পাশ করে আই-এ পড়তে পড়তে অসৎ-সঙ্গে মিশে বিগড়ে যেতে বসলো। শ্যামাসুন্দরী অকূল পাথারে পড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন, আর বিজয়কে চিঠি লিখলেন, কিন্তু চিঠি লিখেও কোন জবাব পেলেন না। শেষে একদিন ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হ'য়ে শ্যামাসুন্দরী হৃদরোগে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন। বিজয় একথা শুনলো তার একটি বাল্যবন্ধুর কাছে, তার বাড়ী শ্রীরামপুরে। সে এ সংবাদ পেয়েই পাগলের মত ছুটলো শ্রীরামপুরে, তার স্নেহময়ী মায়ের কাছে। মার অবস্থা দেখে সে কাঁদতে লাগলো তার মায়ের পায়ে ধরে,—"মাগো, আমায় ক্ষমা কর মা, অভিমান করে আমায় ছেড়ে চলে যেয়োনা মা, আর আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।"



শ্যামাসুন্দরী তৃপ্তির হাসি হেসে বিজয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, "ছি বাবা

বিজয়ের মা

শ্রীতমাললতা বসু

চুপ কর, তোমার ওপর কি রাগ করতে পারি। তুমি আমার ভগবানের ইচ্ছেয় মানুষ হ'য়েছ, কিন্তু বিনয় আমার তো মানুষ হোল না, সঙ্গ-দোষে যেতে বসেছে সে, তাকে দেখো। তুমি ছাড়া অভাগার যে আর কেউ রইল না।"

"দেখ্‌বো মা, দেখ্‌বো, আর কি আমি পথ ভুলি। ওরা সব তোমাদের নামে লাগিয়ে-ভাঙিয়ে আমার মন খারাপ করে দিয়েছিল মা, আর তুমিও চিঠি দিয়ে খোঁজ নিতে না বিয়ে দিয়ে পর করে দিলে ভেবে বড় অভিমান দুঃখু হ'য়েছিল মা, তাই আমিও অভিমান করে আসি নি, চিঠি দিই নি। এখন দেখ্‌ছি, তোমার চিঠি একখানিও আমায় দেয় নি। নইলে তোমার একখানা চিঠি পেলে যে আমি ছুটে চলে আসতুম মা, তা কি তুমি জান না?"

"জানি বৈকি বাবা, বিজু কি আমার তেমন ছেলে।"

শ্যামাসুন্দরী হাসলেন। পরদিন বিজয়ের শ্বশুর এলেন, বেহানকে দেখে কুশল-প্রশ্ন করলেন, মৌখিক "আহা উহু" করলেন, শেষে— 'শরীরের এই অবস্থা এখন কি হয়' ব'লে উইল করতে পীড়াপীড়ি লাগালেন। শ্যামাসুন্দরী আতঙ্কে হ'য়ে উঠলেন।

এমন সময় বিজয় এসে সব শুনে বিরক্ত হ'য়ে বল্লে, "কেন আমার মাকে বিরক্ত করছেন? উইল করাটাই কি বড় হ'লো—ওঁর প্রাণের দাম যে তার চাইতে ঢের বেশী।"

"এর পর টের পাবে হে বাবাজী,—উনি মরে গেলে পথে বসবে?" ব'লে তিনি রাগে গর্‌গর্ করতে করতে চলে গেলেন।

দিন কতক বিজয় ও তার বৌয়ের সেবা-যত্নের গুণে শ্যামাসুন্দরী বেশ ভাল হ'য়ে উঠলেন, কিন্তু আবার হঠাৎ পীড়া বৃদ্ধি পেয়ে তাঁর মৃত্যুকাল উপস্থিত হ'লো। তিনি বিজয়, বিনয়কে কাছে ডেকে মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন, বিনয়কে বললেন, "ভাল হ'য়ে সৎপথে থেকো, দাদার উপযুক্ত ভাই হ'য়ো। জেনো, দাদাই তোমার সব।" আর বিজয়ের হাতে বিনয়কে সঁপে দিয়ে বললেন, "বিজয়, বাবা, এই অবোধ শিশু বিনয়কে তোমার হাতে সম্পূর্ণভাবে দিয়ে গেলুম, একে দেখো, জেন, তুমি ছাড়া ওর কেউ ও কিছু রইল না। দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক। তোমরা তাঁর মুখোজ্জ্বল করো,

বিজয়ের মা

শ্রীতমাললতা বসু

এই তোমাদের মায়ের শেষ আশীর্ব্বাদ।" বলতে বলতে শ্যামাসুন্দরী চিরদিনের জন্যে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিজয় ও বিনয় মায়ের বুকে পড়ে হাহাকার করে কাঁদতে লাগলো। তারপর যথা-সময়ে শ্রাদ্ধ-শান্তি ফুরোলো। শ্যামাসুন্দরীর উকিল এসে উইল দেখালেন। উইল পাঠে জানা গেল যে, শ্যামাসুন্দরী তাঁর যথাসর্ব্বস্ব স্বজ্ঞানে তাঁর বড় আদরের স্নেহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজয়কে দিয়ে গেছেন। সবাই তাঁর উদারতায় অবাক হ'য়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো। বিজয় কাঁদতে কাঁদতে ব্যাকুল হ'য়ে বলতে লাগলো, "মানুষের কি ছোট মন, আমার যে এমন দেবীর মত মা, তাকেও সন্দেহ করেছিল, আয় বিনয়, আয় ভাই, আয় আমাদের সেই দেবী মা'র চরণে প্রণাম করি, প্রার্থনা করি, যেন আমরা দুটি ভাই রাম লক্ষ্মণের মত থেকে, গুণে-জ্ঞানে, পবিত্রতায় সেই দেবী মা'র উপযুক্ত সন্তান হ'য়ে বংশের মুখোজ্জ্বল করতে পারি।"





কান্তিকুমারের চাকরির চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

কান্তিকুমার ভাবলে, আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই, এবার একটা চাকরির চেষ্টা করা যাক। এই ভেবে সে গেলো কামাখ্যার কাছে। তার বন্ধু কামাখ্যা। সে বসে সকাল-বিকালে এক ব্যাঙ্কে আড্ডা জমায়, দুটো-চারটে কাগজে সই করে, মাসের শেষে মাইনে পায়। তার কাছে আসে অনেক চাকরির খোঁজ-খবর, জানে সে চাকরি-বাগানের নানারকম ফন্দি-ফিকির।

কান্তিকুমারকে দেখে সে বললে, 'এই যে – ইয়ে—কী খবর?'

কান্তিকুমার চেয়ারটা পাখার আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'শুয়ে বসে সময় যে আর কাটে না। এবার একটা চাকরি পেলে ভালো হয়।'

কামাখ্যা বললে, 'তা – হ্যাঁ—একটা চাকরি তো দরকারই।'

'আছে নাকি কিছু খোঁজে?'

'মানে সত্যি তুমি চাকরি করবে?'

'সত্যি না তো কী। খোঁজ দাও না একবার, তারপর দ্যাখো কী করি।'

কামাখ্যা টেবিল থেকে একটা ছুরি তুলে নিলে, ফলাটা খুলে খানিকক্ষণ একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। যদিও সে-ঘরে আর-কেউ ছিলো না, এবং কারো শোনবারও সম্ভাবনা ছিলো না কোনো রকম, তবু গলা নামিয়ে চুপি-চুপি বললে, 'কী বলে গিয়ে-- সত্যি যদি মন ঠিক করে' থাকো তো বলি।'

কান্তিকুমারের চাকরীর চেষ্টা

বদ্ধদেব বসু

কান্তিকুমার একটু যেন চটে' উঠেই বললে, 'কী ভেবেছো। তুমি বলো তো? পরীক্ষা দিতে-দিতে বুড়ো হ'য়ে যাবো নাকি?'

'সে তো ঠিকই, সে তো ঠিকই। কত আর বসে'-বসে' পরীক্ষা দেয়া যায়। তা -' এই বলে' কামাখ্যা চুপ করলো।

'চুপ করলে যে?'

'চাকরি একটা আছে। খুব ভালো চাকরি।'

কান্তিকুমার প্রায় লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে। 'সত্যি? কোথায়? কত মাইনে? কবে থেকে? ইস, যা তাক লাগিয়ে দেবো দাদাকে।'

'আরে শোনো, শোনো। মানে- ইয়ে হ'লো গিয়ে- অনেকেই গিয়ে সেখানে পাচ্ছে শুনেছি। তুমি তাহ'লে আজকেই একবার যাও।'

'কোথায় যেতে হবে তা এখনো বলোনি।'

'ঐ যে—ঐ যে জন জনসন আছে না চার্চ লেনে, তাদের আপিসে। একেবারে খোদ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। ও-ব্যাটাকে যদি মানে--যদি সে-রকম ইমপ্রেস করতে পারো, তা' হ'লেই—'

'সত্যি নাকি?' কান্তিকুমার ব্যস্ত হ'য়ে উঠে টেবিল থেকে একটা লেফাফা তুলে নিয়ে মোচড়াতে লাগলো। 'তা' হ'লে এখনই বাড়ী যেতে হয়। স্নান ক'রে খেতে-খেতেই দশটা বাজবে, তারপরেই অ্যা। আর একটা বেনে সায়েবকে ঘায়েল করতে কতক্ষণ। মস্ত ব্যবসা সে চালায়, এক পাতা ইকনোমিক্স পড়েছে? পারবে একটা ক্যালকুলাসের অঙ্ক করতে?' 'অ্যা- তা তো -ইয়ে হ'লো গিয়ে তা তো পারবেই না তবে হ্যাঁ- ও তোমাকে একটা অঙ্ক ক'রতে দেবে বটে।'

'অঙ্ক ক'রতে দেবে? কোন সাহসে?'

'শুনেছি তো ঐরকম। চাকরির জন্যে যেই গেছে, তাকেই দিয়েছে। চিঠিটা ছিঁড়ো না, ওটা দরকারি।'

মোচড়ানো একটি কাগজের বল কান্তিকুমার টেবিলের উপর রাখলে। পা নাচাতে-নাচাতে অত্যন্ত হালকা সুরে বললে, 'ওঃ, ভারি তো দেবে অঙ্ক।'

'আড়াই মিনিটের মধ্যে করে' দিতে হবে। এক সেকেণ্ড দেরি হ'লেই বাতিল।'

কান্তিকুমারের চাকরীর চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

'কেউ পারেনি বুঝি ?'

'একজন প্রায় ক'রে এনেছিলো। সায়েবের টেলিফোন এসেছিলো সেই সময়ে, কথা বল্‌তে বলতে খেয়াল ছিলো না। ইয়ে—অঙ্কটা করতে পনেরো-কুড়ি মিনিট নাকি লাগে।'

'বাজে কথা, নিতান্ত বাজে কথা।' কান্তিকুমার ভুরু বাঁকিয়ে একটু হাসলো। 'আচ্ছা এখন তাহ'লে যাই। তাড়াতাড়ি সবাই ভালো—বলা তো যায় না, কোথা দিয়ে কে আবার—। বিরাট ভোজ দেবো প্রথম মাইনে পেয়েই—সবাইকে ব'লে রেখো।'

'তা—না, তোমার একটা স্যুট আছে তো ?'

'স্যুট। কোট-প্যাণ্টলুন। কে আর গলা-বন্ধ কোট পরে আজকাল।'

'হে-হে, কী বলে গিয়ে, তা না-পরলে তো চলবে না।'

'সত্যি নাকি ? কী মুস্কিল। কোথায় পাই এখন ও-সমস্ত।'

'কেন, তোমার দাদার—'

'পাগল, দাদাকে আগে থেকেই সব বলতে গেছি কিনা। একেবারে আনকোরা করকরে সারপ্রাইজ। কিন্তু যা দেখছি, সায়েবের সঙ্গে দেখা করাই বুঝি হ'লো না।'

'আমি আমার একটা স্যুট দিতে পারতাম, কিন্তু—'

কান্তিকুমার টেবিল চাপড়ে ব'লে উঠ্‌লো, 'রাইট্‌-ও। তোমারই তো স্যুট রয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো তোমার চাইতে অন্ততঃ দু' ইঞ্চি লম্বা।'

'তাতে কী, তাতে কী। প্যাণ্টলুনের নিচের দিকটা একটু চওড়া ক'রে মুড়ে নিলেই হবে। একটু উনিশ-বিশ নিয়ে কারই বা অত মাথা-ব্যথা। দাও তাহ'লে, দেরি কোরো না।' একটু থেমে কান্তিকুমার হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'ওঃ হো।'

'কী হ'লো ?'

'আমি তো নেক্‌টাই বাঁধতে জানি নে—কী হবে।'

'তাতে কী, তাতে কী। তা এক কাজ করো—এখানেই ব'সে যাও আর খানিকক্ষণ আমি দেবো সব ঠিকঠাক ক'রে। ভেবো না। ইয়ে—কিছু ভেবো না। কিন্তু জুতো—জুতোর কী হবে !'

'বারে, জুতো তো আমার পায়েই রয়েছে।'

কান্তিকুমারের চাকরীর চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

'স্যুটের সঙ্গে অ্যালবার্ট পরবে কেমন ক'রে ?'

কান্তিকুমার গম্ভীর হ'য়ে গেলো। একটু ভেবে বল্‌লে, 'তোমার পাৎলুন পরতে পারলে তোমার জুতোই বা পরতে পারবো না কেন ?'

'ইয়ে - বড় হ'লে কেমন হবে ?'

'ওঃ, ভারি তো বড়। শক্ত ক'রে ফিতে বেঁধে নিলেই হবে। আর বেশি তো হাঁটতেও হবে না, বাসএ তো যাবো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, কিছু ভেবো না, ঠিক হ'য়ে যাবে সব। তাহ'লে এখান থেকেই যেয়ো একেবারে। আর একটু বোসো। একটু চা খাও। তারপর- -ইয়ে - আর কী খবর ?'

২

দশটার একটু পরে কান্তিকুমার দস্তুরমত সাহেব সেজে রাস্তায় বেরুলো। জীবনে এই সে প্রথম কোট-পাৎলুন পরলে, মনে হ'লো দম বন্ধ হ'য়ে বুঝি মরে'ই যাবে। গলাটা এমন আঁটা করে' রাখে মানুষ। আর পিঠটা হঠাৎ যদি চুলকে ওঠে তাহ'লে কী উপায়। স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে ফটফট্ ক'রে হেঁটে অভ্যেস, জুতো পরে' মনে হ'লো যেন লোহার বেড়ি পরেছে। তায় জুতোটা বেশ একটু বড়ই হয়, জোরে পা ফেল্‌লেই পিছন দিকের আদ্ধেকটা উঠে আসে। যা-ই হোক, বেশ সমাপন করে' আয়নায় সে তাকিয়ে দেখেছিলো, মন্দ দেখাচ্ছে না তাকে একরকম। সায়েবের যদি কপালে দুটো চোখ থাকে তাহ'লে তাকে দেখেই- ! ওঃ, দাদাকে একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে বটে।

জন জন্সনের আপিস চারতলায়, হেঁটে করে' লিফটে সে উঠে গেলো। ট্র্যাম থেকে নেমে একটু যে হাঁটতে হয়েছিলো তাতে তার বাঁ-জুতোর ফিতেটা বেশ আলগা হ'য়ে এসেছে—সে এক কাণ্ড। এমন অসভ্য কাণ্ড করবে কে জানতো। তা যাক্‌গে, ওতে আর কী হবে, পায়ের দিকে তো কেউ তাকায় না।

সায়েবের নাম জন্ অক্সেনহাম, বেজায় মোটা, বেজায় লাল মুখ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে' কথা বলে। কান্তিকুমারের দিকে পিটপিটে নীল চোখে তাকিয়ে সে একবার ঘোঁৎ করে' উঠলো। তার মানে হচ্ছে গিয়ে—কী চাও ?

আহেরিকা

কান্তিকুমারের চাকরীর চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

কান্তিকুমার মৃদুমধুর হেসে বললে, তোমাদের আপিসে একটা চাকরি খালি আছে, শুনলাম।

'চাকরি—চাকরির জন্যে নিজে এসেছ কেন? বাড়ি গিয়ে দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দাও।'

'অত হাঙ্গামার আর দরকার কী? অঙ্কটা দাও— চোখের পলকে করে' দিচ্ছি।'

'অঙ্ক! কিসের অঙ্ক?'

কান্তিকুমার মনে-মনে ভাবলে, এটা সায়েবের চালাকি। হেসে বললে, 'অঙ্কটা আমার একটু আসে। তোমাদের কিচ্ছু ভাবনা নেই - আমি সব গুছিয়ে নেবো ঠিক। কবে থেকে আসতে হবে, বলো।'

জন অক্রেনহাম খানিকক্ষণ কান্তিকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর টেবিলের উপর একটা বেল টিপলো। বেয়ারা ঘরে ঢুকে সেলাম দিয়ে দাঁড়ালো। সায়েব বললে, 'অফিস-মাষ্টারকে বোলাও।'



একটু পরে ছোকরা মতো সুন্দর চেহারার এক সায়েব ঢুকলো। তাকে দেখেই কান্তিকুমারের ভালো লাগলো, ইচ্ছে হ'লো একটু গল্প করে তার সঙ্গে। কিন্তু ঐ হোৎকা-মুখো অক্রেনহাম তাকে নিচু গলায় কী যেন বললে; সে অমনি টেবিল থেকে একটা লাল বই তুলে নিলে, তারপর কান্তিকুমারের সামনে কাগজ-পেন্সিল দিয়ে বললে, 'Take down.'

কান্তিকুমারের চাকরী চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

কান্তিকুমারের তো মহা উৎসাহ। চোখের সামনে একটা বিকট চেহারার অঙ্ক সে দেখতে পেলো। তার বুদ্ধির ধার দিয়ে সেটাকে টুকরো-টুকরো করে' কেটে ফেলছে।

ছোকরা সায়েবটা বই খুলে পড়তে লাগলো 'It is to the best interests of the Company that a sum of money shall be set aside

কান্তিকুমার চেঁচিয়ে বলে' উঠলো, 'এ কী! এ কী! এ আবার কী-রকমের অঙ্ক!'

সায়েবটা তার কথা ভ্রূক্ষেপ না করে' পড়ে' যেতে লাগলো 'for the purposes of' একবার সে গড়গড় করে' আস্ত একটা প্যারাগ্রাফ পড়ে' ফেললো।

কান্তিকুমার বলে' উঠলো, 'ভুল হয়েছে। অঙ্কশাস্ত্রের জল দিয়ে গুলে খেলেও এ থেকে কোনো অঙ্ক বার করা যাবে না।'

কিন্তু ছোকরা সায়েব সে-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি

বা রে অঙ্কই দিলে না, তো অঙ্ক দেখতে চাও। চালাকি নাকি! চাকরি দেবার ইচ্ছে না থাকে তো সাফাসুফি বলে' দিলেই হয়।'

ছোকরা সায়েব ধবধবে সাদা কাগজটা তুলে নিয়ে অক্সেনহামের সামনে রাখলো। অক্সেনহাম বললে, 'you can go'

কান্তিকুমার বললে, 'যাবো, বেশ তো। অঙ্ক কেউ পারে, কেউ পারে না, কিন্তু এক পাতা ইংরিজিতে অঙ্ক করতে পারবে, এমন লোক পৃথিবীতে নেই। এ-রকম করলে তোমরা কোনো দিনই লোক পাবে না।'

সায়েব বললে, 'গুড-মর্নিং!' বলে কাগজের তাড়ার মধ্যে নাক ডুবিয়ে দিলে।

উঃ, ব্যাটার ভারি দেমাক দেখছি! কী হয় অমন লোকের চাকরি না-পেলে! মানুষ তো নয়, যেন নিরেট একটি ইঁটের পাঁজা। কান্তিকুমারের মনে-মনে ভয়ানক রাগ হ'লো। লাফ দিয়ে সে চেয়ার থেকে উঠলো, তারপর দাবদপে বেরিয়ে এলো।

লিফটে ঢুকতে যাবে এমন সময় তার একটা পা চমৎকার হালকা আর ফাকা-ফাঁকা লাগলো। তাকিয়ে দেখলে, ও হরি! কোথায় বাঁ-পায়ের জুতো! তাই তো, কেলেঙ্কারিই হয়েছিলো ও নিয়ে রাস্তায় বেরলে! ঝড়ের মত ঢুকলো গিয়ে সে অক্সেন-হামের ঘরে, ঊর্দ্ধশ্বাসে বলতে লাগলো, 'জুতো! জুতো!'

আহরিকা

কান্তিকুমারের চাকরীর চেষ্টা

বুদ্ধদেব বসু

অক্সেনহাম লাল মুখ তুলে ঘোঁৎ করে' উঠলো, 'কা হুয়া!'

কান্তিকুমার চ্যাঁচাতে লাগলো, 'জুতো, আমার জুতো!'

সাহেব ডেকে উঠলো, 'বেয়ারা! বেয়ারা!'

চারদিকে মস্ত একটা সোরগোল, এলো চারদিক থেকে লোকজন ছুটে, আমাদের কান্তিকুমার চরকিবাজির মত ঘুরতে লাগলো, জিনিস উলটিয়ে, পা মাড়িয়ে, আছড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়ে সে এক কাণ্ড! সবাই হতভম্ব হ'য়ে ব'লে ধর, ও বাবা সরে' দাঁড়া।

'এই তো! এই তো!' হঠাৎ কান্তিকুমার ব'লে উঠলো।

জুতো ছিলো টেবিলের তলায়, ঠিক সে যেখানে বসেছিলো। ওঠবার সময় টুক্ করে' খসে' এসেছে, টের পায়নি। জুতোটায় পা ঢুকিয়ে একটা চেয়ারে পা তুলে কোনো রকমে ফিতেটা বেঁধে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে গেলো কান্তিকুমার, ধরলো লিফ্‌ট, রাস্তায় বেরিয়ে ধরলো ট্রাম।

গেলো সোজা কামাখ্যার কাছে, জুতো, নেকটাই, কোট এক-এক করে' ছেড়ে-ছেড়ে তার মুখের উপর ছুঁড়তে লাগলো, 'নাও, এই নাও!'

কামাখ্যা বললে, 'ইয়ে - কী হ'লো?'

'তোমার মুণ্ডু!'

সব শুনে কামাখ্যা বললে, 'আরে বুঝলে না? কী বলে গিয়ে ও-তো শর্টহ্যাণ্ডের ডিক্‌টেশন দিয়েছিলো - ষ্টেনোগ্রাফার চায়। মানে—ভালোই হয়েছে, ও-সব বাজে চাকরি কি আর তুমি করবে।'





(একাঙ্কিকা)

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

প্রথম দৃশ্য

(রাস্তার উপর বাড়ীর সামনে বঙ্কু ও ছেলে। ডাণ্ডাগুলি খেলছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে একটি মহিলা বেরিয়ে এলেন।)



মহিলা

(বঙ্কুর কাণ ধরে)

ডাণ্ডাগুলি ছাড়বি কি না, যাবি কি না বাজারে? তেল বাড়ন্ত, নুন বাড়ন্ত, মুখ করেছিস ব্যাজার। (গুম্ গুম্ করে পিঠে কিল মেরে) গিলতে দড়, কাজে জড়, বুদ্ধি যেন ঢেঁকি, দেখিনি তো তোর মত মানুষ মধ্যে মেকি।

বঙ্কু

(কাণমলা খেয়ে) আঁই আঁই, কাণ যে গেল যাই মা বাজার যাই, বল্না মাগো চট্ করে তুই কি আনবো ছাই।

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মহিলা

তেল আনবি, নুন আনবি জামাইবাবুর তরে,
আনবি ভাল মাখন-মারা ঘি, নেই যে ঘরে!
দই আনবি, আদা যে চাই পাঁঠার কাবাব হবে,
ছানা যে চাই পেস্তা বাদাম, পায়েস হবে তবে।
আমার আবার খির না হ'লে অম্বলে যে মরি,
বাবুর আবার চাই যে ভ'রে তামাক ঘড়ি ঘড়ি।

(আবার কাণ মলে)

যা'না বাদর, ছাড়না খেলা, বেলা যে যায় ব'য়ে,
পারি না যে তোর সাথে আর বারে বারে ক'য়ে।

[পয়সা, তেলের ঘিয়ের বাটি ও গামছা দিয়ে মহিলাটির প্রস্থান]

বন্ধু

ওরে জগা, যাইচ'নারে, রক্ষে যেরে নেই,
কাণে হ'ল, পড়বে পিঠে তারি আবার খেই।

জগা

(ডাণ্ডাগুলি খেলতে খেলতে গুনতে গুনতে)

"এক 'দাঁড়া' খেলা হ'ল, দু 'দাঁড়া' লাঢ
তিন 'দাঁড়া' খেলা ভাল চার 'দাঁড়া' মাত্।"

(বন্ধু খেলায় বাধা দেওয়ায়)

র'নারে তুই, একবাড়ি যে দেব কসে আমি,
যাবে যে রে এখনি তোর জারিজুরি থামি।

(নেপথ্যে মহিলা-কণ্ঠে)

ফের খেলা? জগা পালা, দেব ক'সে পিঠে!

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

জগা

(পালাতে পালাতে)

পেটে প'লে দোষ নেই, পড়ে বুঝি পিঠে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বক্কু দোকান পশারের মাঝে পথ দিয়ে চলতে চলতে ।

বক্কু

আরে ভাল—কি যে বলে—পান্তা দিয়ে খায় ? ভুলে গেছি এই মলো যাঃ— হায়! হায়! হায়! মা কি চাই বললে মোরে—জামাইবাবুর হবে, আনতে হবে নেই যে গো তা ঘরে। এই খেলে যা - গুলিয়ে গেল আর যে ছিল কি—বাড়ন্ত সব 'মাছের তেলের ঘি'। ডাংগুলির আণ্ডা সবই ধাণ্ডা তুলে আছে, আমি বলি কাণ্ডটা কি দেখে আসি পাছে। ভুলে যাব - তাইত দেখ বাগ্‌নাপাড়ার মেলায় গেলুম নাক', ভাবছি জানি মেতে যাব খেলায়। আসবে মনে কি কি আবার কিনবো কাটবো তবে। তারি মাঝে একটাবার ত' জিরিয়ে নিতে হবে ?

(একটি দোকানের দাওয়ায় বক্কু বসে পড়ল ।

তৃতীয় দৃশ্য

(বক্কু মেলার ভিড়ে প্রবেশ করে)

বক্কু

আ মোলো যা' ঠেলিস কেন ? দেখছিস্ না যে আমি।

১ম ব্যক্তি

বক্কু যে রে, দেখেছিস কি কোথায় গেল রামী ?

২য় ব্যক্তি

বলতে পারিস নিমাই, ভূতো মেলার ভিড়ের মাঝে,

এমনি করে ছিট্‌কে গেল কোথায় কিসের কাজে ?

আহরিকা

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বঙ্কু

(৩য় ব্যক্তি ধাক্কা দেওয়ায়)

আরে আমি - দেখছিস নাক, আবার ঠেলিস কেন ?

৪র্থ ব্যক্তি

ওরে বাবা, ক্ষ্যাপা মহিষ মানা দেখেছিসরে হেন ?

(মুখোসের দোকানে ঢোকে)

বঙ্কু

বাঃ বাঃ বাঃ খাসা-বদন মুখোস মেলার দেখি
পয়সা পয়সায় দাম কিগো বলন ওরে ঢেঁকী ?

মুদি

পয়সায় দুটো তার কম নয় বলে দিচ্ছি সোজা

বঙ্কু

ও বাবা গো, ভূতের চাইতে শক্ত যে বে ওঝা।

মুদি

নিতে হয় ত নাও না বাবা, বচন শোনাও কারে ?
বচনের বাণ ছোঁড়াবো যে নটীল খর ধারে।

বঙ্কু

বেশ, বেশ, বেশ, তাই তবে দাও, ঐ যে মুখোসখানা,
বাঁশীর মত নাকটি যে তার, মুখে দানা দানা।

মুদি

না হবে না, ও দামেতে — ওর দাম যে বেশী

বঙ্কু

পায়ে ধরি, দাও না মোরে ছাড় বেষাবেষি

মুদি

পায়ে ধরা ছাড় এখন হাতে কিছু ঢাল -
(দাম দেওয়া) এই নাও এ দিনু এটি জিনিষ সরেশ ভাল।

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বঙ্কু

(মুখোশ দিয়ে, আয়নায় দেখে)



বাঃ বাঃ বাঃ কেমন মজা,
সবাই তোরা বগল বাজা।
মুখোস পরে সেজের রাজা
কেমন বনেছি।
(খুলতে গিয়ে) ওমা, ওমা, একি একি—
আটকে যে গেল দেখি।

মুদি

সে কি কথা—সে কি, সে কি মুখোস—

বঙ্কু

দাও খুলে দাও দোহাই তোমার ওগো মুদি ভাই,
আর বলতো, পয়সা তোমার আরো কত চাই।

মুদি

আরে না না—পয়সা নিয়ে হবে বল কি?
মুখোস কিসে খোলা যাবে হদিস্ বলে দি।
বামছাগলের দুধের সাথে হাতির দাড়ির চুলে,
দশ-পেয়ে সেই বামগরুড়ের দাঁতের নখের মূলে,
তিনটিবার ফুঁ দিয়ে শেষে ছুঁয়ে দিলে পরে,
মুখোসখানি খসে গিয়ে যাবে আপন ঘরে।

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

বঙ্কু

(দোকান থেকে বেরিয়ে পথে যেতে যেতে)

ওমা! একি আওয়াজ ও যে চিনতে নারি মোরে,
ওমা শেষে কি হ'বে মা! পুড়লো কপাল ঘোরে!
কি কুক্ষণে বেরিয়েছিনু বাড়ী থেকে আজ,
পড়লো দেখি মেলায় এসে এমনিতর বাজ।

নাপিত

(নাপিতের কাপড়ের গাঁট কাঁধে প্রবেশ)

আরে এ যে 'মেলার মুখোস' কোথা যাসরে মেলা ফেলে?

বঙ্কু

ভাঁ— হুঁ হুঁ হুঁ--মুখোস নই গো' আমি বঙ্কু
হাবার ছেলে।
দাও না ওগো নাপিত দাদা ঘুচিয়ে মুখোস-খানা,
পরিয়ে দিলে দোকানীটা করনু তারে মানা।

নাপিত

তা বেশ ত। দেব আমি 'মেলার মুখোস' খুলে,
কাপড়ের গাঁট নিস্ যদি তুই, আপন কাঁধে তুলে
আর দিয়ে আসিস্ ধোবার বাড়ী চণ্ডীতলায় গিয়ে;
মুখোস খুলে দেব রে তোর খেঁদীর সাথে বিয়ে।

বঙ্কু

দাও না দাদা, চাপাও না গো কাঁধে তোমার বোঝা
ধোপার বাড়ী নিয়ে যাব একেবারে সোজা।

(ঘাড়ে বোঁচ্‌কা চাপিয়ে দিলে)

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চতুর্থ দৃশ্য

(ধোবার ঘাট)

(বঙ্কুর গালে হাত দিয়ে ধোবা)

এই যে এ কে মুখোস পরে চেহারাটি ত' খাসা !—

বঙ্কু

(বোঁচ্‌কা নামিয়ে)

নাও তোমার এ বোঝা বাপু, যাব চলে বাসা

ধোবা

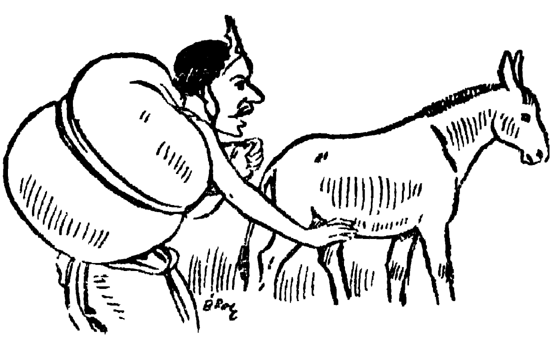
আহা আহা ! শোনো বলি, খাসা বদনখানি,
নাও না বাছা কাঁধে করে গাধার বোঝা আনি ।

বঙ্কু

না, যাব না, বাড়ী বল যাব কেমন করে—
দাও না খুলে ধোবার জামাই, দোহাই পায়ে পড়ি

ধোবা

দিচ্চি খুলে বোঁচ্‌কা নিয়ে চল তড়িক্ ঘড়ি ।



বঙ্কু

বোঁচ্‌কা নিয়ে যাচ্চি চল
গাধার পিছু পিছু

ধোবা

এগিয়ে আমি যাচ্ছি তবে
কিনে নিয়ে লিচু ।

(ধোবার প্রস্থান)

আহরিকা

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(জেলের প্রবেশ)



বঙ্কু

আরে এ যে বাপ্‌রা নফর কুণ্ডু জেলে

জেলে

হরি বল বাবা আমার সোনার বদন জেলে।

বঙ্কু

হরি বল, হরি বল, মুখোস খালে ভাই

জেলে

জালটা ধরে তোলো তুমি হরি বলে থাক।

বঙ্কু

হরি বোল, হরি বোল, জালটা ধরে তোলো
হাল ছেড়ে দি টানতে নারি বেজায় ভারী হোলে

জেলে

হরিবোলার জালে তোল
তিনটে তেলা মাছ
এক টানেতে তুলবো আমি
এমনি ঘ্যাচাঘ্যাচ।
খেলিয়ে আমি তুলবো
জানি তাতে অনেক ন্যাটা,
এক জালেতে ধরব বাটা—
একই সাথে পাচ।
ধিনতা ধিনা জালের মাঝে
দেখবো মাছের নাচ!

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(জাল ধরে আগে টান পড়াতে বিব্রত হয়ে)

ওমা ওমা হরিবোলা নাও না ধরে জাল,
দাঁড়িয়ে আমি দেখব কি গো, হলেম নাজেহাল।
ওমা একি হোঁচট খেয়ে পড়নু যে গো জলে
হরিবোলা নফর কুণ্ডু—ওমা একি বলে।
এ যে দেখি একেবারে ডুবতে আছি এ যে—
ধর না গো গেলুম আমি—টানবে আমায় কে যে!

জেলে

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।
মহানন্দে হরিবোল, মহানন্দে হরি, হরিবোল হরিবোল।

(জেলের প্রস্থান।)

(মৎস-কন্যার প্রবেশ।)



আমি যে গো মীন-কন্যা, বহিয়ে প্রবল বন্যা
এসেছি তোমার কাছে আজি,
যাবে কোথা বল না'ক, বল তুমি কোথা থাক'
'মেলার মুখোস' তুমি পাজি।
তোমারে ধরিব বলে, কত মত ছলে বলে
এনেছি ঘাটের দেখ কাছে -
তবে ত পেয়েছি কাছে, এখন পালাও পাছে
চারি পাশে কি যে ঘিরে আছে!

(ভ্যাবাগঙ্গার মত চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে, যেন তাকে কিসে ঘিরে রয়েছে পুরুভুজের মতন।)

বন্ধু

(ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে)

উ আঁ আঁ আমি কোথা? তবে কি স্বপন দেখি সব—
ওমা ওকি? ওরা কারা? চারিপাশে করে কলরব?

মেলার মুখোস

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

(জগার প্রবেশ)

জগা

এই যে বঙ্কা, গামছা কাঁধে দাওয়ায় শুয়ে কেন ?

বঙ্কু

ভ্যাঁ ভ্যাঁ—সব গেছে ভাই কাটা ঘায়ে কেন
স্নানের ছিটে দিলি যে তুই। বেলা কত হলো ?

জগা

বিকেল-বেলা ফিরিওয়ালা ফিরবে দ্বারে দ্বারে
এখন দেখি ঘুমের ভূত চাপল তোরি ঘাড়ে।

মা

(কাণে ধরে)

এই বুঝি তোর বাজার যাওয়া ? এমনি সারা কাজ।

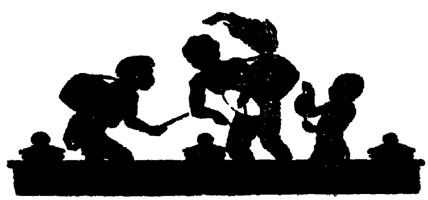
বঙ্কু

ঘাট হয়েছে—পথে ঘাটে দিয়ো না মা লাজ।

চারণ

স্বপন দেখাব সাঙ্গ পালা
খেলে বঙ্কু কাণ মলা।

যবনিকা।





ফকীর না রাজ্যেশ্বর?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুলতান নাসির-উদ্দীন্ এক সময়ে ভারতের রাজতক্তে বসিয়া প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার কথা মনে হইলে আমাদের রামায়ণের সেই রামরাজত্বের কথা মনে হয়। কেন জান? সুলতান নাসির-উদ্দীনও রামচন্দ্রের মতই প্রজার মা বাপ ছিলেন- প্রজাদের সুখের জন্য আপনার সুখের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

নাসির-উদ্দীনের মন্ত্রীর নাম ছিল বল্বন্। বলবনের দাপটে শত্রুদের টু করিবার জো ছিল না। ইঁহাকে মন্ত্রীগিরি দিবার সময় নাসির-উদ্দীন্ বলিয়াছিলেন, 'বল্বন্, আজ হ'তে সব কাজে তুমি আমার ডান-হাত, রাজ্যশাসনের সব ভারই তোমার ওপর। কিন্তু হুঁসিয়ার? এমন কোন কাজ ক'রবে না, যাতে খোদার দরবারে গিয়ে জবাবদিহি করতে হয়,—যেন তোমার ও আমার মুখ লজ্জায় হেঁট না হয়।'

রাজার রাজা নাসির-উদ্দীন্ দিল্লীর সুলতান; ইচ্ছা করিলে কত বিলাস, কত বাবুয়ানা, কত ফুর্ত্তিই না করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন ধূমধামই তাঁহার ছিল না। পরণে তাঁর সাদাসিধা সাজ পোষাক, সেই বেশেই তিনি দরবার করিতেন। একদিন উজীর তাঁহাকে জানাইলেন,—'দীনদুনিয়ার মালিক, খোদাবন্দ, দাসের গোস্তাকি মাফ ক'রবেন—দিল্লীর সুলতানকে কি এই বেশে মানায়? একজন সামান্য আমীরের বেশ-ভূষারও যে চটক আছে, জাঁহাপনার যে তাও নেই।'

আহেরিকা

ফকির না রাজ্যেশ্বর?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাসির-উদ্দীন্ হাসিয়া বলিলেন, 'উজীর! একজন আমীরও আমার চেয়ে ধনী, তাই তাঁর পোষাক-আষাকও তেম্‌নি। কিন্তু আমার কি আছে উজীর যে সাজ-পোষাক, বাবুয়ানায় ব্যয় ক'রব?'

'সে কি জাঁহাপনা—আপনার নেই কি? আপনি হ'লেন দিল্লীর সুলতান! এই রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত' আপনার! আপনি ইচ্ছে করলে না করতে পারেন কি?'

'ভুল—আপনি ভুল বুঝেছেন উজীর-সাহেব! এই যে ধনজন জিনিষপত্র দেখছেন—সমস্তই প্রজার কলিজার রক্ত - তাদের অর্থেই এ সব হয়েছে। এর ওপর ত' আমার কোন অধিকার নেই। তাদের সুখ-সুবিধার জন্যই আমাকে এ-সব রক্ষা করতে হয়—নিজের জন্য ত' সে অর্থ খরচ করতে পারি নে?'

উজীর একেবারে থ হইয়া গেলেন। তার মুখ দিয়া আর একটী কথাও সরিল না। কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—সুলতান নাসির-উদ্দীন্ মানুষ না দেবতা?

সত্য সত্যই নাসির-উদ্দীন দিল্লীশ্বর হইয়াও থাকিতেন গরীবের মত। সুলতান হইলে কি হয়? নিজে রোজগার করিয়া তিনি সংসার-খরচ চালাইতেন, রাজভাণ্ডার হইতে এক কাণাকড়িও লইতেন না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে আজ সাড়ে-ছয়শো বছর আগেকার কথা। তখন আজকালকার মত ছাপা বই বাজারে কিনিতে পাওয়া যাইত না।

পাওয়া যাইত কেবল হাতে-লেখা পুঁথি। এই সব পুঁথি লিখিতে মেহনৎ খুব বেশী, তাই সেগুলি অনেক দামে বিক্রি হইত। সুলতান নাসির-উদ্দীন ছিলেন বিদ্বান লোক; তাঁর হাতের হরফগুলিও ছিল যেন মুক্তার মত। এমন চমৎকার হাতের লেখা তখনকার দিনে খুব কম লোকেরই ছিল। তিনি কি করিতেন জান? মুসলমানদের অত বড় ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোরাণ—বছরে দুইখান করিয়া হাতে লিখিয়া সেই হাতে-লেখা পুঁথি বাজারে বেচিতে পাঠাইতেন। বেচিয়া যে টাকা মিলিত, সেই টাকায় তাঁর সংসার-খরচ চলিত। একবার তাঁর হাতে-লেখা একখানা কোরাণ যে-দামে বিক্রি হওয়া উচিত, তার চেয়ে ঢের বেশী-দাম দিয়া কিনিয়াছিলেন—এক আমীর। একে পুঁথিখানা কোরাণ, তার ওপর খোদ সুলতানের হাতে-লেখা, কাজেই আমীর বেশী দাম দিয়া কিনিতে কষ্ট বোধ করেন নাই। কথাটা সুলতানের কাণে উঠিল, তিনি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন, 'এর পর আর যেন

গাহ নব



ফকীর না রাজ্যেশ্বর ?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়

কখনও শুনতে না পাই যে আমার লেখা কোরাণের পুঁথি বেশী দামে বেচা হ'য়েছে ; আর, কেউ যেন টের না পায়, পুঁথিগুলো আমারই হাতে-লেখা।'

সুলতান নাসির-উদ্দীনের মনটা ছিল ভারি কোমল। কাউকে চটানো বা কারও মনে ব্যথা দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না—সকলকেই মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন তিনি কোরাণ লিখিতেছেন এমন সময় একজন আমীর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। আমীর কথাবার্তার পর, সুলতানের হাতে-লেখা কোরাণের পাতাগুলি একমনে দেখিতে লাগিলেন। খানকতক পাতা উল্টাইবার পর, তিনি নাসির-উদ্দীনকে জানাইলেন যে, একটা বানান-ভুল তাহার নজরে পড়িয়াছে। নাসির-উদ্দীন্ বানানটা দেখিলেন, তারপর পাছে আমীর ভাবেন যে তাঁর ব্যবহারে সুলতান রাগ করিয়াছেন, তাই বানান-ভুলটা ধরিয়া দিবার জন্য হাসিমুখে আমীরকে ধন্যবাদ দিলেন। আর সেই কথাটার চারি পাশে গোল করিয়া রেখা দিয়া রাখিলেন—আমীরের সামনে এমনিভাব দেখাইলেন যেন বানান-ভুলটা তিনি এরপর শোধরাইয়া লইবেন। কিন্তু আমীরও যাই চলিয়া গেলেন, নাসির-উদ্দীনও অমনি সেই গোল দাগটা তুলিয়া ফেলিলেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে ; সুলতান কথাটার বানান ঠিকই লিখিয়াছিলেন—ভুল করিয়াছিলেন সেই আমীর। কিন্তু তাঁর মুখের ওপর ভুলটা ধরিয়া দিলে পাছে তিনি মনে ব্যথা পান বা লজ্জিত হন, নাসির-উদ্দীন্ তাই এমন ভাব দেখাইয়াছিলেন, যেন ভুলটা তাঁহারই হইয়াছে।

সুলতান নাসির-উদ্দীনের ঘরে রাশি রাশি ধন দৌলৎ। ইচ্ছা করিলে শত শত দাসী বাঁদী, রসুই করিবার জন্য ভাল ভাল বাবুর্চ্চি—সবই রাখিতে পারিতেন। কিন্তু দিল্লীর সুলতানের না ছিল ঝি-চাকর, না ছিল রান্নাবান্না করিবার লোক। তাহার স্ত্রী রাণী হইয়াও গরীব গৃহস্থের মেয়েদের মত একাই ঘর-সংসারের সকল কাজ করিতেন,—এমন কি সুলতানের আহারও তাঁহাকে নিজের হাতে তৈয়ারী করিতে হইত। একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে রাণীর একটা আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়া বেজায় যাতনা হইতে লাগিল। সেদিন রাত্রে তিনি স্বামীকে জানাইলেন, 'একজন বাঁদী কি বাবুর্চ্চি দিনকতকের জন্য বাহাল ক'রে দিন-না দয়া ক'রে, আমার আঙ্গুলটা একটু সেরে গেলেই তখন বিদেয় ক'রে দেবেন ; নইলে এ হাত নিয়ে রাঁধি-বাড়ি কেমন করে ?'

ফকীর না রাজ্যেশ্বর ?

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাসিব-উদ্দীন বলিলেন, 'দেখ, আমি বাজাব রাজা– সুলতান, তা সত্য, বাজ-ভাণ্ডারে আমার টাকাকড়ি কোন কিছুবই অভাব নেই—এ কথাও মিথ্যা নয়। কিন্তু আমি তো সে সব ধন দৌলতেব মালিক নই—বক্ষক মাত্র। প্রজাব টাকা খবচ ক'বে যদি আমি নিজের সুখের জন্য বাদী কি পাচক বাখি, তবে আমাকে লাজের ভাগী হ'তে হবে—খোদার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সে কাজ আমাব দ্বাবা হবে না। তুমি যে দীন দরিদ্রকে বিবাহ কবেছ সতি। সে-কথাটা ভুলছ কেন? আমাব ত' এমন সাধ্য নেই যে দু-দশদিনেব জন্যও একটা পাচক বাখি। খোদাকে ডাক তিনি তোমাব হাত চটপট আরাম ক'রে দেবেন। ততদিন আমি নিজের হাতেই বসুই কবব।

কথা শুনিয়া রাণীব সকল জ্বালা যন্ত্রণা নিমিষের মধ্যে জল হইয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কত পুণ্য কবিলে তবে এমন লোকেব স্ত্রী হওয়া যায়



চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ক

আমার ছেলেবেলার বন্ধু মাণিক। সেবারে মাণিক তার বাড়ীর আর সকলকার সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিল, জায়গাটার নাম না-হয় আর বললুম না।

কিছুদিন পরে মাণিকের কাছ থেকে এই চিঠিখানি পেলুম

ভাই অমল,

তোমার জন্যে বড় মন কেমন করছে,—কারণ এ-দেশটা এত সুন্দর যে, তোমাকে না দেখালে আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না।

যে-বাড়ীতে আছি, সেখানিও চমৎকার। একদিকে ধূ-ধূ মাঠ, দু'দিকে নিবিড় বনের রেখা এবং আর একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় ও তাদের কোল দিয়ে নাচতে নাচতে ব'য়ে যাচ্ছে একটি রূপোলী নদী।

তুমি আজকেই মোটমাট বেঁধে নিয়ে রওনা হও। আমাদের চিলের-ছাতের ঘর থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুব স্পষ্ট দেখা যায়। তুমি কবি ব'লে মা তোমার জন্যে এই ঘরখানি 'রিজার্ভ' ক'রে রেখেছেন।

আসতে দেরি হ'লে জরিমানা দিতে হবে। এখানকার সব খবর ভালো। ইতি

তোমার মাণিক।

চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাণিকের মা আমাকে খুব 'কম্প্লিমেণ্ট' দিয়েছেন—আমি নাকি কবি! বাংলা-দেশে কবিতা লিখ্‌লেই কবি হওয়া যায় কিনা! সুতরাং এত-বড় একটা উপাধি লাভের পরেও মাণিকের আমন্ত্রণ রক্ষা না করলে খুবই একটা অকৃতজ্ঞতার কাজ করা হবে! অতএব মোটঘাট বাঁধতে সুরু করলুম।

খ

মাণিকদের বাড়ীতে এসে উঠেছি।

বাড়ীখানি পুরাণো হ'লেও প্রাসাদের মতন প্রকাণ্ড এবং দেখতেও পরমসুন্দর। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত এক বাগানের ভিতরে দাঁড়িয়ে সেই উঁচু বাড়ীখানা প্রত্যেক পথিকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদিকে-ওদিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রথম যখন অমলের সঙ্গে বাগানের পথ দিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লুম, হঠাৎ একদিকে আমার চোখ প'ড়ল বিলাতি 'পাম্‌' গাছ দিয়ে ঘেরা এক-টুক্‌রো জমির ভিতরে ছোট একটা স্মৃতিস্তম্ভের মত কি দাঁড়িয়ে র'য়েছে।

জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, "ওটা কি মাণিক?"

মাণিক ব'ল্‌লে, "কবর।"

—"কবর!"

—"হ্যাঁ। এ বাড়ীখানা আগে এক সায়েবের ছিল। তার মেম মারা গেলে পর তাকে এইখানেই কবর দেওয়া হয়।"

এমন সময়ে মাণিকের কুকুর "লিলি" মনিবের সাড়া পেয়ে সেইখানে এসে হাজির হ'ল। তারপরেই রেগে গরর-গরর্‌ ক'র্‌তে লাগল। দেখ্‌লুম, সে কবরের দিকে তাকিয়ে গর্জ্জন ক'র্‌ছে। কিন্তু কবরের দিকে তাকিয়ে আমি তো কিছুই দেখ্‌তে পেলুম না।

ব'ললুম, "মাণিক, তোমার কুকুর কি দেখে ক্ষেপে গেল?"

মাণিক ব'ল্‌লে, "জানি না। লিলি ঐ কবরটাকে দেখ্‌লেই ক্ষেপে যায়,—যেন সে হাওয়ার সঙ্গে লড়াই ক'র্‌তে চায়!"

আমি ব'ললুম, "না মাণিক, ও তো লড়াই ক'র্‌তে চায় ব'লে মনে হচ্ছে না,—ওকে দেখ্‌লে মনে হয়, ও যেন মহা-ভয়ে পাগল হ'য়ে গেছে।"

চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মাণিক হেসে ব'ল্লে, "জাতে আর নামে বিলিতী হ'লেও লিলি আমাদের কাছে এসে হিন্দু-ধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেচে! হিন্দুর বাড়াতে ক্রিশ্চানের কবর ও বোধ হয় পছন্দ করে না! ······কিন্তু ও-কথা এখন থাক্। চল, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই।"

বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌লুম। যেমন প্রকাণ্ড বাড়ী, তেম্‌নি মস্ত মস্ত ঘর। সে-সব ঘরের অবস্থা এখন ভালো নয়,—কোথাও চূণ-বালি খ'সে প'ড়েছে, কোথাও মেঝে ছ্যাঁদা ক'রে ইঁদুরেরা বড় বড় গর্ত্ত বানিয়েছে, কোথাও কড়ি-কাঠ থেকে বাদুড়েরা দলে দলে ঝুলছে।

মাণিক ব'ল্লে, "এ-বাড়ীখানা অনেক দিন খালি প'ড়েছিল। এই মেড়ুয়াদের দেশে কুসংস্কার বড় বেশী, বোধ হয় ঐ কবরের ভয়েই এ-বাড়ীখানা এতদিন কেউ ভাড়া নিতে চায় নি!"

আমি ব'ললুম, "বসত-বাড়ীতে আমিও কবর-টবর পছন্দ করি না। জীবন আর মৃত্যুর কথা একসঙ্গে মনে প'ড়লে বেঁচে সুখ পাওয়া যায় না।"

মাণিক ব'ল্লে, "আমরা কিন্তু আজ তিন হপ্তা ধ'রে এখানে খুব সুখে বাস কর্‌ছি। ও কবর ফুঁড়ে উঠে কোনদিন কোন মেম-পেত্নী আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসেনি। ····· নাও, এখন ওপরে উঠে তোমার ঘর দেখবে চল।"

চওড়া এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম। এক সময়ে এই সিঁড়ি যে দেখতে খুব চমৎকার ছিল, এখনো তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আজ এ সিঁড়ি এমন জীর্ণ হ'য়ে গেছে যে, আমাদের পায়ের চাপে যন্ত্রণায় যেন আর্ত্তনাদ করতে লাগলো।

গ

চিলের-ছাতের ঘর বলতে আমরা যা বুঝি, এখানি সে-রকম নয়—এ ঘরখানা নূতন ধরণের। এ-শ্রেণীর ঘর প্রায়ই খুব ছোট হয়, কিন্তু এ ঘরখানা বেশ বড়সড়। এর একদিকে কাঠের সিঁড়ি উপরে এসে উঠেছে এবং তার পরেই ঘরখানা সুরু হয়েছে। তিনদিকে সারি সারি বারোটা লম্বা-চওড়া জানলা ও ঘরের ম্যাটিং-মোড়া মেঝের উপরে কতগুলো পুরাণো সোফা, কৌচ্, চেয়ার, ড্রেসিং-টেবিল, ওয়াসিং ষ্ট্যাণ্ড্ ও একখানা মস্ত বড় লোহার খাট। সিঁড়ি ছেড়ে ঘরের মেঝেতে পা দিয়েই—কেন জানি না—

চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আমার মনে হ'ল, এ-জায়গাটা যেন খালি নয়, এখানে যেন কি-একটা অদৃশ্য ও বীভৎস রহস্য একান্তে অনেক দিন ধ'রে গোপনে বাস ক'র্‌ছে! সঙ্গে সঙ্গে কেমন-একটা অজানা আতঙ্কে আমার সারা মন আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। যেন এখানে একটুও হাওয়া নেই, আমার দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌তে লাগ্‌ল।

তাড়াতাড়ি ব'ললুম, "মাণিক, ঘরের জানলা-দরজাগুলো বন্ধ ক'রে রেখেচ কেন? খুলে দাও, খুলে দাও!"

মাণিক আমার কথামত কাজ ক'রলে। বাহির থেকে খোলা আলো আর হাওয়া ঘরের ভিতরে ছুটে এল শিশুর মত সকৌতুকে! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের সকল গ্লানি কেটে গেল!

একটা জান্‌লার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখের উপরে ভেসে উঠ্‌ল, অপূর্ব্ব চিত্রপট! প্রথমেই দেখ্‌লুম, পাহাড়ের পর পাহাড়ের শিখর ক্রমেই উঁচু হ'য়ে আলো-মাখা নীলাকাশের দিকে উঠে গেছে যেন ভগবানের পূজার জন্যে নৈবেদ্যের সারি সাজানো র'য়েছে! তাদের সাম্‌নে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক গান-পাগলিনী, নৃত্যশীলা নদী! সেই কালো পাহাড়-মালার তলায় রৌদ্রদীপ্ত নদীটিকে দেখে মনে হ'চ্ছে, অচপল কাজল-মেঘের তলায় চঞ্চল বিদ্যুতের একটি চক্‌চকে রেখা!

তারপরেই আবিষ্কার ক'র্‌লুম, আমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট এই ঘরের তলাতেই রয়েছে সেই কবরটি! মনটা আবার খুৎ-খুৎ ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

ফিরে ব'ললুম, "দেখ মাণিক, এমন স্থন্দর জায়গায় যে-সায়েবটি বাড়ী তৈরি ক'রেছেন, নিশ্চয়ই তিনি কবি ছিলেন। কিন্তু কবির চোখ পেয়েও এমন মনোরম স্থানে তিনি নিজের স্ত্রীর দেহকে গোর দিলেন কেন, সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুক্‌ছে না!"

মাণিক ব'ল্‌লে, "এখানকার লোকেদের মুখে এক গাঁজাখুরি গল্প শুনেছি। মারা গেলে পর মেমের দেহকে নাকি প্রথমে গোরস্থানেই নিয়ে গিয়ে গোর দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরদিনই দেখা যায়, মড়াশুদ্ধ কফিনটা কবরের পাশে মাটির উপরে প'ড়ে র'য়েছে! কফিনটাকে আবার গর্ত্তে পুরে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। কিন্তু পরদিন সকালে আবার সেই দৃশ্য! উপর-উপরি তিন বার এই দৃশ্যের অভিনয় হবার পর গোরস্থানের পাদ্রী ব'ললেন, "এই পাপীর দেহ গোরস্থান ধারণ ক'র্‌তে রাজি নয়। একে অন্য কোথাও

নিয়ে যাওয়া হোক্।" তখন সকলে বাধ্য হ'য়েই দেহটাকে এই বাড়ীর ভিতরে এনে গোর দিলে। সেই থেকে 'পাপী' কবর থেকে আর পালাবার চেষ্টা করে নি।"

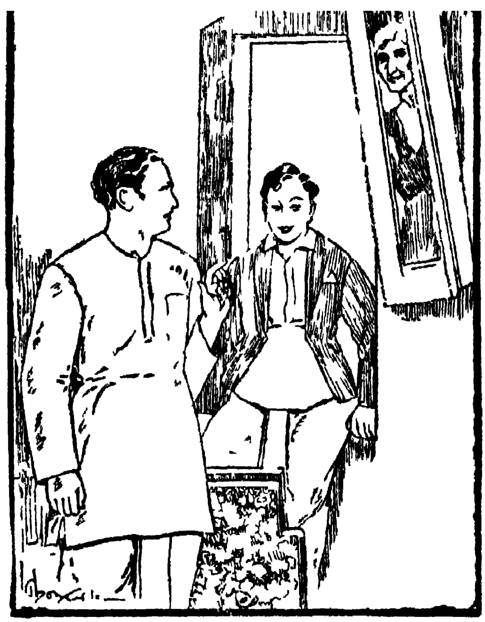
আমি ব'ললুম, "পাদ্রী সায়েব মেমের দেহকে পাপীর দেহ বল্‌লেন কেন?"

মাণিক ব'ল্‌লে, "মেমটা নাকি আত্মহত্যা করেছিল।—কিন্তু আজগুবি গল্প আমি বিশ্বাস করি না—এ সব হ'চ্ছে বানানো কথা।"

ঘ

ঘরের চারিধারে চোখ বুলিয়ে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, "এ ঘরের এই পুরাণো আস্‌বাবগুলো কোত্থেকে এল?"

মাণিক ব'ল্‌লে, 'আসবাবগুলো হ'চ্ছে সেই সায়েবের। তাঁর মেম এই ঘরেই বাস ক'রত। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি আসবাবগুলো যেমন ছিল, তেমনি ভাবেই রেখে দিয়েছেন। আমাদেরও মানা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, আমরা যেন এ-ঘর থেকে কোন জিনিষ না সরিয়ে রাখি।"



হঠাৎ খাটের ঠিক মাথার উপরেই দেওয়ালে-টাঙানো একখানা প্রকাণ্ড 'অয়েল-পেন্টিং'য়ের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। স্ত্রীলোকের ছবি। আসল মানুষের দেহ যত-বড় হয়, সেই আঁকা ছবির দেহটিও তার চেয়ে ছোট নয়।

সুধলুম, 'ও কার ছবি মাণিক?"

মাণিক ব'ল্‌লে, "সেই মেমের। কাছে গিয়ে দেখ না, মেমটি দেখ্‌তে ঠিক ডানা-কাটা পরীর মত ছিল না!"

পায়ে পায়ে ছবির কাছে এগিয়ে গেলুম। পটে আঁকা আছে এক বুড়ীর

চেহারা, তার বয়স পঁচিশটির কম হবে না। লিক্‌লিকে দেহ, বাখারির মতন সরু বাহু, সাদা শণের মতন চুলগুলো কাঁধের উপরে এসে পড়েছে। ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত কুৎসিত হাসি, নাকটা টিয়াপাখীর মতন বাঁকানো,—আর তার কোটরে-ঢোকা কুৎকুতে চোখ ছুটো।—ওঃ, সেই চোখ ছুটোর ভিতর থেকে যে ক্রূর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছুতেই তা বর্ণনা ক'রতে পারব না। আমার মনে হ'ল, গোখ্‌রো-সাপের চেয়েও ভয়ানক সেই চোখ ছু'টো যেন এখনো জ্যান্ত হ'য়ে আছে। ছবিতে-আঁকা মূর্ত্তি ও তার চোখ যে এত বেশী স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়, এটা কখনো কল্পনা ক'রতে পারি নি। বিলিতী কেতারে-আঁকা ডাইনীর মূর্ত্তি যেন রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাণিক ব'ললে, "কি হে অমল, এই মেম-সাহেবটিকে কি তোমার পছন্দ হ'ল ?"

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমি ব'ললুম, "পছন্দ ! যাকে দেখে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে, সে-মানুষটির প্রকৃতি নিশ্চয়ই খুব জঘন্য ছিল। তোমার এই মেমের ছবি যদি ঘর থেকে সরিয়ে না রাখো, তাহ'লে রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ব।"

মাণিক ব'ল্‌লে, "কিন্তু ঘর থেকে যে কিছু সরাতে মানা আছে।"

আমি ব'ললুম, "তাহ'লে আমাকে অন্য ঘর দাও।"

মাণিক একটু ভেবে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, এস আমরা দু'জনে মিলে ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে রেখে দি। তারপর বাড়ী ছাড়বার সময়ে ছবিখানাকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেলেই চ'ল্‌বে।"

খাটের উপরে উঠে দু'জনে মিলে সেই প্রকাণ্ড ছবিখানাকে নামাবার চেষ্টা ক'রলুম। কিন্তু উঃ, সে কি বিষম ভারি ছবি,—ওজনে যেন একটা মানুষের দেহের মতই ভারি।

মাণিক আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে, "ছবি কখনো এত ভারি হয় !"

অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে ছবিখানাকে নামিয়ে, ঘরের বাইরে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে রেখে এলুম।

মাণিক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চম্‌কে উঠে ব'ললে, "ওকি অমল, তুমি হাত কাট্‌লে কেমন ক'রে ? তোমার হাতে অত রক্ত কেন ?"

তাড়াতাড়ি হাত তুলে দেখি, সত্যই তো। আমার দু'খানা হাত-ই যে রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তারপরেই মাণিকের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আমিও ব'লে উঠলুম, "মাণিক, মাণিক! তোমার হাতেও যে রক্ত!"



মাণিক নিজের হাতের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে ব'ললে, "তাই তো! কখন্ যে হাত কেটেচে, আমি তো কিছুই টের পাই নি!"

দুজনে তখনি ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললুম। তারপর আপন আপন হাতের দিকে তাকিয়ে আমরা একেবারে অবাক হ'য়ে গেলুম! আমাদের কারুর হাতেই কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ পর্য্যন্ত নেই!

তবে এ কিসের রক্ত? এ কী রহস্য?

৬

সে রাত্রে চাঁদের আলো এসে বাইরের অন্ধকারের সমস্ত ময়লা ধুয়ে দিয়েছিল এবং দূরের নদী পাহাড় বনকে দেখাচ্ছিল ঠিক পরীস্থানের স্বপ্নময় দৃশ্যের মত।

সেইদিক মোহিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

* * * *

আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙে। কিজন্যে ঘুম ভাঙল, সেটা বুঝতে পারলুম

চেহারা,—তার বয়স পঁইষট্টির কম হবে না। লিক্‌লিকে দেহ, বাখারির মতন সরু বাহু, সাদা শণের মতন চুলগুলো কাঁধের উপরে এসে পড়েছে! ঠোঁটের কোণে অত্যন্ত কুৎসিত হাসি, নাকটা টিয়াপাখীর মতন বাঁকানো, -আর তার কোটরে-ঢোকা কুৎকুতে চোখ দুটো!—উঃ, সেই চোখ দুটোর ভিতর থেকে যে ক্রূর দৃষ্টি বেরিয়ে আসছে, আমি কিছুতেই তা বর্ণনা ক'রতে পারব না! আমার মনে হ'ল, গোখ্‌রো-সাপের চেয়েও ভয়ানক সেই চোখ দু'টো যেন এখনো জ্যান্ত হ'য়ে আছে। ছবিতে-আঁকা মূর্ত্তি ও তার চোখ যে এত-বেশী স্বাভাবিক ও জীবন্ত হয়, এটা কখনো কল্পনা ক'রতে পারি নি। বিলিতী কেতাবে-আঁকা ডাইনীর মূর্ত্তি যেন রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাণিক ব'ললে, "কি হে অমল, এই মেম-সাহেবটিকে কি তোমার পছন্দ হ'ল?"

ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে আমি ব'ললুম, "পছন্দ! যাকে দেখে এই ছবিখানা আঁকা হয়েছে, সে মানুষটির প্রকৃতি নিশ্চয়ই খুব জঘন্য ছিল। তোমার এই মেমের ছবি যদি ঘর থেকে সরিয়ে না রাখো, তাহ'লে রাত্রে আমি দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ব।"

মাণিক ব'ল্‌লে, "কিন্তু ঘর থেকে যে কিছু সরাতে মানা আছে।"

আমি ব'ললুম, "তাহ'লে আমাকে অন্য ঘর দাও!"

মাণিক একটু ভেবে ব'ল্‌লে, "আচ্ছা, এস আমরা দু'জনে মিলে ছবিখানাকে নামিয়ে ঘরের বাইরে রেখে দি। তারপর বাড়ী ছাড়বার সময়ে ছবিখানাকে আবার দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে গেলেই চ'ল্‌বে।"

খাটের উপরে উঠে দু'জনে মিলে সেই প্রকাণ্ড ছবিখানাকে নামাবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। কিন্তু উঃ, সে কি বিষম ভারি ছবি,—ওজনে যেন একটা মানুষের দেহের মতই ভারি।

মাণিক আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'ল্‌লে, "ছবি কখনো এত ভারি হয়!"

অবশেষে কষ্টেসৃষ্টে ছবিখানাকে নামিয়ে, ঘরের বাইরে ছাদের উপরে নিয়ে গিয়ে রেখে এলুম।

মাণিক হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে চম্‌কে উঠে ব'ললে, "ওকি অমল, তুমি হাত কাট্‌লে কেমন ক'রে? তোমার হাতে অত রক্ত কেন?"

তাড়াতাড়ি হাত তুলে দেখি, সত্যই তো! আমার দু'খানা হাত-ই যে রক্তে রাঙা হ'য়ে উঠেছে।

চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তারপরেই মাণিকের দুই হাতের দিকে তাকিয়ে আমিও ব'লে উঠলুম, "মাণিক, মাণিক। তোমার হাতেও যে রক্ত।"



মাণিক নিজের হাতের দিকে হতভম্বের মত তাকিয়ে ব'ললে, "তাই তো। কখন্ যে হাত কেটেচে, আমি তো কিছুই টের পাই নি।"

দুজনে তখনি ছুটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেললুম। তারপর আপন আপন হাতের দিকে তাকিয়ে আমরা একেবারে অবাক হ'য়ে গেলুম! আমাদের কারুর হাতেই কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগ পর্যান্ত নেই।

তবে এ কিসের রক্ত? এ কী রহস্য?

৬

সে রাত্রে চাঁদের আলো এসে বাইরের অন্ধকারের সমস্ত ময়লা ধুয়ে দিয়েছিল এবং দূরের নদী পাহাড় বনকে দেখাচ্ছিল ঠিক পরীস্থানের স্বপ্নময় দৃশ্যের মত।

সেইদিকে মোহিত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

*　　*　　*　　*

আচম্বিতে আমার ঘুম গেল ভেঙে। কিজন্যে ঘুম ভাঙল, সেটা বুঝতে পারলুম

না বটে, কিন্তু এটা বেশ অনুভব করলুম, ঘরের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন-একটা অস্বাভাবিক কিছু হ'য়েছে!

ধড়মড়িয়ে বিছানার উপর উঠে ব'সে চেয়ে দেখি, কালো মেঘের চাদরে চাঁদের মুখ ঢাকা প'ড়ে গেছে!

ঘরে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! সঙ্গে-সঙ্গে কেমন-একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ আমার নাকে এল—মেডিকেল কলেজে যে-ঘরে পচা মড়া কাটা হয়, একবার সেই ঘরে ঢুকে আমি ঠিক এই রকম দুর্গন্ধই পেয়েছিলুম!

হঠাৎ আমার মাথার উপর কে ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেল্‌লে, আমার স্তম্ভিত বুকটা টিপ্‌ টিপ্‌ করতে লাগল।

ভাবলুন, মনের ভুল। হয়তো জানলা দিয়ে হাওয়ার দমক এসে আমার চুলে লেগেছে!

একটু স'রে ব'সে বিছানা হাত্‌ড়ে দেশলাইয়ের বাক্সটা পেলুম। একটা কাঠি জ্বেলে তুলে ধ'রে তাড়াতাড়ি ঘরের চারিদিকটা একবার দেখে নিলুম।

দেশলাইয়ের কাঠি নিবে গেল। কিন্তু যা দেখেছি, সেইটুকুই যথেষ্ট!

মাণিক আর আমি দুজনে মিলে যে ভারি ছবিখানাকে ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে নাগিয়ে বাইরে রেখে এসেছিলুম, সেই ছবিখানা ঘরের দেওয়ালে যেখানে ছিল আবার ঠিক সেইখানেই টাঙানো রয়েছে!

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবৃছি, কি করব,—হঠাৎ আমার কাঁধের উপর কে যেন একখানা হাত রাখলে,—বরফের মত ঠাণ্ডা-কন্‌কনে একখানা হাত!

ভয়ে পাগলের মত হয়ে গিয়ে আমি সামনের দিকে সজোরে এক ঘুসি ছুঁড়লুম এবং পর-মুহূর্ত্তেই কে যেন সশব্দে দড়াম্‌ ক'রে মেঝের উপরে প'ড়ে গেল!

আমিও আর অপেক্ষা করলুম না,—তীরের মত ছুটে ছাতের ঘরের সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলুম!

সিঁড়ির ঠিক তলাতেই একটা লণ্ঠন হাতে ক'রে উদ্বিগ্নমুখে দাঁড়িয়েছিল মাণিক। আমাকে দেখেই সুধোলে, "ব্যাপার কি? তোমার ঘরে ও-কিসের শব্দ হ'ল?"

চিলের-ছাতের ঘর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, "তোমাদের সেই ডাইনির ছবি আবার ঘরে ফিরে এসেছে।"

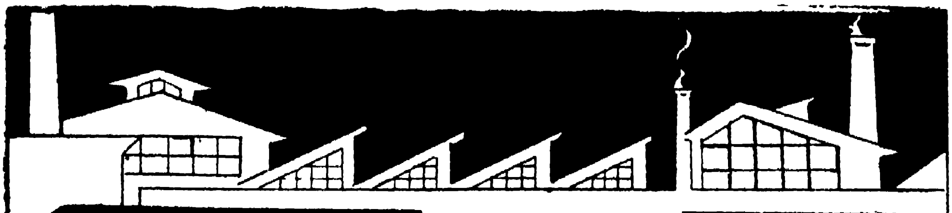
—"বোং! যত বাজে কথা! ছবির কি পা আছে? দাঁড়াও, দেখে আসি।"—এই ব'লে মাণিক দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল।

-- কিন্তু তার পরেই শুনলুম মাণিকের উচ্চ আর্ত্তনাদ এবং তার পরেই দেখলুম, সে একসঙ্গে তিন-চারটে সিঁড়ি টপ্‌কে নীচে নেমে আসছে। আকুল স্বরে সে বললে, "ঘরের ভিতরে পচা মড়ার গন্ধ আর ঘরের মেঝেতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে একটা বুড়ীর পচা আর গলা মড়া।"

হঠাৎ আমার নিজের গায়ের দিকে নজর পড়ল—আমার কাঁধের উপর থেকে একটা রক্তের ধারা গা ব'য়ে নেমে আসছে। এই কাঁধেই সেই বরফের মত ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়েছিলুম।*

* ই. এফ. বেনসনের লেখা একটি গল্পের ছায়া মাত্র অবলম্বনে।





লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে একদিন ছিল যখন চরকার পূজা হোতো। চরকার কাপড়ে সভ্যতা বজায় থাকতো, অর্থাৎ চরকাই ছাতা দিয়ে মাথা রাখতো। চরকায় নানা রকম কাপড় হোতো, নানা দেশের হাটে বাটে বিকোতো, অনেক পয়সা তা থেকে উপায় হোতো।—এক কথায় চরকা যারা রাখতো—চরকাই আবার তাদের রাখতো।

তাই শোনা যায় সেকালের ঠাকুমা ভন ভন ক'রে চরকা ঘোরাতেন আর গুন গুন ক'রে গান গাইতেন—

> "চরকা আমার সোয়ামী পুত
>
> চরকা আমার নাতি
>
> চরকার দৌলতে আমার
>
> দুয়োরে বাঁধা হাতী।"

দুয়োরে হাতী বাঁধা তখন ছিল একটা মস্ত বড় ব্যাপার। অগাধ বিষয়-সম্পত্তি প্রাসাদ সৌধ-অট্টালিকা, প্রকাণ্ড মান সম্ভ্রম যাদের, তাদেরই দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকতো। যার তার তো' সে সাধ্য হোত না,—কথায় ব'লে 'হাতী পোষা'। প্রকাণ্ড জানোয়ার, থাকবার মস্ত জায়গা চাই। মাহুত থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক চাকর-বাকর চাই,—তার সেবা শুশ্রূষা করতে। তারপর 'হাতীর খোরাক',—সেও এক মস্তা-ব্যাপার, তা যোগানো কি যার তার সাধ্য! এক কথায়—হাতীর অনেক হাঙ্গামা,—অনেক খায়, অনেক উপদ্রব করে, অনেক মায়া বাড়ায় আবার অনেক মাথা এ্যাড়ায়! এমন যে হাতী—চরকার দৌলতে এও 'দুয়োরে বাঁধা' সম্ভব হোতো।

আবার, এমন যে চরকা, তাকেও তৈরী করতে হোতো; আবার তা তৈরী করতে এমন একটী জিনিষ দরকার হোতো যা নইলে আর সে চরকা তোয়েরই হোতো না; স্বধু চরকাই বা কেন? চরকার

* এই প্রবন্ধের ভাব (প্রবন্ধ নহে) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রাদিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং লেখকের বিনানুমতিতেও কেহ কেহ পুস্তিকায় মুদ্রিত - এমন কি বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন নাই।

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুগ্রহ ফল প্রেস প্রাসাদ সৌধ অট্টালিকা, দুর্গ-প্রাকার ইমারত, যান শকট, কোন কিছুই হোত না,—সে জিনিষটী,—সব জিনিসের সেরা—সে যে অয়স্কান্ত মণি,—এক কথায় 'লোহা'।

ঠাক্‌মা যেমন গুন্‌গুনিয়ে চরকার গান গেয়ে তার সম্মান বাড়িয়েছিলেন, লোহার দেশের ঠাক্‌মারাও তেমনই গুন্‌গুনিয়ে লোহার গান গেয়ে, অন্তরের সব কথাটুকু নিঃশেষে দু'কথায় শেষ ক'রে লোহার পূর্ণ সম্মান বজায় রেখে গেছেন—

লোহা আমার শাঁখা সাড়ী
লোহাই আমার সোনা,
লোহা বিনে সোহাগ সরম
যায়না কিছু গোনা।

*　　*　　*　　*

লোহা আমার সর্বস্ব
লোহাই শ্রেষ্ঠ মানি
লোহা বিনে কাঙালিনী—
হোক সে রাজার রাণী।

*　　*　　*　　*

লোহা আমার ঘর সংসার
লোহাই আমার আলো
লোহা বিনে হীরে সোনা
সবই আঁধার কালো।

হাতীর অনেক হাঙ্গাম, তাই অনেকে তাকে এ যুগে 'দুয়োরে বাঁধা' পছন্দ করেন না। সুতরাং চরকার গানের সঙ্গে লোহার গানের সামঞ্জস্য রেখে যদি কেউ গেয়ে যান—

"লোহা আমার সোয়ামী পুত
লোহাই পাকা বাড়ী
লোহার দৌলতে দ্বারে
দাঁড়িয়ে মোটর গাড়ী—"

তবে কিছুমাত্র অশোভন হবে না, বরং তা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে,—বিশেষ তার অর্থ হিসাবে। মোটর-গাড়ীতে লোহাই যে প্রায় সব।

আহরিকা

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

এক পা চলবার উপায় নেই—চারিদিকে লৌহ-যোগ। বেড়াতে যাব, আগেই চাই বেশ ও কেশ বিন্যাস,—এদের যত কিছু সাজ-সরঞ্জাম সবই হয় লোহার কল-কব্জায়। আহারাদির ব্যবস্থা—শস্যাদি তরি-তরকারীর জন্য প্রথমেই চাই হল চালন বা ভূমিকর্ষণ,—লোহা ছাড়া হয় না। বিবাহে লোহাই প্রধান; সংসারের কাজ কর্ম্মে চাই লোহা আগে। রেল ষ্টীমার, চলা-ফেরা,—লৌহ যোগের হাত এড়িয়ে হ'বার যো নেই। সংসার ঘরকন্না ছেড়েও নিস্তার নেই—সন্ন্যাস যোগে লোটা কম্বলের সঙ্গে চিমটায় লৌহ যোগ প্রকট; আর শেষের সে দিনেও লোহার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হবার কোনই সম্ভাবনা নেই।

চিকিৎসায়—এ্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক বা আয়ুর্ব্বেদী, কোথাও লৌহ যোগ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আয়রণ্, ফেরি, ফেরাম বা 'পুটিত'—সবই লৌহ যোগ,—এমন কি 'মুষ্টিযোগে'ও অনেক সময় লৌহ-যোগ দৃষ্ট হয়।

সংসারের বাঁধনের সোনার শৃঙ্খলের প্রধান অবদান—লোহা 'নোয়া'। আবার শান্তিরক্ষার ভীম দর্শন পুলিশ অবতারের কঠিন শৃঙ্খল-যোগেও লোহা। দেবাদিদেব ইন্দ্রের অপ্রতিহত বজ্রও পরাভব মানে এই লৌহ-যোগে এসে—সৌধছাদে লৌহ-যোগের দৃপ্ত ভঙ্গিমায়।

লোহার অলঙ্কার কেহ ব্যবহার করেন না সত্য কিন্তু সকল অলঙ্কারের শীর্ষে স্থান পেয়েছে লোহা,—পরিমাণে তা যতটুকুই হোক।—'লোহা বিনে হীরে মাণিক সবই আঁধার কালো'। অর্থাৎ রাশীকৃত স্বর্ণালঙ্কারের তুল্য অথবা তদপেক্ষাও সম্মানার্হ ঐ সামান্য একটু লোহা—'লোহা বিনে কাঙালিনী হোক সে রাজার রাণী'।

স্বর্ণের মূল্য বহুগুণ অধিক কিন্তু সে স্বর্ণও আসে পাহাড় পর্ব্বতের গহ্বর প্রদেশস্থ খনি হ'তে। লৌহ যোগ ছাড়া তাকে স্বর্ণাবস্থায় আনা সম্ভবপর নয়,—অলঙ্কারাবস্থায় তো দূরের কথা।

রাজ প্রাসাদ বা দেব-মন্দির, নগর বা রাজ্য বিস্তার বা রক্ষা, 'বাণিজ্যে বা কৃষি কর্ম্মণি'—সর্ব্বত্রই লোহার সমান সমাদর,—তাই আমাদের বাংলার কবি মুক্তকণ্ঠে লোহার অমর-কীর্ত্তি লোহারই মুখ দিয়ে সোনাকে লক্ষ্য ক'রে ঘোষণা করিয়েছেন—

"আমি যাই করে দিই তোমার নির্ম্মাণ,
তাই সে সকলে করে তোমার সম্মান
দেউল জাঙ্গাল আদি দীঘি সরোবর,
আমি সে খনন করি পর্ব্বত শিখর;

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"অরণ্য কাটিয়া আমি নগর বসাই,
দেখ দেখি কি প্রকারে তরণী সাজাই,
আমার প্রভাবে শস্য সর্ব্বজীবে খায়;
আমা হতে সর্ব্বলোক ভয়ে ত্রাণ পায়।
আমি যাই করে দিই লেখনী নির্ম্মিত
তবে হয় মানুষের পুস্তক লিখিত।"

বাস্তবিক পক্ষে এতে সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই। খবরের কাগজই হোক আর বই ই হোক—ছাপার কল থেকে বেরিয়ে আসে,—আর সে কল লোহা ছাড়া হয় না। একটা কলম বা পেন্‌সিল বা যে কোন জিনিষ তৈরী করতে হ'লে লোহার সাহায্য ছাড়া হ'তে পারে না। সুতরাং এক কথায় বলা যায়—ভোর থেকে সুরু ক'রে রাত্রে নিদ্রা পর্য্যন্ত, অথবা জন্মাবধি সর্ব্বকাল ও সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বথা লোহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ছাড়া আমাদের চলে না। সাধে কি ঐ একই কবিতায় স্থানান্তরে লোহা স্পর্দ্ধা সহকারে সোনাকে ব'লেছে—

"আমা ছাড়া কোন কর্ম্ম আছে পৃথিবীতে?
বিবেচনা ক'রে বুঝ প্রভেদ তোমাতে।

* * * *

"পথে যেতে তুমি স্বর্ণ সঙ্গে থাক যার,
রক্ষা কি করিবে,—তার প্রাণে বাঁচা ভার,
আমারে লইয়া যাক,—লিখে দিতে পারি,
যদি তার বিঘ্ন হয়,—বৃথা নাম ধরি।"

(স্বর্ণ ও লৌহের বিবাদ—৺রামসুন্দর ঘটক)

বাস্তবিক লোহার ন্যায় প্রয়োজনীয় পদার্থ, বিশেষতঃ ধাতব পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ভূধর-সলিলে গহনে ইহার প্রভাব, রাজা প্রজা যোদ্ধা-বোদ্ধার নিকট ইহার আদর; ধনী-দরিদ্র সন্ন্যাসী-গৃহস্থের সহিত ইহার পরিচয়। বাঙালী কবির মত ইংরাজ কবিও লোহার সুরে সুর মিলিয়ে গেয়েছেন—

"Gold is for the mistress—Silver for the maid,
Copper for the craftsman cunning at his trade,
"Good",—said the Baron, sitting in his hall,—
"But iron"—cold iron—is master of them all".

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

লোহার বয়স

লোহার প্রথম প্রচলন কবে কোথায় কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হয় তা নিঃসন্দেহে বলা অসম্ভব। এর সঠিক পাঁজি পুঁথি পাওয়া যায় না। ইতিহাস—পুরাণ—গল্পে—যা কিছু পাওয়া যায় তাই থেকে একটা মোটামুটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

লোহার ঔৎকর্ষ মানব সভ্যতার ঔৎকর্ষেরই নামান্তর, অর্থাৎ যে দেশে যত উৎকৃষ্ট লোহা পাওয়া গিয়েছে সে দেশের সভ্যতাও তদ্রূপ উচ্চাঙ্গের বলে স্বীকৃত হয়েছে। আরও সোজা কথায় মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই উন্নতির পথে প্রধাবিত হয়েছে, লৌহ-বিজ্ঞানও ততই অধিক ঔৎকর্ষতা লাভ করেছে।

লৌহবিদ্ অনেকের মতে লোহা প্রথম প্রস্তুত হয় মানব সভ্যতার আদি জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার এসিয়া-মাইনর প্রদেশে। আবার অনেকে বলেন ইহার প্রথম সৃষ্টি প্রাচীন চীনে কেউ বা বলেন প্রাচীন মিশরে, কেউ কেউ বলেন প্রাচীন ভারতবর্ষে। প্রাচীন রোম ও প্রাচীন গ্রীসও বাদ পড়ে না। তবে এটা বেশ জোর করেই বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে এর ঔৎকর্ষের যত অধিক প্রমাণ পাওয়া যায় এত বোধ হয় আর কোথাও পাওয়া যায় না।

তিন হাজার বছর আগের, কুতুব মিনারের নিকটস্থ লৌহস্তম্ভ যে কি করে তখনকার দিনে তৈরী হয়েছিল তা' লৌহবিদ্‌গন এখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি। আজ কোন লোহা তৈরী হলে কালই তাতে মরচে ধরে, আর দীর্ঘকাল শীত-আতপ বর্ষায় ফেলে রাখলে একেবারে অব্যবহার্য্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু দিল্লীর এই লৌহস্তম্ভ যুগ যুগ ধরে সহস্র সহস্র শীত আতপ-বর্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও এতটুকু মরচে ধরে নি। বাস্তবিক পক্ষে এর নির্ম্মাণ-কৌশল মিশরের পিরামিডের নির্ম্মাণ কৌশল অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

শূর সেকন্দর (আলেকজন্দর দি গ্রেট) যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি ভারতে লৌহ-নিষ্কাশনের যে প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-যুগেও দেশীয় পদ্ধতিতে তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়—তা সত্ত্বেও দিল্লীর এই বৃহৎ লৌহস্তম্ভ কিংবা আবু-পাহাড় ও ধর নামক স্থানের লৌহ-স্তম্ভদ্বয় তখনকার দিনে কি করে তৈরী হয়েছিল! পক্ষান্তরে কোনারকের বালুকাগর্ভে প্রাপ্ত বড় বড় কড়িগুলি বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়।

অনেকের মতে প্রাচীন লোহা যা পাওয়া গেছে তাতে দেড় হাজার বছর আগে তা তৈরী হয়েছিল এমন মনে করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে তারা টুটানখামেনের সমাধিমধ্যে প্রাপ্ত লৌহ নিদর্শনের নজির দেন। আমরা তার উত্তরে মহাভারতের নজিরে লৌহ-শিল্পের বিস্ময়কর নিদর্শন "লৌহভীম" দেখাতে পারি। একখানা ছোরা, একখানা ছুরি বা একখানা তরবারী এক কথা—আর লোহার একটা

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্ত মানুষের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। প্রাচীন লোহার আরও বহু নজির আছে। নাইনিতাল অঞ্চলে ভীম তালের আশে পাশে লৌহ নিষ্কাশনের প্রচুর নিদর্শন আজও বর্তমান। কিংবদন্তী এই যে, মহাভারতের কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি এইখানেই তৈরী হয়েছিল।

সভ্যতার চিহ্নরেখা যতদূর পাওয়া যায় তাতে লোহার বয়স খৃঃ পূঃ ছ' হাজার থেকে চার হাজার বছর অনুমান করা যেতে পারে। বৈদিক ও রামায়ণের যুগে লোহার উল্লেখের অভাব নেই।

এই যে প্রাচীন লোহা। 'প্রথম-দরশে তা' কেমন ছিল, কবে কোথায় কোন গহনে ইনি স্বরূপে ধরা দেন, কি ভাবে 'গোপন বন ভবনে' এর প্রথম প্রকাশ তার একটুখানি আলোচনা করা যেতে পারে। অনেকের অনেক মত হলেও কেউ কেউ অবশ্য ভারতকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। আমাদের মতে— ভারতেই এ 'মণির প্রথম বিকাশ, আর ভারতের 'বন ভবনে'ই এর প্রথম প্রচার। Roscoe & Schorlemmer—'Treatise of Chemistry' গ্রন্থে—ভারতেই সম্ভবতঃ এর 'প্রথম প্রভাত' বলে উল্লেখ করেছেন— It appears probable that iron was first obtained from its ore in India

---

লোহার প্রথম প্রভাত

লৌহ যোগের যিনি প্রথম সাধক তাঁর বিশেষ পরিচয় দেওয়া বা কোন্ সুদূর অতীতে, কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে কোথাকার 'বন ভবনে' তাঁর সাধনা বা কি তাঁর নাম, কোথায় ধাম তা আজ বলা অসম্ভব। তবে তাঁর সাধনার পদ্ধতি যতটুকু পেয়েছি তাই আজ এইস্থানে লিপিবদ্ধ ক'রতে ইচ্ছা করি।

শীতকাল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড় অবধি কনকনিয়ে উঠছে। চারিদিকে শুধু জঙ্গল। ঘর দুয়োরের নাম গন্ধও নেই। কাপড় চোপড় চাল ডাল কিছুরই তখন সৃষ্টি হয় নি। কম্বল মুড়ি দিয়ে একটু আরাম করা বা এমন শীতে গুনি খিচুড়ির আস্বাদ গ্রহণ করা তখনও বহুদূরের স্বপ্ন। গাছের ছাল গায়ে জড়িয়ে পাহাড়ের তলায় এক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসে তিনি শীত নিবারণ করছিলেন ও পাহারা দিচ্ছিলেন পাছে আগুন নিভে যায়। এমনি পাহারা তাঁরা পালা করে দিতেন, কেননা একবার নিভে গেলে এখনকার মত তখন তো তা আর হঠাৎ জ্বালা যেত না, কাজেই অহোরাত্র আগুন রাখা দরকার হোতো। সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিধার ছিল তাঁদের ক্লাব। আর সেই আগুনে পশুটা পাখীটা যে যা পেতেন সেঁকে নিয়ে সেবায় লাগাতেন।

সেদিন হাওয়ার বেজায় জোর। আগুন ঠিক রাখা দুরূহ। উপায়ান্তর না দেখে ছোট বড় নানান্ আকারের পাথরের বেড় দিয়ে তিনি হাওয়া আটকাতে চেষ্টা করলেন। এমনি দু' এক দিন যায়। হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, কুণ্ডের আশেপাশে ছোট ছোট ফাটলাকৃতি স্থানগুলিতে কি একটা কালো

আহরিকা

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কালো শক্ত জিনিষ জমাট বেঁধে রয়েছে। তাঁর কৌতূহল হ'ল—কি এ জিনিষ। মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য রেখে তিনি বুঝলেন, এ জিনিষটা পাথর গলে বেরিয়ে এসেছে, এর যে পাথর তিনি অগ্নি রক্ষার জন্য এনেছেন তার মধ্যে দু'চারখানা এমন আছে যা থেকে এমনি একটা শক্ত জিনিষ তৈরী হতে পারে।

এই হোলো প্রথম লোহা তৈরী. আর ঐ কুণ্ডটাকে বলা যেতে পারে প্রথম 'ব্লাষ্ট ফারণেস'। ভেতরে অত বড় আগুন, আর বাহিরে অমন জোর বাতাস। আর ছোট বড় পাথরের আশে পাশে লোকর নিশ্চয়ই ছিল। সুতরাং ব্লাষ্ট বা জোর বাতাস সে ফারণেস নিশ্চয়ই পেত। এই ভাবে মানুষের সঙ্গে লৌহ-প্রস্তরের বা খনিজ লৌহের বা iron ore এর এই হ'ল প্রথম পরিচয়।

এই যদি হয় লোহার প্রথম প্রভাত অথবা লৌহ যোগের প্রথম সূত্র, তবে তা থেকে ধাপে ধাপে সে লোহা কেমন ক'রে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে তা ভেবে বিস্মিত না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয়। লোহা যে লোহা—যার চেয়ে শক্ত কিছু আছে বলে সাধারণ আমরা মনে করি না, তা তৈরী হ'ল পাথর থেকে—তাও আবার আগুনে গালিয়ে। এ কথা সহজে কি কেউ কল্পনায় আনতে পারেন?

ক্রমশঃ লোহা নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন প্রকার উনুন (oven) সৃষ্টি হ'ল। তার সঙ্গে হাপর সংযুক্ত হোলো। তাতে উনুনের মধ্যে বায়ু প্রবেশের ব্যবস্থা হওয়ায় তাপ স্বভাবতঃ বেড়ে লৌহ প্রস্তুত প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে এল।

তারপর হ'ল চামড়ার হাপর ও বাঁশের নল, আর ধুম নির্গমের পথ একটু বড় করে পুরানো উনুনের উন্নতি সংসাধিত হোলো। অবশ্য এ সব প্রক্রিয়া যে পর পর হচ্ছিল তা নয়, এক একটা যুগে এক একটা পরিবর্তন প্রবর্তিত হচ্ছিল।

এখনও লোহার দেশে,— সিংহভূম মানভূম ইত্যাদি ছোটনাগপুর অঞ্চলে ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা দক্ষিণের জঙ্গলে এই পুরাতন আদিম প্রথায় এমনিভাবে লৌহ নিষ্কাশন হ'তে দেখা যায়। এখনকার উনুন অবশ্য আগের চেয়ে আরও কিঞ্চিৎ উন্নত প্রণালীর। নীচে বায়ু প্রবেশের প্রশস্ত পথ, উপরে, উনুনের মুখ ক্রমশঃ সরু হ'যে ৪।৫ ফুট উঠেছে,—অনেকটা চিমনি আকৃতি।

কিন্তু বিজ্ঞান যুগে এ ধরণের উনুনে কোন কাজ হ'তে পারে না। এখন অবিরত মেঘপুঞ্জনিভ ধূমোদ্গারী বয়লার ও শক্তিগৃহ বা 'পাওয়ার হাউস' সহযোগে বিরাট বিরাট ব্লাষ্ট ফারণেসে রাশি রাশি লোহা প্রস্তুত হচ্ছে।

ভারতবর্ষে এ ধরণের ব্লাষ্ট ফারণেস প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল কিন্তু তা সফল-কাম হয় নি। পর পর আরও কয়েকটী চেষ্টাও তদপেক্ষা অধিক সাফল্য লাভ করে নি। 'বেঙ্গল আয়রণ কোম্পানি'র কুল্টী কারখানাই প্রথম কারখানা যা সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়েছে—কিন্তু ইস্পাত সেখানে তৈরী হওয়া অসম্ভব বোধে সে চেষ্টা অধিকদূর অগ্রসর হয়নি। লোহা অবশ্য অনেকদিন ধরেই হচ্ছে।

লোহার কথা

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু ভারতের সব চেয়ে বড় যে কারখানা, যা প্রাচ্যের বা এসিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অথবা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহৎ এবং বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জগতের লোহা কারখানার মধ্যে যা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে—সেই টাটার লোহার কারখানায় লোহা তো হয়ই, পরন্তু প্রচুর ইস্পাতও তৈরী হয় এবং ইস্পাত তৈরীর জন্যই তার প্রতিষ্ঠা ও সেইটেই তার বিশেষত্ব। ১৯০২ খৃঃ ইহার আলোচনা, ১৯০৪ খৃঃ প্রাথমিক কাজ ও ১৯০৭ খৃঃ ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯১১ তে প্রথম ইস্পাত তৈরী হয়, লোহা তার আগেই হয়েছিল। প্রথম প্রত্যহ ১০ টন থেকে সুরু করে এখন দেড় হাজার দু' হাজার টন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হচ্ছে। প্রত্যহ ৫ হাজার টন কয়লা এজন্য এখানে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন প্রথার আদিম ফার্ণেসে প্রত্যহ ১০ সের হ'তে উর্দ্ধতন আধ মণ পর্য্যন্ত লোহা পাওয়া যেতে পারে। আজকার বিজ্ঞানের বা ব্যবসায় বাণিজ্যের যুগে এতে কোন কাজ হ'তে পারে না। কিন্তু এরূপ এমন ফার্ণেস এদেশে এখনও দেখা যায়।

টাটার এত বিরাট কারখানা হয়ত অনেকেই দেখেছেন। অতদূর থেকে দেখা যায় আকাশ মেঘে মেঘময় কালো কালো হ'য়ে গেছে। এই ঘন কৃষ্ণ ঘনীভূত মেঘ আসলে কিন্তু মেঘই না। তা পুঞ্জীভূত ধোঁয়া—টাটার কারখানার অভ্রভেদী ধূমনির্গমী চিমনীসমূহ হ'তে উদ্গারিত হচ্ছে।

রজনীতে এ দৃশ্য আরও মনোহর শোভা ধারণ করে, চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য আলোকমালা, উঁচু নীচু পাহাড় দেশে মালার মত রূপ ধারণ করে। এখানে ওখানে নানা কারকার্য্যে আগুনের ফুলকী উড়ে তুবড়ী ও তারা বাজীর শোভা দেয়। গগনস্পর্শী চিমনির মুখ দিয়ে অবিরত আগুনের হল্কা, রামায়ণের রাবণের চিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে আগুনের নির্ব্বাণ নেই। কারখানার মধ্যে বৈদ্যুতিক ও চুম্বকশক্তির সাহায্যে বিরাট বিরাট এক মণ বা আধ মণ লৌহ গোলাগুলি উপর থেকে পড়ে রাশীকৃত পুরাণো লোহার টুকরো ভাঙ্গছে—সেখানে গেলে রামায়ণের "ভরতের গোলা"র কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। লৌহ মল বা লোহার গাদ (লোহা তৈরীর পর যা অবশিষ্ট থাকে) যখন ফেলে দেওয়া হয় তখন সমস্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। রাত্রিতে সে দৃশ্য অতি সুন্দর। ৫০/৬০ মাইল দূর থেকেও সে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। সেই উত্তপ্ত লৌহ মল যখন গাড়ী করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয় তখন সেই অগ্নিময় গলন্ত পদার্থ একটী অগ্নিময়ী নদীর মত হু হু করে গড়িয়ে যায়, আর তারই আভা আকাশময় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পূর্ব্বোক্তরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। তখনকার প্রাচীন যুগে লোহা তৈরী হ'ত এক ভাবে, আর এখন হয় এই ভাবে। সে লোহা থেকে আবার কত রকম কত কি তৈরী হচ্ছে তার আলোচনার স্থান ও কাল আজ নয়।

মহাদেবী



শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

চরিত্র—

মহাদেবী (লজ্জা)

সন্ধ্যা ...

বকুলিকা ...

ধাত্রী ...

......পুরনারীগণ

মহীপাল ..

রামপাল . .

শূরপাল ..

বোধিদেব ...

মথনদেব ...

ইন্দ্রবর্ম্মা ...

রুদ্রদমন ...

...অমাত্যবর্গ, সেবারত ব্রাহ্মণগণ, নাগরিকগণ প্রভৃতি।

আভাস—

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে পাল-বংশের শাসনকালে, মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালের সময়ে, ভারত রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে ও শিল্পে যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয়···আন্দাজ একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করেন—অত্যাচার উপদ্রব ও শোষণে তিনি সমগ্র দেশের শ্রদ্ধা হারাইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামপাল বীর ও সকলের প্রিয় ছিলেন। রামপাল শৈশবে মাতৃহারা হইলে, পুত্রাধিক স্নেহে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া মহাদেবী তাঁহাকে পালন করেন। লজ্জাদেবী মহীপালের পট্ট-মহিষী।···মহীপাল রামপালকে শত্রু মনে করেন কিন্তু তাঁহার স্ত্রী দেবরকে দেবচরিত্র বলিয়া জানেন। দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ও ত্যাগ এই নাটিকার প্রতিপাদ্য।··ইতিহাসে রামপাল রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের সহিত তুলনীয় হইয়াছেন, যিনি পরে সিংহাসনে বসিয়া নিজপুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া ন্যায় বিচারের জ্বলন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই জীবনের একটা দিক ইহাতে আছে। সঃ।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

* * * *

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজবাটী মধ্যস্থ সুবৃহৎ দেবায়তন—
মন্দিরমধ্যে পূজারতা মহাদেবী, সম্মুখে পার্শ্বে পূজা উপাচার, মন্দির সম্মুখে
দেবসেবক ব্রাহ্মণগণের কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ হস্তে গীত

গীত

জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর, জয় জয় জয় শঙ্কর হে।
করুণাময় বিভো করুণা বিতর হে—
ত্রিপুর-নাশন পিনাকধারী বৃষভ-বাহন শ্মশানচারী,
ভক্তবরপ্রদ ভবভয়হারী, মঙ্গলময় শিব মঙ্গল কর হে।
শুভ্র জটাজুটে জাহ্নবী উচ্ছলে, ললাট-পটে শিশু-শশি উজ্জ্বলে,
ত্রিলোক-পূজ্য পুণ্য চরণতলে, প্রসাদ মাগে আজি দেবতা নর হে।

মহাদেবী

পূজান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে উত্থিত হইয়া করযোড়ে

দেবাদিদেব! স্বামীকে আমার সুমতি দান করো, রাজার পাপে যেন রাজ্য ধ্বংস না হয়।

উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, দেবসেবকগণ ভিতরে প্রবেশ করিল
স্তম্ভের অন্তরালে কনিষ্ঠ রাজকুমার রামপাল দেব এক গাছি মল্লিকা ফুলের মালা
হাতে লইয়া যেন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন

রামপাল

স্বগত

ঐ যে পট্টমহাদেবীর পূজা শেষ হ'য়ে গেছে, এই বেলা দিইগে'।

মহাদেবী

আত্মগত

কতদিন হ'য়ে গেল দেখা পাইনি। কিন্তু কেন এ চঞ্চলতা? তিনি শারীরিক কুশলে আছেন, আমার পক্ষে এই সংবাদই যথেষ্ট।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রামপাল

নিকটে আসিয়া

আচ্ছা, আমার গাঁথা এ-মালা আপনার ঠাকুরকে যদি পরান, কিছু দোষ হবে? আমি খুব শুদ্ধাচারে ফুল তুলেছি।

মহাদেবী

সবিস্ময়ে

দোষ কেন হবে ভাই? ও-কথা কেন ব'লছো মহাকুমার?

রামপাল

আমি যে বৌদ্ধ আর আপনার দেবতা যে হিন্দু।

লজ্জাদেবী

রামপালের হাত ধরিয়া

আহা কি বিচারশক্তি গো এই বয়েসে। দেবতার বুঝি আবার জাত আছে? না ভাই! তা' নয়; আচার শুদ্ধ রাখলেই সবার ফুল নেওয়া যায়। দাওতো ভাইটী! তোমার মালা আমার ঠাকুরকে পরিয়ে দিয়ে আসিগে, তোমার গাঁথা মালা পেলে আমার ঠাকুর খুব খুশী হ'বেন। তিনি যে তোমায় বড্ড ভালবাসেন তা' বুঝি তুমি জানো না মহাকুমার?

রামপাল

মালা দিয়া নিম্নস্বরে

দেখুন, এই মালাটা দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে বড়দা'র গলায় পরিয়ে দিতে হ'বে কিন্তু,—বুঝলেন?

লজ্জাদেবী

সহাস্যে

কেন ভাই? তোমার বড়দা'র গলায় হঠাৎ আবার আজ মালা পরাতে যাব কেন বলত? একবার তো সে কাজ হয়েই গেছে।

দীর্ঘ নিশ্বাস

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রামপাল

কাল মহামাত্যের বাড়ী পুরাণ-কথা হচ্ছিল, তিনি বল্লেন—'দেবতার প্রসন্নতা হ'লে জগতে এমন কোন অঘটনই নাই যা' ঘটতে পারে না; দেবতার প্রসাদী ক'রে এই মালাটা যদি আপনি তার গলায় পরিয়ে দেন, নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে খুব যত্ন ক'রবেন—একটী দিনও আর বক্‌বেন না, -

লজ্জাদেবী

গাঢ় স্বরে

মহাদেব তোমার কল্যাণ করুণ, মহাকুমার। বৎস, চিরজীবী হ'য়ে অ-সপত্ন-ভূমণ্ডলের অধীশ্বর হও, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের মত তোমারও যশ-সূর্য্য যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে সমুজ্জ্বল-জ্যোতি বিকীর্ণ করুক।

রামপাল

সলজ্জ পদধূলি লইয়া

দেবেন কিন্তু পরিয়ে, ভুলবেন না ......

ঐ যা'! রাজাধিরাজ আসছেন যে! আমি চল্লাম।

প্রস্থান—

লজ্জাদেবী

বালক! তুমি এই স্বার্থভরা ধরণীর অনেক, অনেক উৰ্দ্ধে—অভাগীকে এত ভালবাস বাছা আমার!

রাজাধিরাজ মহীপাল দেবের প্রবেশ

মহীপাল

হাতের মালা যে হাতেই র'য়ে গেল মহাদেবি! পরাবার অবসর বুঝি হ'লো না? আচ্ছা আচ্ছা বেশী দেরী হবে না, কাজ আমার সামান্য, কথাটা এই—ভূতপূর্ব্বা পট্ট-মহাদেবীর অলঙ্কার-পেটিকাটী রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করবার জন্য তোমায় সংবাদ পাঠিয়েছিলেম, তুমি নাকি ব'লেছ, সে অলঙ্কারে এখন তোমার অধিকার,—তা' তুমিই রক্ষা ক'রবে—কিন্তু আমার আদেশ সেগুলি রাজভাণ্ডারে রক্ষা করা হোক্।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

লজ্জাদেবী

সেগুলি তো পূর্ব্বে বড়মার নিজের কাছেই থাক্‌তো।

মহীপাল

হাসিয়া

ওঃ। তর্ক কর্‌চো? করো, করো, তর্কে আমায় পরাস্ত ক'রতে পারবে না, ঐ শাস্ত্রটা আমি ভাল ক'রেই পড়ে রেখেছি—তখন থাক্‌তো না, এখন থাক্‌বে। তোমার কিছু ব'লবার আছে?

লজ্জাদেবী

না।

মহীপাল

যাক্, তাহ'লে তর্কে হার স্বীকার ক'রেছ। দেখ, যাবার বেলা একটা উপদেশও এইসঙ্গে দিয়ে রেখে যাই,—রামপালকে শূরপালের সঙ্গে নগরে পাঠাতে চেয়েছিলেম, তুমি মহামন্ত্রীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তার প্রতিবাদ ক'রেছিলে, মনে পড়ে? এখন আমার কথা এই যে—তুমি ওকে নিয়েই সন্তুষ্ট থেকো, আমায় কখনও চেও না।

মহাদেবী

শান্তস্বরে

আপনাকে ত' আমি চেয়ে কোনদিন পাইনি।

মহীপাল

সবিদ্রূপ উচ্চ হাস্যে

ও। তারই প্রতিশোধেই বুঝি আমার পরম শত্রুর সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা?

মহাদেবী

অনুত্তেজিত কণ্ঠে

রাজাধিরাজ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনার আরোপিত পরিবাদ দু'টীই ভিত্তিহীন।

মহীপাল

সক্রোধে

কোন্ কথা আমার ভিত্তিহীন মহাদেবি?

লজ্জাদেবী

বিনম্র স্বরে

মহাকুমার রামপাল দেব আপনার পরম শত্রু নন, এবং ঐ পুত্রবৎ স্নেহাস্পদ বালকের প্রতি আমার বাৎসল্য-স্নেহের মধ্যে আপনার প্রতি প্রতিশোধ-ব্যঞ্জক কোন ভাবই নিহিত নেই। আর আপনিও যে তা' জানেন না তা' নয়।

মহীপাল

ক্রোধে জ্বলিয়া

মহাদেবি! তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী, নতুবা রামপাল আমার শত্রু নয়, একথা আর কেউ উচ্চারণ ক'রলে আমি তার জিভ্ কেটে ফেলতে আদেশ দিতেম!—রামপাল আমার শুধু শত্রু নয়,—মহাশত্রু। সাম্রাজ্য-সুদ্ধ লোক তার পক্ষপাতী কেন? তার কুটিল দুরভিসন্ধির ফলে। বরেন্দ্রীর সিংহাসন অধিকার ক'রবার চেষ্টা সে ক'রবে না তুমি ভাবো? আর তুমিই তাকে তা'তে প্রশ্রয় দিচ্চো! তুমি নিশ্চিত জেনে রেখো মহাদেবি! আমি যদি তাকে না মারি, একদিন সে আমায় মারবে।

লজ্জাদেবী

আর্ত্তস্বরে

মহারাজাধিরাজ! উঃ! কি পাষাণ আপনি!

মহীপাল

নির্দ্দয় কণ্ঠে হাসিয়া

হয় স্বামীর ছিন্ন শির,—না হয় প্রিয় বন্ধুর—কি তোমার অভিপ্রেত, অবসরকালে ভেবে দেখো।

প্রস্থান—

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দূরে মহাবিহার হইতে পূজা শেষে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

অদূরস্থ দেবালয় হইতে ঘণ্টা কাঁসরের শব্দ সহিত উত্থিত হইল—

জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর, জয় জয় জয় শঙ্কর হে।

মহাদেবী

ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আর্ত্তশ্বাসে

হায় প্রভো! মানুষের মনটাকে এত ক্ষুদ্র কেন ক'রেছিলে দেব? দীপ ঊর্দ্ধ শিখায় জ্বলে, ধূপ উপরেই গন্ধ বিলায়, ফুল তার সৌরভের ডালি ঊর্দ্ধলোকে প্রেরণ করে, শুধু মানুষই কি নদী-স্রোতের মত নীচুদিকে তার গতি-পথ খুঁজে বেড়াবে? না, না, নাথ! এই হীনতার প্রবৃত্তি তার দূর ক'রে কেড়ে নাও। দাও তাকে মহত্ত্বের, ত্যাগের, উদারতার ঊর্দ্ধচরণশীল উন্নত চিত্ত, নতুবা এই বিশ্ব-রচনা যে তোমার নিরর্থক হ'য়ে যাবে।

রামপালের পুনঃ প্রবেশ

রামপাল

পট্টমহাদেবি! আপনি এখনও এখানে এমন ক'রে বসে রয়েছেন কেন বলুন ত'? বড়দা'—মহারাজাধিরাজ বুঝি আপনাকে আজও আবার কটুকথা ব'লে গেছেন? হে সুগত! ওঁ-কে সুমতি দাও।

মহাদেবী

মুখ তুলিয়া গাঢ়স্বরে

মহাকুমার! আমার একটী অনুরোধ রাখবে ভাই?

রামপাল

বিস্মিতভাবে

আপনার দাসানুদাসকে কি আদেশ ক'রবেন বলুন না, মহাদেবি!

মহাদেবী

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

তোমার পক্ষে যতই লোভনীয় বা প্রার্থনীয়ই হোক্, কোন অবস্থাতেই তুমি তোমার বড ভাই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবে না,—এই অঙ্গীকারটী আমার কাছে করো,—বল প্রতিজ্ঞা ক'রলে ?

রামপাল

স্মিতমুখে মহাদেবীর চরণ স্পর্শপূর্ব্বক

হ্যাঁ, ক'রলাম। কিন্তু আমায় প্রতিজ্ঞা না করালেও আমি কখন তা' ক'রতাম না—তিনি যে আপনার স্বামী।

মহাদেবী

রুদ্ধস্বরে মাথায় হাত দিয়া

বৎস। চিরজীবী এবং চিরজয়ী হয়ো, কোন অমঙ্গল যেন কোনদিন তোমার কেশ-স্পর্শ ক'রতে না পারে।

উভয়ের প্রস্থান

* * * *

স্থান—সমুদ্রতট—সমুদ্রতীর

মথনদেব, বোধিদেব ও রামপাল।

মথনদেব

তোমার সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত আসবার অর্থ ই আমার এই যে তোমায় তোমার নিজের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দেওয়া, কিন্তু কি যে তোমার নির্ব্বুদ্ধি অথবা দুর্ব্বুদ্ধি,—কিছুতেই তুমি আমার সুপরামর্শ নিলে না। এর জন্য একদিন না একদিন তোমায় অনুতাপ করতে হবে রামপাল। তোমাদের ভাই-তিনজনের মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ, একথা হয়ত তুমি ছাড়া বরেন্দ্রীর আর সমস্ত লোকেই জানে। তুমি যদি রাজা হ'তে চাও, সমস্ত বরেন্দ্রীই তোমার পক্ষাবলম্বন ক'রবে তা'তে একটুও সন্দেহ নেই। তার উপর 'অঙ্গ' তো তোমার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আছে। এখনও ভেবে দেখ রামপাল! এরপর হয়ত আর এ সুযোগ পাবে না।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রামপাল

ম্লান মুখে

কিন্তু মামা! আমার যতই ক্ষতি হয় হোক, মহাদেবীর স্বামীর আমি অণুমাত্র ক্ষতি ক'রতে পারব না।

মথনদেব

চিরদিনটা এই রকম ছন্নছাড়া হয়েই তাহলে কাটিয়ে যাবে? তিনিই তবে তোমার সমস্ত উন্নতি-পথের অন্তরায় হ'য়ে রইলেন? তাঁর স্নেহই তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় আপদ হ'লো? ভাগ্য তোমার!

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া

যেদিন পরাজিত কর্ণাট-কন্যাকে তোমার বাপ তাঁদের মধ্যের চির-শত্রুতার অবসান চেষ্টায় বিবাহ করেন, যেদিন আমার ভগ্নী ভাগ্যদেবীর উপরে দ্বিতীয়া মহিষী যৌবনশ্রীর আসন বিস্তৃত হয়, আর যেদিন সমস্ত বরেন্দ্রী-প্রজার দুর্ভাগ্যক্রমে পট্টমহাদেবীর পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়া মহিষী প্রথম পুত্রের জননী হ'ন, সেইদিন আমরা এই আশঙ্কাই ক'রে এসেছিলেম যে, মহাসম্মানিত পাল-সাম্রাজ্যের এইবার বুঝি পতনকাল সন্নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসছে! কিন্তু উপায় কি? বিধিলিপিই বলবৎ! যাই হোক, এখন তা'হলে আমি বিদায় নিচ্চি রামপাল! যদি কোনদিন তোমার এই ভ্রান্ত অন্ধস্নেহে অবসাদ দেখা দেয়, তখনি আমার উপদেশ স্মরণ করো।

প্রস্থান—

রামপাল

প্রণামপূর্ব্বক

আশীর্ব্বাদ করুন, সেদিন যেন এ জীবনে কোনদিনই না আসে। বোধিদেব! মাতুল আমার পরে' বিরক্ত হ'য়ে গেলেন। আমার পরে' তাঁর অগাধ স্নেহ, এমন অভাগা আমি যে তাঁকে প্রসন্ন করতে পারলেম না।

অদূরে উপবিষ্টা সন্ধ্যার প্রতি চাহিয়া রহিলেন

স্বগতঃ

কে এই অতুলনা রূপসি! এত দেশে এত দেখলেম এমন শান্ত স্নিগ্ধ রূপ তো কোথাও দেখলেম না!

* * * *

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সন্ধ্যার ধাত্রী

প্রবিষ্ট হইয়া

তুমি এইখানে এসে ব'সে আছ সন্ধ্যা। আর আমি সাত-পৃথিবী তোমায় খুঁজে ফিরচি! আচ্ছা, তুমি অবোধ মেয়ে সন্ধ্যা। এতেও এত আপত্তি করচো কি রকম?—শুনচো রাজচক্রবর্ত্তীর মহিষী হবে, ছি ছি—এতটুকু বুদ্ধি কি তোমার নেই মা? এস, শুভযাত্রার কাল উপস্থিত-প্রায়, যাত্রার উদ্যোগ করিগে এস।

সন্ধ্যা

নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল

ধাত্রী

জ্যোতিষী তোমার করকোষ্ঠী দেখে তোমার জন্মপত্রিকার পুনরুক্তি করাতেই না তোমার বাবা আর এ বিষয়ে সন্দেহ করতে পারলেন না। মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে তোমার বিবাহকাল একান্ত সমীপাগত হয়েছে, তিনি প্রত্যক্ষ তোমায় দেখে নিজে হ'তে আগ্রহ জানিয়ে শীঘ্রই বিবাহ করবেন এবং তুমি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়তমা হবে। এখন আমরা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন যাত্রা না করলে এসব ঘটনা কেমন করে ঘটবে বল? মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক মহীপালদেবই যে এই আমাদের ঈপ্সিত মহারাজ-চক্রবর্ত্তী তা'তে আর সংশয় কি? এ অবস্থায় তোমার আপত্তি আমরা শুনতে পারি নে'।

সন্ধ্যা

কাতর-স্বরে

তাঁর একটী মহিষী জীবিতা আছেন, তা' ভিন্ন তিনি লোক যে ভাল নন সেও আমি শুনেছি, আমায় আপনারা বরং হত্যা করুন, তবু -

কাঁদিয়া ফেলিল—

ধাত্রী

সরোষে

মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব লোক ভাল নন! এই এক ফোঁটা কচি মেয়ে, এ বলে কি? ছোট মুখে বড় কথা! আজকালের মেয়েরা এ হ'লো কি,—আঁ্যা! নিজের বিয়ের কথা নিজে বলতে লজ্জা বোধ করে না। এ বিয়ে হ'লে যে তোর চৌদ্দ-

পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, তা' জানিস্? এমন অসংলগ্ন কথা আর মুখেও এনো না। এ শুন্‌লে তোমার বাপ পট্টনায়ক বসুভদ্র আর কখন তোমার মুখদর্শনও করবেন না। এখন এস বাড়ী যাই।

সন্ধ্যাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া প্রস্থান

বোধিদেব

সখে। দ্রষ্টব্য চলে গেলেও কি দৃষ্টি তার সঙ্গী হ'য়ে চক্ষু ছেড়ে চলে যায়? তোমার অবস্থাটা এখন 'ইন্দুমতী'-স্বয়ম্বরের রাজাদের মত "সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ"—গোছ হ'য়ে পড়েছে দেখছি।

রামপাল

মৃদুহাস্যে

আমার প্রিয়তম সখাটী যদি 'ব্রহ্মসূত্রধারী' না হ'তেন তা হ'লে তাঁর দৃষ্টির বল বুঝতে পারতেন।

বোধিদেব

সহাস্যে

বটে। দৃষ্টি বুঝি আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের ভেদ-বুদ্ধিটুকুরও হিসাব-রক্ষা ক'রে চলে? তবে তো সে মহা-বিবেকী দেখছি। কিন্তু কাব্য নাটকে ঠিক এমন সুবিবেকী দৃষ্টি-বিনিময়-কাহিনীর কথা তো কই লেখে না?

রামপাল

সলজ্জে

দৃষ্টিকে যে প্রেরণা দিচ্ছে আমি তারই কথা ব'লেছিলেম! কিন্তু এ'ও বলি সখা! কাব্য-নাটকে প্রায়ই দেখা যায়, নিজ নিজ জাতি-গোত্র-অবস্থা এ সমস্তই স্থির রেখে নায়ক-নায়িকারা দৃষ্টি-বিনিময় ক'রে থাকেন। ভাস বিরচিত একটী নাটকে এর ব্যতিক্রম থাকলেও কদাচিৎ একে অতিক্রম করা দেখা যায় মাত্র। তাও শেষ পৃষ্ঠায় রহস্যভেদে সমস্তই সামঞ্জস্য হ'য়ে দাঁড়ায়। যথা রত্নাবলী, মালবিকা ইত্যাদি—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বোধিদেব

হাসিয়া

বেশ, এস তাহ'লে আমরা এখন বিবেক-বুদ্ধি-প্রণোদিত সম্ভাবা-বিষয়েই কথা কই। শুনলে ত', ওই সুন্দরা-মেয়েটীর কোন মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বিবাহ হবে, জ্যোতিষীর গণনায় এটা স্থির হ'য়ে গেছে। আবার দৃষ্টিকে যিনি প্রেরণা দান ক'রছেন, তিনিও নাকি সম্পূর্ণরূপেই উৎসুক আছেন এও জানা যাচ্ছে। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তার আত্মকর্ত্তব্য-সম্পাদনে আর অযথা বিলম্ব ঘটানো তো সঙ্গত হয় না। অতএব যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে ফেলা যাক না কেন?

রামপাল

সহসা গম্ভীর ও বিষাদিত হইয়া—

বোধিদেব। একি মিথ্যা জল্পনা? জান না কি, আমার পিতৃরাজ্যে আমার স্থান একটা পথের ভিক্ষুকেরও নীচে এবং জীবনও আমার বৃক্ষছায়ার মতই প্রতিক্ষণে অনিশ্চিত। তবে কেন রাজ-চক্রবর্ত্তীর মহিষী-পদপ্রাপ্তিরূপ সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতীর সঙ্গে আমার মত গৃহহীন অভাগার মিলনের স্বপ্ন দেখ্‌ছো?

বোধিদেব

স্মিতহাস্যে

আরে, এঘটনায় তোমার ভবিষ্যতেরও ত', একটা আভাষ পাওয়া যেতে পারবে? যদি ঐ কন্যা যথার্থই রাজরাজেশ্বরীর সৌভাগ্য নিয়েই জন্মে থাকে, তোমার ভাগ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হ'লে ও-র ভাগ্যফলের ত' আর পরিবর্ত্তন হবে না? বরঞ্চ 'স্ত্রীভাগ্যে ধন' এই নীতিতে তোমার ভাগ্যটাকেই সৌভাগ্যের পথে টেনে আনবে।

রামপাল

সন্দিগ্ধ স্বরে

কিন্তু বিবাহ ত' আর তোমার আমার ইচ্ছায় ঘটবার ব্যাপার নয় বন্ধু! তুমি পাগল বোধিদেব। যারা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-পতির হাতে মেয়ে দে'বার জন্য যাত্রা ক'রছে, তারা

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

সেই কন্যারত্ন সমর্পণ ক'রে দেবে একটা পথের ভিক্ষুককে? না না কাজ নেই সখা। অপ্রাপ্য বস্তুকে লোভ করা রামপালের স্বভাব নয়।—তবে দুঃখ এই যে, মহাদেবী—মা আমার সপত্নী যন্ত্রণার দুঃখটুকু হ'তেও রক্ষা পেলেন না। শুনেছি আমার নিজের মা এই দুঃখ বড় শোচনীয়ভাবেই পেয়েছিলেন, একদিনের জন্যও সুখী হন নাই। হয়ত ইনিও শেষ শান্তিটুকু—

বোধিদেব

দেখ সখা। গীতায় শ্রীভগবান ব'লেছেন, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে', —আমাদের কর্ম্মেই অধিকার আছে,— অতএব কর্ম্ম ক'রেই দেখা যাব —ফল না পাই, নাই পেলাম— অন্ততঃ মহাদেবীর জন্যও ত' এ প্রচেষ্টা তোমার করা উচিত?

রামপাল

সন্দিগ্ধভাবে

কিন্তু কেমন করে জানাবে তারা কে?

বোধিদেব

উচ্চহাস্যে

হায় ক্ষত্রিয়! বৃথাই কি দর্ভপানী—কেদার মিশ্র প্রভৃতির বংশে জন্মগ্রহণ করেছি? একদিন কি আমারও নামে রাজকবি তোমার মহামাত্য সম্পর্কে আমার পূর্ব্বপুরুষদের মত শ্লোক রচনা করে বলতে বাধ্য হবেন না—

রামপাল

বাধা দিয়া

আঃ! কি প্রলাপ বক্‌ছো বোধি! যা অসম্ভব তা নিয়ে বৃথা পরিহাস কেন? যা হোক, এক্ষেত্রে বৃহস্পতি-নিন্দিত মন্ত্রিকুল-ধুরন্ধর কোন মন্ত্রণা কুশলতার পরিচয় দিলেন, তা তো বুঝ্‌লেম না?

বোধিদেব

কেমন ক'রে বুঝ্‌বে? তাই যদি ক্ষাত্রবুদ্ধিতে প্রবেশ করবে, তাহ'লে কি আর ধর্ম্মপাল দেবপালের মত পৃথিবী-জয়ী মহা-মহারাজারা উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্রাহ্মণ

দর্ভপানী . . . অবসরের প্রতীক্ষায় তাদের দ্বারে 'সচকিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন? না, প্রশস্তিকার রাজকবি বিষ্ণুভদ্র এমন কথাটারই উল্লেখ ক'রতে ভরসা করতেন? আমার কিন্তু সন্দেহ হয় রামপাল। তুমি হয়ত আমার কাছে তোমার পুর্ব্বপুরুষের মত 'সচকিতভাবে' থাকতে পারবে না। না।। তোমার সঙ্গে এতখানি বন্ধুত্ব করাটা আমার আদৌ সঙ্গত হয় নি।

রামপাল

অসহিষ্ণুতার সহিত অথচ স্মিতমুখে

আচ্ছা ভাই, ভবিষ্যতে স একদিন যখন আমি না হয় 'সচকিত' হয়েও তোমার সামনে আসন গ্রহণ ক'রব না, কিন্তু সে সব আকাশ-কুসুমের মালা গাঁথা বন্ধ রেখে এখন কি উপায়ে এদের সন্ধান নেওয়া যায় তাই বল দেখি? নিজের জন্য নহে, মহাদেবীর জন্য মান মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়েও আমি এ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বো। আমায় দেখতেই হবে।

বোধিদেব

হাসিয়া

সন্ধান আমি নিয়েছি। এ মেয়েটীর নাম সন্ধ্যা—এর পিতা পট্টনায়ক বসুভদ্র। আচ্ছা এস এখন যাওয়া যাক।

উভয়ের প্রস্থান

* * * *

রাজপথ, অশ্বারোহণে রামপাল দেব

রামপাল

পাল-সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। অন্যায় অত্যাচার অবিচারে সমস্ত প্রজা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তারা নায়ক চায়,—বিদ্রোহের আগুন শীঘ্রই জ্বলে উঠ্‌বে তা'ও দেখ্‌তে পাচ্ছি—কিন্তু আমি নিরুপায়। সেই করে, কত পূর্ব্বে—কৈশোরে একদিন অবলীলা-ক্রমে যে স্বাধীনতাকে নিজে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়ে দিয়েছি, আজ আর তাকে ফিরিয়ে নিতে রামপালের সাধ্যে কুলিয়ে উঠ্‌বে না। না, অসম্ভব। সমস্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন চোখের সাম্‌নে ধ্বংস হ'য়ে যাবে, তবু রামপাল থাক্‌বে নিশ্চল স্থাণুর মত। নিরীহ পিতৃ প্রজার রক্তে যদি এ রাজ্যের রাজপথ সিক্ত হ'য়ে যায় তবু রামপালের কটিবদ্ধ এই ক্রীড়া-তরবারি রক্তলেখা পরিশূন্যই থেকে যাবে। সে একটা জড় পিণ্ড মাত্র,—মানুষ নয়।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

একদল বিদ্রোহোদ্ধত তরুণ যুবকের প্রবেশ

দলপতি

এই যে মহাকুমার রামপাল দেব। আপনাকেই আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি। রাজ্যের সমস্ত সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়ে থাক্‌বেন? পুরাতন মহামাত্য বারাণসীবাসী হ'বার পর থেকেই মহীপালদেব যথেচ্ছাচারের স্রোত বহাতে আর বাকি রাখ্‌ছেন না! মহা মহা জ্ঞানী ব্যক্তিদের অর্থের জন্য অযথা পীড়ন, এমন কি ঘোরতর সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ-কন্যারা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে অসম্মান লাভ ক'রতেও বাধ্য হচ্ছেন। এ সব অসহ্য। মানুষের রক্ত যার গায়ে আছে সে এ-অত্যাচার সহ্য ক'রবে না। আমরা মহীপালদেবের উচ্ছেদ চাই, আসুন, মহাকুমার

বহুকণ্ঠ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া উঠিল

আমরা মহীপালের উচ্ছেদ চাই রামপালদেব।

আপনি এই বিদ্রোহের অধিনায়ক হ'ন, আপনিই মহাসম্মানিত পাল-সাম্রাজ্যের যোগ্য অধিকারী, আপনিই আমাদের অভিষিক্ত সম্রাট।

রামপাল

ক্ষীণকণ্ঠে

ক্ষমা করুন, ইন্দ্রবর্ম্মা! আমি নিরুপায়।

দলপতি এবং অনেকে

সবিস্ময়ে

নিরুপায়!—অর্থ?—নীরব কেন? একি অহেতুকী ভ্রাতৃভক্তি? আপনি কি জানেন না, আপনার সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ বড়-ভাই-এর সব চেয়ে বড় লোভ আছে আপনার ওই মাথাটারই উপর? বল্‌তে চান আপনি এ কথায় সন্দেহ রাখেন? —বেশ্,—বলুন?

রামপাল

তেমনই দুর্ব্বল-কণ্ঠে

না।

দলপতি

সোৎসাহে

তবে এ সৌভ্রাত্রের দুর্ব্বলতায় দেশের রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'রতে বসেছেন কেন? অর্জ্জুনের মত এই দুর্ব্বল-জনোচিত মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে শ্রীভগবান না হ'লেও আমি জোর গলায় হেঁকে বলছি— "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ"— আপনার নিপীড়িত পিতৃরাজ্য আপনাকে কাতর কণ্ঠে আহ্বান জানাচ্ছে, কিসের জন্য তার সেই করুণ আহ্বানকে আপনি প্রত্যাখ্যান ক'রছেন মহাকুমার? পূর্ব্বেও অনেকবারই বলেছি, আবার আজও ফিরে বলছি, যদি পাল-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে চান, দ্বিধা ছেড়ে চলে আসুন, আর সময় নেই, দেরি করবেন না; সমস্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন আজ অন্তরে অন্তরে রাজদ্রোহী, আপনি না এলেও এ-বিদ্রোহ বন্ধ থাকবে না, অনর্থক আপনার পিতৃরাজ্য হস্তান্তরিত হ'য়ে যাবে। এ আমি আপনাকে নিশ্চিত ক'রে জানিয়ে যাচ্ছি। আমাদের মধ্যের প্রায় অর্দ্ধেক লোক দিব্যকের পক্ষভুক্ত, তবে দিব্যক নিজে—আপনি যদি যোগ দেন, আমার বিশ্বাস, আপনার বিরুদ্ধতা ক'রবেন না। কোন্ কথা কি স্থির ক'রলেন বলুন?

রামপাল

গভীর পরিতপ্ত মর্ম্মভেদী স্বরে

আমি নিরুপায়।

দলপতি

গর্জ্জিয়া

ধিক্ ধিক্ মহাকুমার রামপালদেব! শত ধিক্—আপনাকে। আপনি শুধু কাপুরুষ নন, ক্লীব!—

সরোষে সদর্পে প্রস্থান

রামপাল

অশ্বপৃষ্ঠে অবসন্নবৎ

উঃ! কি ক'রেছ মহাদেবি! এর চেয়ে অসহায় মাতৃহীন পিতৃহীন শিশু রামপালকে যখন অঙ্কে তুলে নিয়েছিলে—নুন খাওয়াওনি কেন? সহস্রবার মৃত্যুর চেয়েও হীনতম হেয়তম জীবন-ধারণ ক'র্‌বার জন্যই কি তাকে তার বড়-ভাইয়ের শাণিত ছুরীর তলা

থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার এই উপায় স্থির ক'রেছিলে ? এ' কি ক'র্‌লে ? এ' কি ক'র্‌লে ? উঃ ! এর চেয়ে বড় অভিশাপ যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর ছিল না !—আমায় সেই মর্ম্মান্তিক অভিশাপ তুমি কেমন ক'রে দিলে ?

প্রস্থান

নেপথ্যে

মহারাজাধিরাজ দিব্যকের জয় !—মহীপালদেব ধ্বংস হোক্ !

*   *   *   *

সেদিন সাগরবেলায় সন্ধ্যাকে দেখার বৎসর মধ্যে রামপালের সহিত তাঁহার বিবাহ
হইয়াছে, তিনি রাজবধূরূপে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ অন্তঃপুরে স্থান পাইয়াছেন,
মহাদেবী তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন।.. এদিকে মহীপালের
অত্যাচারে প্রজারা ও সামন্ত রাজারা পালের শেষ
উচ্ছেদ কামনা করিতে লাগিল। সেই
সময়ে একদিন............

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ অন্তঃপুর

সন্ধ্যা ও বকুলিকা

বকুল—গীত

সন্ধ্যা তারা হাসে আকাশে,
ফুল পরিমল ভাসে বাতাসে
নদীজল ছল ছল, চন্দ্রিকা ঝলমল,
পাপিয়া গাহে গান কি আশে ?

আচ্ছা সন্ধ্যাদেবি ! এমন যে একটা গান শোনালেম, তা যেন মেয়ের এতটুকু গ্রাহ্যও হলো না ! কেন বলতো এত গুমোর ? অন্যদিন তো একটা গান শোনাবার জন্যে পাগল ক'রে মারা হয়। যাও, আমি রাগ করেছি।

সন্ধ্যা

আমার কিছু ভাল লাগছে না ভাই, আমার কেবলই মনে হচ্ছে কি যেন একটা মস্ত বড় অমঙ্গল আস্‌ছে। আজ সারাদিন আমার বাঁ-চোখ নেচেছে—এই এখনও আবার—

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বকুল

বাধা দিয়া

ঐ দেখ সুমঙ্গল-মূর্ত্তি আমাদের মহাকুমার আসছেন। উনি যার সহায়, অমঙ্গল তার কি ক'রবে শুনি? আমি ভাই চল্লেম।

প্রস্থান

রামপাল দেবের প্রবেশ

সন্ধ্যা

আজ আমরা সারাদিন তোমার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে বসেছিলেম, মহাদেবী তিনবার মহল্লিকাদের পাঠিয়ে তোমায় ডেকে পাঠালেন, কি হ'য়েছিল? এলে না কেন? তিনি বড্ড দুঃখিত হ'য়েছেন।

রামপাল

হ'য়ে থাকেন হয়েছেন, তাঁর মুখ দেখবার প্রবৃত্তি আমার নেই। আমার—মহাশত্রু না—তারও চেয়ে অনেক বড় শত্রু তিনি।

সন্ধ্যা

সাতঙ্কে

ছি ছি, কি বলছো তুমি? পাগল হ'য়ে গেছ'?

রামপাল

আশ্চর্য্য যে পাগল হ'য়ে যাইনি! তিনি যে আমার কত বড় শত্রু তা' যদি তুমি বুঝতে পারবে তাহ'লে আর আমার দুঃখ কি? ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজ-রক্ত তো তোমার গায়ে নেই, তুমি কেমন ক'রে বুঝবে পিতৃ-পিতামহের বংশ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য কত বড় উচ্চ মূল্য দিতে হয়। তুচ্ছ স্নেহ প্রেম তার কাছে কত কত ক্ষুদ্র। সেই বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা করতে কি বিপুল আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন। আর সে সব কথা না বুঝে যে আমায় তার কাছে চির দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে রেখে দিলে তার চেয়ে আমার বেশী শত্রু আর কোথায়? আর কে?

সন্ধ্যা

ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল

রামপাল

সখেদে

ভেবেছিলেম এ জন্মের মত পিতৃ-রাজ্যের লাভ ক্ষতির সঙ্গে যখন আমার কোন সম্পর্কই রইলো না, তখন সামান্য নাগরিক জীবনে পারিবারিক সুখে সুখী হ'বারই চেষ্টা করি। কিন্তু তা' হয় না সন্ধ্যা। তা' হয় না। আমি রাজপুত্র, আমার সর্ব্ব-সম্মানিত পিতৃ-সিংহাসনে ব'সে এক কুলাঙ্গার তাদের অম্লান যশোভাতি মসীলিপ্ত করছে—আমার পিতৃ-প্রজা সেই অত্যাচারীর অনীতিতে জর্জ্জরিত মর্ম্মাহত হ'য়ে এসে আমার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করছে—আর আমি, আমি কি করছি? আমি নিরুপায় আমি নীরব—আমি বধির! আমার পায়ে ধ'রে কাতর মিনতি করলেও না, আমায় জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ করলেও না—আমি স্থাণু—আমি অচল। উ। উঃ—কি অভিশপ্ত এ জীবন! কি দুঃসহ এ প্রাণ।—

সন্ধ্যা

সভয়ে

তুমি কি রাজদ্রোহী হ'তে চাও?

রামপাল

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া

রাজা দীর্ঘজীবী হোন,—তাঁর পরম শুভার্থিনী পত্নী এবং ভ্রাতৃবধূর শঙ্খ-সিন্দূর অক্ষয় হোক্। অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে দেশবাসীকে অত্যাচার মুক্ত ক'রবার মত সৌভাগ্য মাথায় নিয়ে এই হতভাগ্য রামপাল জন্মগ্রহণ করেনি। সেই ব্যভিচারী অনাচারীর পাদ-পূজক হ'য়েই তার এই দুর্ব্বহ জীবন তাকে বহন ক'রতে হবে। এর ব্যতিক্রম হবার নয়, হবার নয়।

সন্ধ্যা

কাঁদিয়া

নিশ্চয় তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে, আমি মহাদেবীকে বলিগে'

প্রস্থান

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

লজ্জাদেবী

প্রবেশ করিয়া

মহাকুমার! বলি ব্যাপারখানা কি বলতে পারো? চুলের টিকিটি ত' দেখ্‌তে পাওয়াই ভার হ'য়েছে। সারাদিন পরে এলে ত' ছোটোটাকে কি কতকগুলো ব'লেছ,— সে ত' কেঁদে হাট বাধাচ্ছে, এস দেখি তাকে ঠাণ্ডা ক'র্‌বে। তুমি ভাই বড্ড দুষ্টু হ'য়েছ আজকাল,—

রামপাল

গম্ভীর স্বরে

সমতটে লোনা জল খুব সস্তা

লজ্জাদেবী

হাসিয়া

আমার বাপের দেশের কল্যাণেও ত' লোনা জল মাগ্যি নয়। সত্যি, ক'দিন ধরে তোমার কি যেন একটা হ'য়েছে। আচ্ছা, ওকে তুমি কি ব'লে কাঁদালে? অমন নরম মননীতে ব্যথা দিতে প্রাণে বাজে না?

রামপাল

তেমনই স্বরে

যে কাঁদে তাকে কাঁদানো যায়, পাষাণ দিয়ে কেউ কি জল ঝরাতে পারে মহাদেবি!—

লজ্জাদেবী

স্মিত মুখে

অর্থাৎ আমি পাষাণী?—

রামপাল

উত্তেজনার সহিত

পাষাণী? তুমি তারও বেশী! অতি বড় নির্ম্মম না হ'লে তুমি আমায় সম্পূর্ণভাবে হাতে পেয়ে আমার এত বড় দুর্দ্দশা ঘটিয়ে রাখ্‌তে পারতে? আমি বিশ্ব-বিশ্রুত-কীর্ত্তি রাজরাজ্যেশ্বরের বংশধর, আজ তোমার হাতের একটা ক্ষুদ্র ক্রীড়নক হ'য়ে পড়ে আছি এ

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

কার নিষ্ঠুরতায়? এই যে সমস্ত দেশ জুড়ে অত্যাচারে পিষ্ট আমার পিতৃ-প্রজাবর্গ আর্ত্তনাদে পৃথিবীর বুক বিদীর্ণ ক'রছে, তাদের তীব্র অভিশাপ আকাশে গর্জ্জন ক'রে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'ধিক্ – ধিক্—রামপাল!'—আর আমি সেখান থেকে অন্তঃপুরে পালিয়ে এসে হাস্যে-রহস্যে জীবন যাপন ক'রছি!—এ কা'র হৃদয়-হীনতায় মহাদেবি!

লজ্জা

মস্মাহত ভাবে

মহাকুমার!

রামপাল

পাদ নিয়া সবেগে

ও অভিধানটা যে কত বড় মিথ্যা সে কথা তোমার চেয়ে বেশী ক'রে কেউ জানে না—মহাদেবি! ওটা তোমার মুখে সাজে না। মহাকুমার রামপালদেব তার মর্ম্মপীড়িত পিতৃ-প্রজার কাতর আবেদনে বধিরের মত নির্লিপ্ত থেকে, তাদের তীব্র নৈরাশ্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে তার পিতৃরাজ্য অন্য লোকের হাতে চলে যাচ্ছে জেনে ফিরে এসে—ফিরে এসে, উঃ! এ কি নিদারুণ অভিশপ্ত জীবন আমার তৈরী ক'রে দিলে মহাদেবি? সহস্রের ধিক্কৃত কর্ত্তব্যপালনের অসমর্থতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিচ্যুত, ভগ্নহৃদয় রামপালকে শুধু তার ভাইয়ের ছুরি থেকে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে দেখেই সুখী হ'তে পারবে, এমন কথা কেমন ক'রে তুমি ভাব্‌তে পেরেছিলে মহাদেবি? তার যে এতে কি হবে, সেকথাটা কি একটুই ভাবো নি?

সহজ কণ্ঠে

তুমি প্রতিজ্ঞামুক্ত রামপাল।

রামপাল

ক্ষণপরে

তা হয় না। আমি কি তোমার হাতের পাশা, যে এক চাল চালা হ'য়ে গেলে ফের ফিরিয়ে হাতে তুলে নে'বে? যে তীর তূণ হ'তে বেরিয়ে যায়, সে আর তূণীরে ফিরে এসে ঢুক্‌তে পারে না।

সরবাত্তমা

শ্রীব্রজমোহন দাশ

আহরিকা



কার নিষ্ঠুরতায়? এই যে সমস্ত দেশ জুড়ে অত্যাচারে পিষ্ট আমার পিতৃ-প্রজাবর্গ আর্ত্তনাদে পৃথিবীর বুক বিদ'র্ণ ক'রছে, তাদের তীব্র অভিশাপ আকাশে গর্জ্জন ক'রে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—'ধিক্—ধিক্—রামপাল!'—আর আমি সেখান থেকে অন্তঃপুরে পালিয়ে এসে হাস্যে-রহস্যে জীবন যাপন কর্‌ছি!—এ কা'র হৃদয়-হীনতায় মহাদেবি!

লজ্জা

মর্ম্মাহতভাবে

মহাকুমার!

রামপাল

বাধা দিয়া সবেগে

এ অভিধানটা যে কত বড় মিথ্যা সে কথা তোমার চেয়ে বেশী ক'রে কেউ জানে না—মহাদেবি! ওটা তোমার মুখে সাজে না। মহাকুমার রামপালদেব তার মর্ম্মপীড়িত পিতৃ-প্রজার কাতর আবেদনে বধিরের মত নির্লিপ্ত থেকে, তাদের তীব্র নৈরাশ্যে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে তার পিতৃরাজ্য অন্য লোকের হাতে চলে যাচ্ছে জেনে ফিরে এসে—ফিরে এসে, উঃ! এ কি নিদারুণ অভিশপ্ত জীবন আমার তৈরী ক'রে দিলে মহাদেবি? সহস্রের ধিক্কৃত কর্ত্তব্যপালনের অসমর্থতায় ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিচ্যুত, ভগ্নহৃদয় রামপালকে শুধু তার ভাইয়ের ছুরি থেকে প্রাণটুকু নিয়ে বেঁচে থাক্‌তে দেখেই সুখী হ'তে পারবে, এমন কথা কেমন ক'রে তুমি ভাব্‌তে পেরেছিলে মহাদেবি? তার যে এতে কি হবে, সেকথাটা কি একটুই ভাবো নি?

লজ্জা

সহজ কণ্ঠে

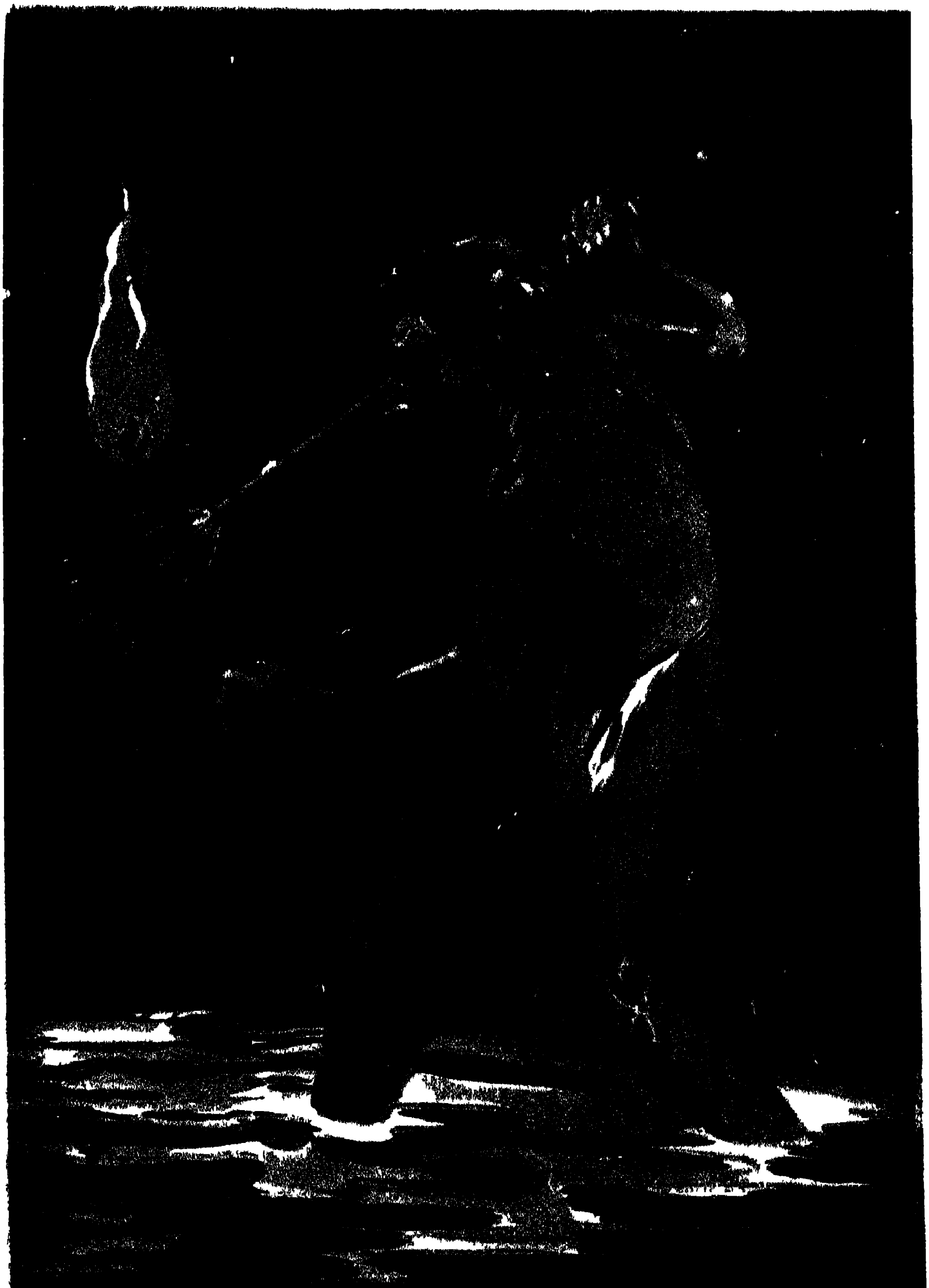
তুমি প্রতিজ্ঞামুক্ত রামপাল।

রামপাল

ক্ষণপরে

তা হয় না। আমি কি তোমার হাতের পাশা, যে এক চাল চালা হ'য়ে গেলে ফের ফিরিয়ে হাতে তুলে নে'বে? যে তীর তূণ হ'তে বেরিয়ে যায়, সে আর তূণীরে ফিরে এসে ঢুক্‌তে পারে না!

আহ্নিক.



আহ্বিক

লজ্জা

ভাল,—আমার মৃত্যুতে ত এর খণ্ডন হ'তে পারবে ?

রামপাল

চিন্তা করিয়া

তা' কি হয় ? হয় তাঁর - নয় আমার—এর একজনের মৃত্যু ব্যতীত এর আর কোন খণ্ডন নেই।

লজ্জা

অগ্নিময় কণ্ঠে

তবে তাই হোক, তোমাদেরই একজন মরুক।

রামপাল

অট্টহাস্যে

তাকে মারবার অধিকার যখন আমার হাতে তুমি থাকতে দাওনি, তখন এবার আমাকেই মরতে দাও। এমন নির্জ্জীব, নিষ্পন্দ থেকে পিতৃ-প্রজার অপমৃত্যু দেখা আমার আর সহ্য হ'চ্ছে না মহাদেবি।

লজ্জা

স্থিরচক্ষে চাহিয়া

না,—তোমার পিতৃ-প্রজাদের রক্ষা করবার অধিকার আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি, আমিই তোমায় তা' ফিরিয়ে দোব, মহাকুমার! এ বিদ্রোহের আমি হবো অধিনায়িকা—।

রামপাল

পদপ্রান্তে পড়িয়া

মহাদেবি! মা! আমায় ক্ষমা করো। তোমার অতি স্নেহের সাবধানতায় আজ আমার ধর্ম্মে আঘাত লেগেছে ব'লে, তোমার ধর্ম্ম থেকে তোমায় স্খলিত ক'রে তার প্রতিশোধ নে'বে—তোমার পালিত-সন্তান তত বড় হীন নয়। আমি জানি আমার নির্ম্মম পাষণ্ড জ্যেষ্ঠের পরে'ও তোমার ভালবাসার অন্ত নেই! সতী-ধর্ম্ম আর রাজ-ধর্ম্ম এক

নয়। যত বড় উচ্চ বা মহৎ সে ধর্ম্মই হোক—তোমার ধর্ম্ম তোমার স্বামীর শুভাকাঙ্ক্ষা। আমি আমার বা কারুর কোন স্বার্থের জন্য সে-ধর্ম্মে আঘাত দিতে দোব না। সীতা-সাবিত্রীর পাশে তোমার স্থান অটুট থাক। আমার এই ক্ষণিকের অভিমান পারো ত' ভুলে যেও মা আমার। অভাগাকে ক্ষমা করো।

দ্রুত প্রস্থান

লজ্জা

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া

বিশ্বনাথ। এ পাপের কি ক্ষমা আছে?

প্রস্থান

রাজসভা

মহারাজাধিরাজ মহীপাল দেব ও সভাসদগণ

মহীপাল

মহাপ্রতিহার রুদ্রদমন। মহাকুমার রামপালদেবকে সত্বর আমার আহ্বান জানাও।

রুদ্র

কৃতাঞ্জলিপুটে

যে আদেশ মহারাজাধিরাজ।

প্রস্থান

মহীপাল

জননায়ক ইন্দ্রবর্ম্মার প্রতি

বুঝেছি, এ সমস্তই আমার কনিষ্ঠের চক্রান্তের ফল। তিনিই আমার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের মনে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত ক'রে আমার সিংহাসনে নিজে বস্‌বার এই উদ্যোগ-পর্ব্ব ঘটাচ্ছেন। ভাল, তার প্রতিফল তিনি এখনই পাবেন। বস্তুতঃ সাম্রাজ্য খুব ভালই চলছে। মহাসেনানায়ক, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাপ্রতিহার, মহাকুমার অমাত্যবর্গ এস্থলে উপস্থিত সাম্রাজ্য-অধিনায়কবৃন্দ বুদ্ধ ভট্টারকের নাম নিয়ে কে ব'ল্‌তে পারেন যে, তিনি তাঁর নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা ক'র্‌ছেন? তা' যদি না করেন, তবে রাজ্যের অপালন বা কুপালন কেমন করে হ'তে পারে?

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

ইন্দ্রবর্ম্মা

মহাবাজাধিরাজ। চোবকে আপনি দিচ্ছেন নিজেব বিচার নিজে ক'র্‌তে?

মহীপাল

এই সব মহা মহা সম্মানিত সাম্রাজ্য-পবিচালকবৃন্দ হ'লেন চোর, আব কোথাকার কোন্ নাম-গোত্রহীন নাগবিক তোমবা, তোমবা হ'লে সাধু? আমার যা বল্‌বাব ছিল বলা হ'য়ে গেছে, এখন মহাপ্রতিহার তাঁব কার্য্যারম্ভ ক'বতে ইচ্ছুক থাক্‌লে তা' ক'র্‌তে পার্‌বেন এবং তা'তেই প্রমাণ কবা যাবে যে, সাম্রাজ্যের যথোচিত পরিচালনায় আমাদের ক্রুটী হচ্ছে না।

ইন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতি

তবে আর উপায় নেই। পাল-সাম্রাজ্যেব ধ্বংসকাল উপস্থিত।

বামপাল দেবেব প্রবেশ

ইন্দ্রবর্ম্মা

এখনও বুঝে দেখুন মহাকুমাব বামপালদেব। মহারাজাধিবাজের সম্পূর্ণ উৎসন্ন-কাল উপস্থিত, নতুবা এত বড় দুর্ব্বুদ্ধি তাঁব ঘট্‌তো না, যদি আপনাতে পিতৃপুরুষের মঙ্গল কামনা বিন্দুমাত্র বর্ত্তমান থাকে তবে এখনও আমাদেব সঙ্গে যোগ দিন। আপনি তাদের সাগ্রহে নির্ব্বাচিত বাজা। সমস্ত ববেন্দ্রী আপনাকে বাহু মেলে বরণ ক'রে নে'বে। শরণাগতদের অভয় দিন—আব বৃথা সংশয়ে সুসময়কে প্রত্যাখ্যান ক'রবেন না।

রামপাল

ইন্দ্রবর্ম্মা। আমি তো আপনাকে জানিয়েছি আমি এ সম্মানের সম্পূর্ণরূপেই অযোগ্য।

ইন্দ্রবর্ম্মা

এখনও সময় আছে মহাকুমার! পূর্ব্বপুরুষের গৌরবোজ্জ্বল নামকে উজ্জ্বলতর ক'র্‌বার ও উত্তর-পুরুষের অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বাব এই একান্ত সুসময়! কিসের এ

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

দুর্ব্বলতা? ভ্রাতৃস্নেহ? যে-ভাই এই মুহূর্ত্তে আপনার জন্য রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা নিপুণ ঘাতকের সব চেয়ে তীক্ষ্ণ কৃপাণ শাণিত ক'র্ছেন তাঁরই প্রতি অন্ধস্নেহেই কি আপনি জীবনের এত বড় সুবর্ণসুযোগ পরিত্যাগ ক'রে ক্লীবোচিত আচরণ ক'র্ছেন? আপনি কি জানেন না আপনার যে শিরে পাল-বংশের গৌরব-মুকুট সগর্ব্বে শোভা পেতে পার্তো, তা' হীনতম অপরাধীর পার্শ্বে শ্মশানক্ষেত্রের রুধির-কর্দ্দমে লুণ্ঠিত করবার জন্যই আপনাকে এই মুহূর্ত্তে আহ্বান ক'রে আনা হ'য়েছে? মহাকুমার! জীবন কারুই অবিনশ্বর নয়, কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী—স্বধর্ম্ম-পালনই ক্ষত্রিয়ের জীবন-ব্রত—গীতার উপদেশ স্মরণ করুন—

রামপাল

আর্ত্তকণ্ঠে

ক্ষান্ত হোন, ক্ষান্ত হোন্ ইন্দ্রবর্ম্মা! বন্ধু! সখা! দেখ্তে পাচ্ছেন না—পাল-বংশ নির্ব্বংশ হ'য়েছে! অভাগা রামপাল মৃত, এ তার প্রেতাত্মা মাত্র

সবেগে অগ্রসর হইলেন, ইন্দ্রবর্ম্মা প্রভৃতির প্রস্থান—

মহীপাল

তোমরা সবাই আমার বৈমাত্রেয় ভাইএর কীর্ত্তিটা দেখ্লে ত'? এ সমস্তই সেই চক্রীর চক্র! এখন রাজদ্রোহী রামপালের সম্বন্ধে কি করা উচিত তোমরাই তার ন্যায় বিচার করো—মহাসান্ধি বিগ্রহিক! আমার মনে হয় অবিলম্বে রামপালদেবকে-

রামপাল

সম্মুখীন হইয়া

বন্দী ক'রে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য? রাজাধিরাজ! আমি রাজদ্রোহী, আমার প্রতি দণ্ডবিধান করা হোক্, বিলম্ব অবিধেয়।

মহীপাল

সভয়ে অপসৃত হইয়া কম্পিতদেহে চাহিয়া রহিলেন—

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

রামপাল

মহাপ্রতিহার। কৈ, এখনও আপনি নিশ্চল কেন? এমন ক'রেই কি আজকাল আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য পালন ক'রে থাকেন? এই দেখুন, আমি নিরস্ত্র হ'য়েছি, আসুন,—রাজদ্রোহীকে বন্দী করুন—

মহীপাল

সদম্ভে

জানই যখন আমার কাছে ধরা প'ড়তেই হবে, তবে কেন এমন কুকার্য্য ক'রতে গেলে? রুদ্রদমন। রাজনীতিতে স্নেহের স্থান নেই, কর্ত্তব্য কঠোর, তুমি ও আমি নিরুপায়, রাজদ্রোহীকে বন্দী কর।

মহাপ্রতিহার

কুণ্ঠিতভাবে অগ্রসর হইল

শূরপাল

প্রবিষ্ট হইয়া

একি। মহাকুমার রামপালদেব তাঁর পিতৃ-সিংহাসনতলে আজ এই দীন মূর্ত্তিতে ঘৃণ্য অপরাধীর মত নিগৃহীত কেন?

মহীপাল

মগধের মহাসামন্ত। তুমি এখানে কিজন্য?

শূরপাল

প্রয়োজনীয় রাজকার্য্যে—কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কই? রামপালদেব কি আপনার ভাই নন?

মহীপাল

রাজধর্ম্মে ভ্রাতৃত্ব থাকতে পারে না—এ জ্ঞান তোমার থাকা উচিত ছিল মহাসামন্ত।

শূরপাল

অবিশ্বাসপূর্ণ হাস্যে

রামপাল রাজদ্রোহী একথা বিশ্বাস ক'রতে পার্‌লেম না মহারাজাধিরাজ।

মহাদেবী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

মহীপাল

জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ এই অমাত্যমণ্ডলীকে, জিজ্ঞাসা করো তোমার সহোদর রামপালকে, সে কি উত্তর দেয়।

শূরপাল

রামপালের হাত ধরিয়া

জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, এস আমরা যাই।

মহীপাল

প্রতিহার! এই মুহূর্ত্তে এই দুই রাজদ্রোহীকে বন্দী ক'রে পাতাল-গর্ভস্থিত কষ্টাগারের নির্জ্জন কক্ষে নিক্ষেপ করো।

যবনিকা।





চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে সাহাপুর গ্রাম। গ্রামে বহুঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ ও কৈবর্ত্তের বাস। সকলেই প্রায় সঙ্গতিপন্ন। কালিঘাট ও আলিপুরের কাছাকাছি বলিয়া গ্রামখানি ক্রমশঃই সহর হইয়া উঠিতেছিল।

গ্রামের মধ্যে ধনের খ্যাতি অনেকেরই ছিল, কিন্তু মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কবিরাজ করালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। তাহার কারণ, এই চট্টোপাধ্যায় বংশ বহুপুরুষ হইতেই এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত এবং ইহারাই পুরুষানুক্রমে গ্রামের 'মাতব্বর' বলিয়া আখ্যাত হইয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ এই বংশের বর্ত্তমান বংশধর করালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কবিরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া যখন স্বগৃহে কবিরাজখানা খুলিয়া বসিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গুরুদত্ত এক পাঁচন বাহির করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তাহার প্রচারে সাফল্যলাভ করিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও গৌরবের কথা কিছুকাল যাবৎ গ্রাম্য মজলিশে প্রধান আন্দোলনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

করালীকিঙ্কর ভবানীপুরের বিখ্যাত কবিরাজ শম্ভুরাম হালদারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। হালদার মহাশয়ের চিকিৎসার খ্যাতি যতদূর ছিল, তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী খ্যাতি ছিল তাঁহার গায়ের জোরের। তিনি স্পষ্টই বলিতেন—স্বাস্থ্য এবং

আহরিকা

চণ্ডী-মণ্ডু

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি মহাশক্তির শ্রেষ্ঠ দান। যে এই দুই সম্পদের অধিকারী তাহার মত ভাগ্যবান আর কেহই নাই; এই দুই সম্পদ হারাইয়া রাজার ঐশ্বর্য্যই লাভ কর, আর বিশ্বের সকল বিদ্যাই অর্জ্জন কর—সব বৃথা।

শ্বশুরের আনুকূল্যে কালীকিঙ্কর সাত বৎসরের মধ্যে কবিরাজী-শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া লইলেন। পাঠ্যাবস্থায় কালীকিঙ্করের এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। এই কন্যার নাম চণ্ডী।

কালীকিঙ্কর যখন বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া স্বগ্রামে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার অভিলাষ করিলেন, তখন চণ্ডী পাঁচ বৎসরের বালিকা। হালদার মহাশয় কন্যা জামাতার নিকট হইতে চণ্ডীকে চাহিয়া লইলেন, বলিলেন,—চণ্ডীকে আমি মনের মতন ক'রে গড়ে তুলব; বারো বছরে পড়লে, আবার তোমাদের হাতে তুলে দেবো।

যে বৎসর চণ্ডী বারোয় পা দিল, বৎসর তাহার শিক্ষাদাতা, তাহার অভিভাবক তাহার গুরু ভীষ্মদেবতুল্য দাদামহাশ ন করিলেন। এই কয় বৎসরে, চণ্ডী দাদামহাশয়ের নিকট মোটামুটি সকল শাস্ত্র শিখিয়াছিল, রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ পড়িতে ও বুঝিতে পারিত, সুশ্রুতের সার অংশ আয়ত্ত করিয়াছিল, গণিতে তাহার অসামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল,—সে যাহা ধরিত তাহাই আয়ত্ত করিয়া তবে ছাড়িত। বিদ্যায় তাহার এই অসামান্য মেধা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল বিদ্যারও উপর আয়ত্ত করিয়াছিল চণ্ডী অদ্ভুত শক্তি-কৌশল! চণ্ডীর সবল সুস্থ নিটোল দেহ তাহার এই শক্তি-চর্চ্চার আধার স্বরূপ ছিল!

শৈশব হইতেই চণ্ডীর প্রকৃতিতে এমন একটু বিশেষত্ব ছিল, তাহার দৃষ্টি এমন অন্তর্ভেদী ছিল যে, তাহার সমবয়সী দূরের কথা, তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় বালক-বালিকাগণ তাহার কোন কথা উপেক্ষা করিতে সাহস করিত না—অবনত মস্তকে তাহারা চণ্ডীর সকল আদেশ মানিয়া চলিত।

চণ্ডী কাহারও অন্যায় দেখিতে পারিত না, অন্যের রক্ত-চক্ষু দেখিয়া ভয় পাইত না, জোরজবরদস্তিতে এপর্য্যন্ত কেহ তাহাকে তাহার অনিচ্ছায় কোনও কার্য্য করাইতে সক্ষম হয় নাই।

দাদামহাশয়ের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকিয়া গেলে, চণ্ডী পিতামাতার সহিত সাহাপুরে চলিয়া আসিল।

চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহাপুরে সবেমাত্র তখন খৃষ্টান পাদরীরা এক মিশনারী বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছে। সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া যতদূর শিক্ষা হউক, তাহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী শিক্ষা হইত হিন্দুর দেবদেবীকে ঘৃণা করিতে, হিন্দুর আচার-ব্যবহারকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতে। গ্রামের সঙ্গতিপন্ন লোকের বহু কন্যা এই স্কুলে ভর্ত্তি হইল। সহসা একদিন চণ্ডীর খেয়াল হইল, গ্রামের মিশনারী স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হইবে, সে পিতার নিকট আবদার ধরিল, পিতা তাহার আবদার পূর্ণ করিলেন, চণ্ডী মিশনারী স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

*　　　　*　　　　*　　　　*

সেদিন ভূতচতুর্দ্দশী — কালীপূজার আগের দিন, চণ্ডীর স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত বিলম্ব হলো কেন?

চণ্ডী সহাস্যে উত্তর দিল, আজ ভূতচতুর্দ্দশী কিনা, তাই ঠাকুমাকে চোদ্দ শাক, চোদ্দ পিদিমের যোগাড় ক'রে দিতে দেরী হয়ে গেছে।

শিক্ষয়িত্রী প্রশ্ন করিলেন, তুমি কালীপূজা কর?

সগর্ব্বে চণ্ডী উত্তর দিল, হাঁ করি।

অলক্ষ্যে মাথার উপর কে যেন একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। এ পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কোনও বালিকা এ-হেন স্পর্দ্ধিত শিক্ষয়িত্রী 'মিসে'র প্রশ্নের এরূপ অবাধ উত্তর দিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,— তুমি প্রতিমা পূজা কর?

শিক্ষয়িত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া চণ্ডীর মুখে আর হাসি ধরে না, হাস্যোজ্জ্বলমুখে চণ্ডী বলিল, ঠাকুরের পূজো করি বই কি গুরু-মা।

শিক্ষয়িত্রী এবার জ্বলিয়া উঠিলেন, কণ্ঠস্বর সপ্তমে উঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনী তুলিয়া তিনি বলিলেন,— আমার আদেশ, আমার ছাত্রীরা কেহ প্রতিমা-পূজা না করে, তুমিও করিবে না।

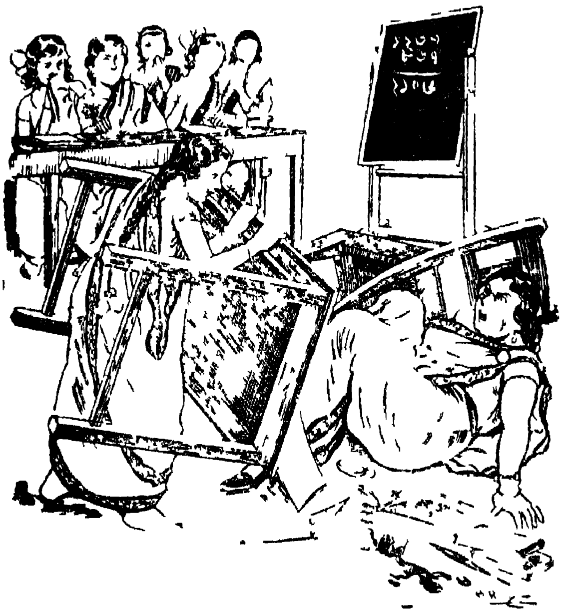
চণ্ডী পূর্ব্ববৎ হাসিয়া বলিল,— কাল আমাদের বাড়ীতে পূজো, আমরা সমস্ত দিন উপোস্ ক'রে সারারাত্রি প্রতিমার কাছে বসে থাকি, ব্রাহ্মণভোজন হ'য়ে গেলে তবে জল খাই। আমি রোজ মা-কালীর স্তব পড়ি।

আহেরিকা

চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীর কথাগুলি শিক্ষয়িত্রীকে ক্রমশঃই উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল, তিনি এবার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, সম্মুখস্থ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চণ্ডীর গণ্ডদেশে সবেগে এক চপটাঘাত করিলেন। বালিকারা সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, চণ্ডীর হাসি এবার মুখে মিলাইয়া গেল, চণ্ডী তখন প্রচণ্ড হইয়া দুই হাতে টেবিলের ডালা ধরিয়া শিক্ষয়িত্রীর গায়ের উপর উল্টাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে টেবিলখানি, কেতাবপত্র, দোয়াত কলম ঘড়ি প্রভৃতি লইয়া গিয়া শিক্ষয়িত্রীর উপর গিয়া পড়িল, সে ভারে অস্ফুটস্বরে "ও গড্" বলিয়া তিনিও ধরাশায়ী হইলেন।



পরক্ষণে চণ্ডী নিজেই গিয়া টেবিলখানি তুলিয়া ধরিল, শিক্ষয়িত্রী আহতা ব্যাঘ্রীর মত লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সক্রোধে চণ্ডীর দিকে চাহিয়া দূর হইতেই হাঁকিয়া বলিলেন--দূর হও এখুনি আমার স্কুল থেকে। চণ্ডী হাসিতে হাসিতে স্কুল-বাটী ত্যাগ করিল।

* * * *

স্কুলের সহিত চণ্ডীর সম্বন্ধ সেইদিনই চুকিয়া গেল, কিন্তু সে দিনের ঘটনা অতিরঞ্জিতভাবে গ্রামের ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। একেত' চণ্ডীর চণ্ডীপনা পল্লীর কেহই পছন্দ করিত না, তাহার উপর চণ্ডীর সেদিনের কীর্ত্তি যখন প্রচারিত হইয়া পড়িল তখন পল্লী-নারী-সমাজ একবাক্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এই দুর্জ্জয় মেয়ে চাটুয্যে-বংশের মুখে কালি না দিয়া যাইবে না।

চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

চণ্ডীর পিতা চণ্ডীকে ডাকিয়া কি ব্যাপার যখন জানিতে চাহিলেন, চণ্ডী তখন অসঙ্কোচে সকল কথাই বলিল। তিনি কন্যার কথা শুনিয়া কেবলমাত্র বলিলেন,—আর ও-ইস্কুলে যেয়ো না, বাড়ীতেই পড়।

এই ঘটনার পর গ্রাম্য বালিকারা সকলে একজোট হইয়া চণ্ডীর সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দিল, কিন্তু চণ্ডীকে দেখিতে পাইলেই তাহারা কত কি নূতন নূতন ছড়া কাটিত,—চণ্ডী শুনিয়া রাগিত না, বরং হাসিত।

সে দিন রবিবার, বিদ্যালয় বন্ধ, বালিকারা দলবদ্ধ হইয়া 'বকুলপুকুরে' উপস্থিত হইয়া দেখিল চণ্ডী ঘাটের চাতালে বসিয়া আছে এবং গ্রাম্য মহিলাগণ স্নান, আহ্নিক ও গল্পগুজব করিতেছেন। তাহারা ঘাটের অদূরবর্ত্তী একটি কামিনী গাছের তলায় গিয়া দলবদ্ধ হইয়া বসিল, তারপর সমস্বরে গান ধরিল,—

চাটুজ্জেদের বিঙ্গী
মেয়ে নয় সিঙ্গী।
কি চক্ষোর বাপ্‌রে বাপ্
ঠিক যেন গোখ্‌রো সাপ।

চণ্ডী বুঝিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই গান। আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল।—চণ্ডীর ইচ্ছা হইল—ছুটিয়া গিয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া পুকুরের জলে চুবাইয়া দেয়। সহসা চণ্ডীর মনে পড়িল,—যে কামিনী গাছের তলায় বসিয়া বালিকারা সমস্বরে গান গাহিতেছে, সেই গাছের ডালে একটি প্রকাণ্ড বোলতার চাক্ আছে। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে উপায় স্থির করিয়া লইল কিরূপে তাহাদের শিক্ষা দিবে—সকলের অলক্ষ্যে একটি কাষ্ঠ-খণ্ড সেই গাছের উপর নিক্ষেপ করিল,—তাহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল,—চাকে ঘা পড়িবামাত্র ক্রোধান্ধ বোলতার দল বোঁ বোঁ শব্দে বাহির হইয়া আসিল এবং বালিকাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পরক্ষণেই তাহাদের আর্ত্তনাদ—পুনঃ পুনঃ দংশিত হইয়া তাহারা ছুটাছুটি করিতে লাগিল, তিন চারিটী বালিকা প্রাণভয়ে জলে গিয়া পড়িল, তাহাদের মধ্যে দুই একজন সাঁতার জানিত না, জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ঘাটের সকলে শশব্যস্ত হইয়া

চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'গেল গেল' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চণ্ডী পলক মধ্যে গাছ-কোমর বাঁধিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে টানিয়া তুলিয়া আনিল।

বর্ষীয়সী মহিলাগণের মুখে এখন আর চণ্ডীর প্রশংসা ধরে না! কিন্তু চণ্ডী আত্ম-প্রশংসায় কর্ণপাত করিল না। মুহূর্ত্তে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

* * * *



চণ্ডী যখন চৌদ্দ বৎসরে পড়িল, তখন করালীবাবু তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল, কিন্তু কোন পাত্রই করালীবাবুর মনঃপূত হইল না। অবশেষে অপ্রত্যাশিতভাবে যখন বাস্থুলার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমীদার হরি-নারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবন হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসিল, তখন আর করালী-বাবুর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তৎকালে বাস্থুলীর মুখুজ্জে মহাশয়গণ সমগ্র চব্বিশ পরগণার মুকুটমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহাদের বহুদূর-বিস্তৃত বিরাট জমীদারী, বিপুল অর্থ, প্রবল প্রতাপ প্রবাদ-স্বরূপ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। এ হেন অতুলনীয় প্রভাবপত্তিশালী জমীদার গৃহে কন্যাদান যে কতদূর সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় তাহা করালীবাবু মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং এ প্রস্তাব তিনি সাদরে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিলেন না।

চণ্ডী-মণ্ডপ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ পাকা দেখা [illegible] যথা সময়ে হরিনারায়ণবাবুর চৌঘুড়ী সার [illegible] গ্রাম প্রতিধ্বনিত করিয়া বরদাবাবুর [illegible] সম্মুখে আসিয়া থামিল। চারিদিকে হাক্-ডাক্ পড়িয়া গেল।

বহুক্ষণ কথাবার্তার পর হরিনারায়ণবাবু পাত্রী দেখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরে সংবাদ গেল।

[illegible] মুখে কথা নাই, [illegible] করিতেছেন [illegible] চণ্ডীর সাহসের বহু কাহিনী [illegible] শুনিয়াছিলেন তাই এই মেয়েটীকে পুত্রবধূ করিতে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা [illegible] সহসা 'ধর ধর' শব্দে বাড়ীর প্রাঙ্গণে [illegible] আর্ত্তনাদ উঠিল। [illegible]



[illegible] আবরণ [illegible] বলিয়া দিল [illegible] সে তখন সেই অবস্থায় 'ধর ধর' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় সু-সজ্জিতা চণ্ডী জনৈক পরিচারিকার সহিত বৈঠকখানায় আসিতেছিল, অন্তঃপুরের দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রাঙ্গণে পা দিবামাত্র সে এ দৃশ্য দেখিল—গাভীটি তখন সেই দ্বারের

সম্মুখ দিয়া ছুটিয়াছে,—অমনি চণ্ডী সবেগে গিয়া দুই হস্তে গাভীর দড়ি ধরিয়া আদেশের স্বরে "মঙ্গলা মঙ্গলা" বলিয়া ডাকিল। প্রচণ্ডা মঙ্গলা গাই চণ্ডীর প্রবল আকর্ষণে বাধা পাইয়াই হউক অথবা তাহার প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বর শুনিয়াই হউক, একবার ফিরিয়া চাহিল। সেই অবসরে চণ্ডীও তাহার দড়ি সন্নিহিত একটি পেয়ারা-গাছের কাণ্ডে জড়াইয়া দিয়া, মঙ্গলার সম্মুখে গিয়া 'কি হ'য়েছে মঙ্গলা এত ক্ষেপেছিস কেন' বলিয়া তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল। তারপর চণ্ডী সেই ছেলেটির হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় চলিল। বৈঠকখানায় আসিয়াই প্রথমে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল, তাহার পর হরিনারায়ণবাবু ও অপর সকলকে প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইল।

সবান্ধবে হরিনারায়ণবাবু এবং বৈঠকখানাস্থ গ্রামের সকলেই বৈঠকখানার রোয়াকে দাঁড়াইয়া চণ্ডীর এই অসম সাহসের কার্য্য দেখিতেছিলেন।

হরিনারায়ণবাবু আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া করালীবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—করালীবাবু, কন্যার পাকা দেখা আগেই হ'য়ে গেছে, মা আমার প্রাঙ্গণে যে মূর্ত্তিতে প্রথম দেখা দেন, সেই দেখাই পাকা দেখা। আমি মা'র বিবাহের দিন স্থির করলাম—আগামী বুধবার, ঐদিন এ-মাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত দিন।

করালীবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন,—এই বুধবার? বলেন কি?

হাঁ করালীবাবু, আগামী বুধবার, মাঝে মাত্র একটি দিন। কথাটা যখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, আর ত' নড়চড় হবার উপায় নেই বেহাই। হাঁ, একটা কথা—মাকে ত' দেখা গেল, দেখার যৌতুক ত' দেওয়া হ'ল না। আচ্ছা, মাকেই জিজ্ঞাসা করি, বল মা—তোমায় আজ কি যৌতুক দেব? মনে রেখ—তোমাকে আজ আমার অদেয় কিছুই নেই।

চণ্ডী ধীর শান্তস্বরে বলিল, আমি অন্য কিছু চাইনে—এই গ্রাম আপনারই, কিন্তু এই গ্রামে হিন্দুর মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার একটিও বিদ্যালয় নেই, এই গ্রামের ভিতর মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার এমন একটি মন্দির ক'রে দিন, যেখানে আমাদের পূজা-মহিমা লেখাপড়ার মত শেখান হয়, আমাদের ধর্ম্ম যেখানে পাঠ্য হয়।

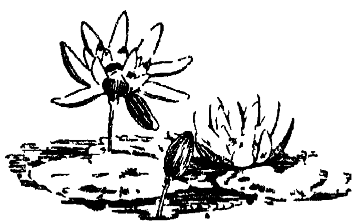
চণ্ডী-মণ্ডপ

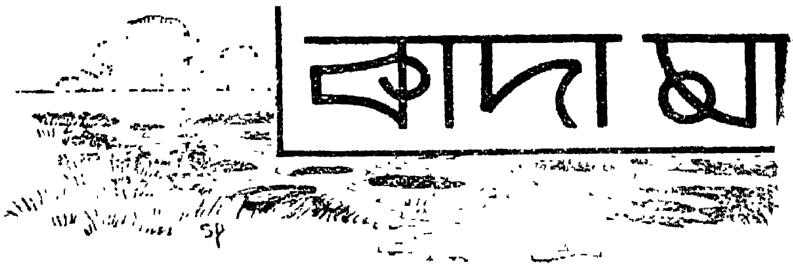
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত। চৌদ্দ-বৎসর বয়স্কা বালিকার একি অদ্ভুত প্রার্থনা! দেশের জন্য- দেশের বালিকাদের জন্য— তাহাদের সনাতন ধর্মের জন্য এই ক্ষুদ্র বালিকার অন্তরের অভ্যন্তরে যে এত ব্যথা প্রচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা কে জানিত?

হরিনারায়ণবাবু বিশেষ খুশী হইলেন, বলিলেন, মা তাই হবে, আমার পুত্র-বধূর উপযুক্ত প্রার্থনাই ক'রেছ তুমি, তোমার এ প্রার্থনা আজ তোমার শ্বশুরবংশের মুখোজ্জ্বল করেছে।

বিবাহ সমারোহে চুকিয়া গেল। চণ্ডীর ইচ্ছানুসারে হরিনারায়ণবাবু একটী আদর্শ কন্যাবিদ্যালয় গ্রামের মধ্যে স্থাপন করিলেন এবং গ্রামবাসীদের একান্ত অনুরোধে এই স্কুলের নাম হইল- 'চণ্ডী-মণ্ডপ'





কাদামা

(১)

এসেছে ভুটানী লামা,
দেখে তাকে বলে বামা—
‘শ্যামার পাগল মামা
মুড়ি দিয়ে ছেঁড়া জামা
ফুটপাথে টানে হামা—
খুঁটে বেছে খোয়া ঝামা
ধামা ভ’রে খায়!’



ভাবা হুঁকো
ছাতে বসে খে
হেরে গিয়ে বলে—
বোড়ে টিপে মিছে ভ
মেরেছে বাঘের থাবা
কাশী গয়া হ’লো কাবা—
কোথা নাবা

কাদা মাটি

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

নাপিতে গরুর বাঁটে
দুধ দু'য়ে ছিপি আঁটে
গোলাপ জলের পাঁটে।
খাঁতি নিয়ে চুল ছাঁটে
ঘাটে যত গয়লা!

ছেলেরা উঠোনে হাঁটে
বউ গিয়ে ছোটে মাঠে
পয়সা নেইকো গাঁটে
মুড়ি ফেলে নুড়ি সাঁটে
ক'সে চাটে কয়লা।



(৪)

তেরোশো তিরিশ সালে
শিরিষ বাবুর খালে
গিরিশ ধরেছে জালে
লাখে লাখে কাত্‌লা!

গিরিশের বউ ভাবে
এতো মাছ কেবা খাবে
খেলে মোটা হ'য়ে যাবে
যারা রোগা পাতলা!



শের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

গোবদ্ধনবাবু গল্প বলছিলেন।—

গল্প নয়, সত্য ঘটনা,—তাঁরই জীবনে ঘটেছে,—তবু লম্বা বলেই মনে হয়।

গোবর্দ্ধনবাবুর পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। ইনি আমাদের সরকারী ঠাকুর্দ্দা। পাকালো দাড়ী, জাঁকালো গোঁফ আর টাকালো মাথা। বয়েসটা তাঁর কত হিসেব করিনি,—তবে আন্দাজে মনে হয়—সত্তরের নীচে নয় আবার নব্বুয়েরও কাছাকাছি হতে পারে।

যৌবনে অভ্রের ব্যবসা করে' যতটা তাড়াতাড়ি তিনি ফেঁপে উঠেছিলেন তার চেয়েও বেশী তাড়াতাড়ি আবার সেই পয়সা 'ফুঁ' দিয়ে তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেষকালে শেষ বয়সে চতুর গোবর্দ্ধনবাবু ফতুর হয়ে দেশে এসে পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে ধরে আছেন।

এই গোবর্দ্ধনবাবু অর্থাৎ আমাদের সরকারী ঠাকুর্দ্দা বেশ গপ্পুরে লোক। গল্প বলতে তিনি ওস্তাদ।

একদিন আমরা নদীর ধারে বসে জটলা করছিলাম এমন সময় লাঠি ভর দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে ঠাকুর্দ্দা এসে হাজীর।

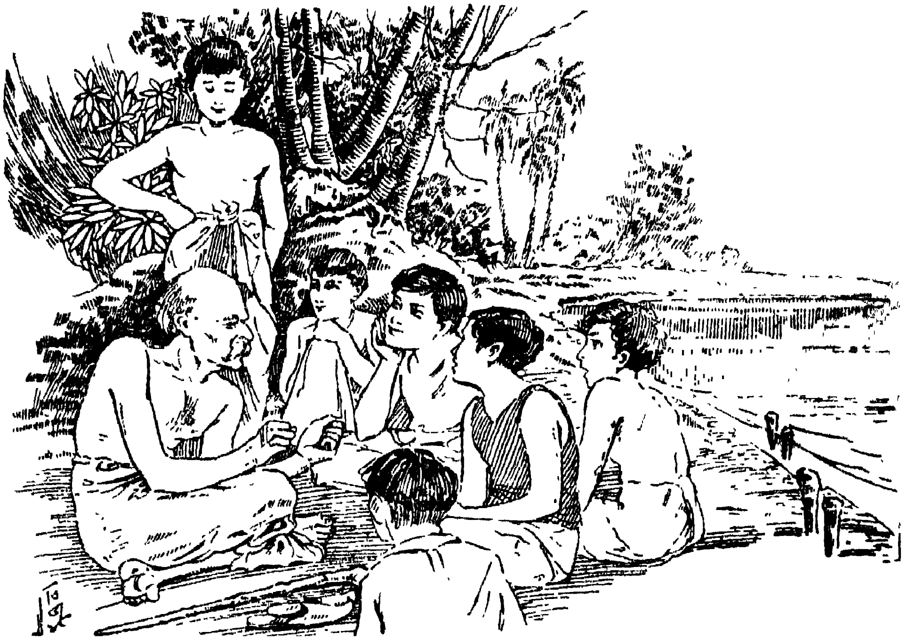
সের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আমাদের পাড়ার গঙ্গারামের ছোট মামা রঙ্গলালবাবু সুন্দরবনে শিকারে গেছিলেন। বাঘের মুখ থেকে তিনি আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা পেয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। এই সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করছিলাম।

আমাদের কাছে এই কথা শুনে ঠাকুর্দ্দা বল্লেন—"গঙ্গারামের মামা বাঘের মুখ থেকে রক্ষা পেয়েছে নাকি! আরে, এক বাঘই যে একবার সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছিল।"

সে আবার কি!! আমরা ঠাকুর্দ্দাকে ধরে বস্‌লাম গল্পটা তাকে এক্ষণি বল্‌তে হবে। আমাদের যেন আর তর্ সইছিল না।



আমাদের পাশে ঘাসের উপর বসে তিনবার 'খুক্ খুক্' করে কেশে গলাটা সাফ্ করে' নিয়ে ঠাকুর্দ্দা বল্‌তে আরম্ভ করলেন—

—"হাজারীবাঘ জেলায়,—সহর থেকে অনেক দূরে—'ঘোরঞ্জী' নামে একটা ছোট

মাহেরিকা

সের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

গ্রাম আছে। সেই গ্রামের ধারে একটা পাহাড়ের নীচে ছোট একটা অভ্রের খনি আছে। এক সময় তার মালিক ছিলাম আমি।

আমি সহরেই থাকতাম,—কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ঘোরঙ্গীতে থেকে ঐ খনির কাজ চালাতেন। তাঁদের খরচের জন্যে আমি সপ্তাহে সপ্তাহেই টাকা পাঠাতাম। আমার নিজের আর সেখানে যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এই খনিটার একটা ইতিহাস আছে। প্রথমে এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ছিলেন এই খনির মালিক। কিছুদিন কাজ চালাবার পর—খনির অবস্থা হয়ে পড়ল অতি শোচনীয়। একবার বর্ষাকালে উপর থেকে মাটি ধ্বসে পড়ে' হঠাৎ খনির মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়—কাজকর্ম্ম বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রলোক খনির মায়া ছেড়ে চাটি পাটি গুটিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন।

সেই সময়ে মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার দেখা আমার তখন প্রথম যৌবন, বুকভরা আশা, প্রাণভরা সাহস,—মনভরা উৎসাহ। নামমাত্র মূল্যে আমি তার কাছ থেকে খনিটা কিনে নিলাম।

একটা পোড়ো খনি কেনবার জন্যে - আমার উপর আত্মীয় স্বজনরা বিরক্তই হলেন,—কিন্তু তাঁদের উপদেশের চেয়ে বরাতটাকে আমি বেশী মানতাম—কাজেই সম্পূর্ণ অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে' পোড়ো খনিটা কিনে ফেল্লাম।

বরাৎ যে আমার নেহাৎ অপ্রসন্ন ছিল না তা টের পেলাম অল্পদিনের মধ্যেই। কয়েকদিনের মধ্যেই বেশ দু' পয়সা জমিয়ে ফেল্লাম। যে সব আত্মীয়েরা প্রথমে আমার বুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন—তাঁরাই এখন আমার ব্যবসা বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন।

যা হোক্—এখন আসল গল্পটা বলি।

একবার পূজোর আগে ঠিক করলাম নিজেই খনির অবস্থাটা দেখতে যাব। যাবার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। যে সব কুলি মজুর খনিতে কাজ করে তাদের কিছু বখশিস্ এবার পূজোর সময় দেবার মতলব করলাম। বেচারারা অত্যন্ত গরীব,—সামান্য বখ্‌শিস্ পেলে তাদের কাজের উৎসাহও দশগুণ বেড়ে যাবে—কাজেই আমারও তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই একটুও।

আহরিকা

সের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

ঘোরঞ্জী গ্রামখানি সহর থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল পশ্চিমে। একটানা গরুর গাড়ীতে যেতে হয়।

সারাদিন চরাই-উৎরাই পার হয়ে ঠিক সন্ধ্যার আগে আমাদের গরুর গাড়ী এসে পৌঁছাল একটি জঙ্গলের ধারে।

সঙ্গে ছিল সর্দ্দার পিয়ারীলাল। বল্লাম,—'পিয়ারি, যে রকম অবস্থা দেখছি—তাতে আজ আর ঘোরঞ্জী পৌঁছাবার কোনো আশা ভরসা নাই। অন্ধকার রাত ঘনিয়ে আসছে,—আর আশে পাশে যে রকম বিশ্রী জঙ্গল - আর এগিয়ে কাজ নাই। কোনো গাছতলাতেই আজকের মত আশ্রয় নেওয়া যাক, কাল খুব ভোরে আবার রওয়ানা হওয়া যাবে।'

আমার কথার উত্তর দিল গাড়ীর গাড়োয়ান বংশী সে হিন্দুস্থানী হলেও বেশ বাংলা বলতে জানে। বল্লে, 'বাবু, জায়গাটা বিশেষ সুবিধার নয়, আমাদের আর একটু এগিয়ে যাওয়া দরকার।'

বল্লাম—'কেন বংশী, বাঘের ভয় করছ বুঝি?'

—'উঁহু, বাঘ নয়, —বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর জিনিষের হাতে আমরা পড়তে পারি,—প্রসিদ্ধ ডাকাত গুপীয়ার চেলা-চামুণ্ডারা এই পথেই যাওয়া-আসা করে।'

বংশীর কথা শুনে বুকটা ছ্যাঁৎ করে' উঠল। গুপীয়ার নাম আমি শুনেছি,—তাকে ধরবার জন্যে গভর্ণমেণ্ট থেকে অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আমার সঙ্গে অনেক টাকা পয়সা,—কাজেই ভয় পাবারই কথা। বল্লাম, - 'তবে তো মুশ্‌কিলের কথা দেখছি,—আর খানিকটা এগিয়ে গেলেও যে বিপদ কাটবে,—তা তো মনে হচ্ছে না, বরং আরো ভয়ের কথা হয়ে পড়বে। ধারে কাছেই যে কোনো গ্রাম আছে তা তো মনে হচ্ছে না।'

বংশী বল্লে,—'আর আধ ক্রোশ পথ যেতে পারলে আমরা সের-বাহাদুরের এলাকায় এসে পড়ব—তখন আর কোনো ভয় নাই।'

কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'ও, সের-বাহাদুর বলে কোনো জমিদার বুঝি সেখানে বাস করে?'

আহেরিকা

সের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

—'জমিদাব নয়, সেব-বাহাদুর এক বাঘেব নাম।' বংশী নির্ব্বিকারভাবেই বল্লে।

আরে বলে কি,—কী সর্ব্বনাশেব কথা। বংশী কি আমার সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দিয়েছে নাকি? বল্লাম,—'তাব মানে? ডাকাতের চেয়ে বাঘ জিনিষটাকে কি বেশী নিবাপদ মনে কবছ নাকি?'

বংশী বল্লে— 'সেব-বাহাদুর যে-সে বাঘ নয়, এক সাধু বাঘেব বেশ ধবে' ঐ জায়গায বাস কবে। বড জবর-দোস্ত্ বাঘ। জাযগাটাব নাম হচ্ছে 'সেব-বাহাদুরের এলাকা'। ওখানে গিয়ে তার শরণ নিলে কেউ কোনো বিপদে পড়ে না।'

সর্দ্দাব পিযারীলাল এইবাব কথা বল্লে—'হা, হা, বংশীব কথা ঠিক,—সেব-বাহাদুরের এলাকাব কথা আমি অনেক দিন শুনেছি,—তবে জায়গাটা যে এইখানেই—তা আমার জানা ছিল না। ওখানে গিয়ে একবাব বলতে হয়—'জয় সের-বাহাদুরেব জয়',—তা হলেই আর কোনো বিপদেব ভয় থাকে না।'



এদেব কথা শুনে আমি হো হো কবে' হেসে উঠলাম। এ সব আজগুবী গল্পে বিশ্বাস করবার মত বয়স এখন আমার নয়,—কোনো অলৌকিক, অসম্ভব জিনিষে আস্থা স্থাপন করাটাকে একটা মানসিক দুর্ব্বলতা বলেই আমি মনে করতাম।

বল্লাম—'বংশী, সঙ্গে যদি বন্দুক থাকত তবে একবার তোমাদের সের-বাহাদুরকে ঘায়েল কববার চেষ্টা করতাম। কাছাকাছি যে একটা বড শিকার আছে সে খবর তো

সের-বাহাদুরের এলাকা

আহেরিকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

আগে জানা ছিল না। এখানে বড় বাঘ আছে জান্‌লে আমার বন্ধু বিখ্যাত শিকারী শম্ভু শিকদারকে নিয়ে আসতাম নিশ্চয়ই!'

আমার কথা শুনে বংশী জিভ কেটে কাণে আঙুল দিয়ে বল্লে— 'আরে রাম, রাম,— সের-বাহাদুর কি আর সত্যি বাঘ,—সাক্ষাৎ দেবতা। আজ পর্য্যন্ত কত শিকারী ঐ বাঘের তল্লাসে এসেছে—কেউ তার পাত্তা পায় নি। মধ্যে মধ্যে শুধু গর্জ্জন শোনা যায়, কিন্তু দর্শন পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে না।'

গভীর বন।—চারিধারে নিবিড় অন্ধকার। কোনো দিকে একটু সাড়া শব্দ নাই।—সের-বাহাদুরের এলাকায় এসে পৌঁছালাম।

একটা ঝাঁকড়া বট গাছের নীচে গাড়ী থামিয়ে বংশী আর পিয়ারী গদগদস্বরে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—'জয়, বাবা সের-বাহাদুরের জয়।' সঙ্গে সঙ্গে মনে হোলো—যেন দূরে—অতি দূরে সেই অন্ধকার বনের মধ্যে কে যেন গম্ভীর গলায় গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌ল- 'হাল্লুম।'

প্রাণটা কেঁপে উঠ্‌ল। শেষকালে সের-বাহাদুরের পেটে যেতে হবে নাকি? বল্লাম,—'বংশী, সের-বাহাদুর তোমাদের সাধু হোন্ আর দেবতা হোন্—আমার এখন আত্মরক্ষার উপায় করা দরকার। এখানে রাত কাটাতে হলে আগুনের ব্যবস্থা কর। শুক্‌নো গাছপালা এনে আগুনের কুণ্ড তৈরি ক'রে রাখ,—একমাত্র আগুনকেই বাঘ ভয় করে।'

সঙ্গে লণ্ঠন ছিল, সেটাকে জ্বালিয়ে হাতের কাছে রাখ্‌লাম। একটা 'টর্চ্চ' এনেছিলাম—সেটাও সাবধানে রেখে দিলাম বালিশের তলায়।—আমার মন রাখবার জন্যে সর্দ্দার পিয়ারীলাল কিছুদূরে একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি ক'র্‌ল। বংশী কিন্তু বল্লে—'এ সবের কোনো দরকার নাই, সের-বাহাদুরের শরণ নিলে আর কোনো ভয়ের কারণ থাক্‌তে পারে না।'

পিয়ারী বল্লে—'আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান্, আমি আর বংশী রাত জেগে পাহারা দেব,—কোন ভয় নাই।'

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি বল্‌তে পারি না, হঠাৎ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় আমার এত সাধের ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হোলো আমাকে নিয়ে গরুর গাড়ীটা বুঝি একদিকে কাৎ হয়ে

সের-বাহাত্বরের এলাকা

শ্রীস্থনির্ম্মল বস্থ

পড়েছে। বাঘ আসে নাই তো!।—তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠলাম,—চীৎকার ক'রে ডাক্লাম—'পিয়ারী, বংশী, -' কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। লণ্ঠনটাও নিভে গেল নাকি?—চারিধারে যে স্থচিভেদ্য অন্ধকার।—আবার 'মরিয়া' হ'য়ে ডাক্লাম - 'পিয়ারা, বংশী ', কোনো উত্তর নাই।

ভয়ে আমার শরীর হিম হ'য়ে গেল,—মাথা ঝিম ঝিম্ ক'রে উঠল।—মনে হোল যেন একটা ছায়া-মূর্ত্তি আমার কাছে -খুব কাছে—এসে দাঁড়িয়েছে।

চট্ ক'রে বালিশের তলা থেকে টর্চ্চটা বের ক'রে জ্বেলে ফেল্লাম। যে দৃশ্য দেখলাম তাতে শরীরের রক্ত জল হ'য়ে গেল, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল।

বিকটাকার একটা দানবের মত লোক প্রকাণ্ড এক খাঁড়া হাতে ক'রে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, হিন্দী ভাষায় গুরুগম্ভীরস্বরে বল্লে—'টাকা কড়ি যা আছে চটপট্ দিয়ে দে—যদি ভালো চাস্।' এই ব'লে সে হ্যাচ্‌কা টান মেরে আমাকে গাড়ী থেকে নামাল।

বুঝ্‌তে পারলাম ডাকাতের হাতে পড়েছি।—এই বিপদের সময় পিয়ারীলাল আর বংশী কোথায়? ওঃ, নিশ্চয়ই তারা বিপদ বুঝে সট্‌কে পড়েছে. আর উপায় নাই।

সঙ্গে টাকা কড়ি যা ছিল বিনা বাক্যব্যয়ে ডাকাতের হাতে তুলে দিলাম। ভাবলাম যাক্, টাকার বিনিময়ে প্রাণটা আগে বাঁচুক।

টাকাকড়িগুলো কাপড়ের খুঁটে বেধে লোকটা বল্লে—'তোর আর বেচে থেকে কাজ নাই, তুই বেঁচে থাক্‌লে আবার সহরে গিয়ে হাঙ্গামা বাধাতে পারিস্। আমাদের ধরবার জন্যে পুলিশ অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে। তোকে এখানেই খতম্ করি,—শত্রুর শেষ রাখতে নাই।'

আমার চোখের সামনে ঝক্‌ঝকে খাঁড়াখানা একবার নেচে শূন্যে দুলে উঠল। আশা নাই—আর আশা নাই, হঠাৎ মুখ দিয়ে আমার বেরিয়ে গেল—'জয়, সের-বাহাত্বরের জয়।'

গল্প,—গল্প,—সত্যি আজগুবী গল্প বলেই মনে হয়। চক্ষের নিমেষে কোথা থেকে এক অতিকায় বাঘ বিদ্যুতের মত ছুটে এসে ডাকাতের ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল,—তারপর তার টুঁটি কামড়ে ধ'রে আবার সেই অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। মুখ দিয়ে একটা 'টুঁ' শব্দ করবার সময় পর্য্যন্ত ডাকাতটা পেল না।

সের-বাহাদুরের এলাকা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

এই ঘটনার ঠিক আধ ঘণ্টা পরে পিয়ারীলাল আর বংশী এসে হাজির। সঙ্গের তামাক ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা আমার লণ্ঠনটা নিয়ে ধারে-কাছে কোনো গ্রাম আছে কিনা সেই খোঁজে গিয়াছিল।



সমস্ত শুনে বংশী বল্লে—'সের-বাহাদুরের এলাকায় কোনো ভয় নাই,— এটা বিশ্বাস করি বলেই আপনাকে একলা ফেলে আমরা তামাকের খোঁজে যেতে পেরেছিলাম।'

পিয়ারী বল্লে, 'ডাকাতের হাত থেকে বাঁচব ব'লেই সের-বাহাদুর ঠিক সেই সময় আমাদের তামাকের নেশা করিয়ে এখান থেকে কৌশলে সরিয়ে দিয়েছিল।'

আমি আর থাক্‌তে পারলাম না। হাতজোড় ক'রে আকুল স্বরে ব'লে উঠলাম, 'জয়, সের-বাহাদুরের জয়।—'

অন্ধকার বন ভেদ ক'রে—অতি দূর থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ আমাদের কানে এসে পৌঁছালো—'হাল্লুম।'



শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ

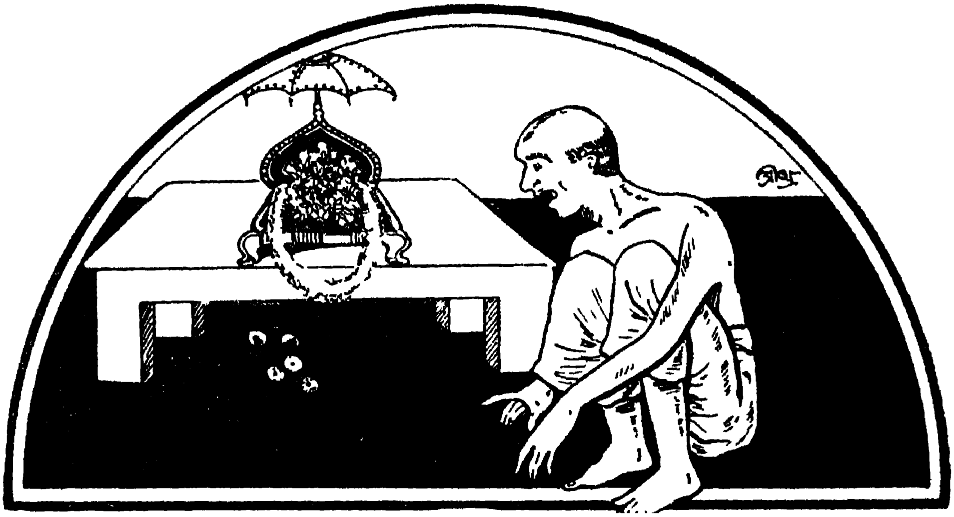
দিন আর চলে না। জুতার ব্যবসায়ে লাভ নাই। দেশে অন্ন নাই, জুতা কিনিবে কে? বাজারে গিয়া রুইদাস জুতা লইয়া বসিয়া থাকে। কেহ ফিরিয়াও চাহে না। সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনাইয়া আসে, তখন রুইদাস কোনও বৈষ্ণবের দ্বারে গিয়া জুতা রাখিয়া আসে। ভিতরে প্রবেশ করে না, পাছে অশুচি বলিয়া কেহ গালি দেয়। সে যে অস্পৃশ্য—ঘৃণ্য। তাহার কেহ নাই এ সংসারে। সে চোরের মত আপনাকে যথাশক্তি গোপন করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। প্রতিবেশীর সতর্ক কটাক্ষ হইতে সে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করিলেও, যখন তখন তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনাই বর্ষিত হয়। যেদিন নিতান্ত অচল হয়, সেদিনও সে কাহারও গৃহে গিয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য দাঁড়াইতে সাহস করে না, পাছে গৃহ অপবিত্র হইয়া যায় তাহার দূষিত অঙ্গস্পর্শে। সে আপনার গৃহের কোণে কোনরূপে শীত-বর্ষা রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতার ভজন করে। কেহ সে ভজনের কথা জানে না, কেহ ভাবেও না যে তাহারও ভগবান আছেন! কেহ জানে না বলিয়াই তাহার ভজনে কোনও বাধা হয় না। নিজের আত্মীয় স্বজন হইতে দূরে সে তাহার এক নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া তাহার চিরারাধ্য শ্যামসুন্দর রামরঘুমণির

করে। তিনিই যে তাহার ক্ষুধার অন্ন, আঁখির নিদ্রা, প্রাণের প্রিয়তম।

রুইদাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্-এ

দারিদ্র্য যতই পীড়া দেয়, ক্ষুধায় দেহ যত এলাইয়া পড়ে, ততই সে তাহার প্রাণের দেবতাকে চোখের জলে অভিষেক করিয়া লয়। কিন্তু আর চলে না, শরীর আর বয় না। এমন সময় এক সাধু আসিলেন। রুইদাস তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক পান করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া বহিল। সাধুর কৃপা হইল, রুইদাসের দুঃখ দেখিয়া তাঁহাব মনে করুণা হইল। তিনি বলিলেন, -



'রুইদাস, তোমার দুঃখে আমি ব্যথিত হইয়াছি। কি কবিলে তোমার দুঃখ দুর কবিতে পারি, বল।'

রুইদাস বলিল, 'প্রভু, আমার কোন দুঃখ নাই। একমাত্র দুঃখ এই যে, আমি নীচ, আমি অস্পৃশ্য, তোমার সেবা করিতে পারিলাম না।'

সাধু বলিলেন, 'আমি তোমাব সেবায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর গ্রহণ কর।'

রুইদাস জোড়-করে নিবেদন করিল, 'প্রভু, আমার প্রতি রঘুবরের কৃপা হউক, এই বর প্রদান করুন। অন্য কিছু প্রার্থনা করি না।'

সাধু বলিলেন 'তথাস্তু'। কিন্তু তোমার এই দারিদ্র্য দুঃখ আমাকে পীড়া দিতেছে। তুমি এই প্রস্তরখানি গ্রহণ কর। ইহাতে তোমার অভাব-মোচন হইবে।'

রুইদাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্ এ

এই কথা বলিয়া সাধু তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রুইদাসের হাতুড়ীতে প্রস্তরখণ্ড ঠেকাইলেন। হাতুড়ি দেখিতে দেখিতে স্বর্ণ হইয়া গেল। তখন রুইদাস 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। সাধু হাসিলেন। ভাবিলেন, মূর্খ রুইদাস; অভাবে পড়িলেই এই স্পর্শ-মণির মূল্য বুঝিবে। তিনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

রুইদাস ভাবিতে লাগিল, কে এই সাধু? আমি দীনভাবে গৃহের কোণে পড়িয়া থাকি, কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি না। তবে আমার এই বিড়ম্বনা কেন? সাধুর বেশ ধরিয়া কে আমার এই অনিষ্ট করিতে আসিল?

রুইদাস তাহার ইষ্টদেবতাকে বক্ষে ধারণ করিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। বলিল, 'দুঃখের দেবতা, আমার দুঃখের মধ্য দিয়া আমার বুকে আসিয়াছ। এরা তোমাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য ফাঁদ পাতিতেছে। তুমি যেন আমায় ফাঁকি দিও না।'

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া রুইদাস সুস্থ হইল। তাহার হৃদয়ে আবার বিমল শান্তি ফিরিয়া আসিল। সে তখন চোখের জলে হৃদয়ের ব্যথায় তাহার দেবতার পূর্ণ অভিষেক করিয়া লইল।

(২)

রুইদাস সে স্পর্শমণির কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এবার তাহার দুঃখ দৈন্য ভৈরবী মূর্ত্তিতে আসিয়াছে। চালে খড় নাই, দেহে বস্ত্র নাই, ঘরে অন্ন নাই। দুই এক জোড়া জুতা কখনও কখনও প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু তাহা বৈষ্ণবগণকে দান করা ব্যতীত অন্য কোনও উপকারে লাগে না। বৈষ্ণবেরা আশীর্ব্বাদ করেন, 'তোমার ধর্ম্মে মতি হউক।' রুইদাস সেই আশীর্ব্বাদের শান্তিজল মস্তকে লইয়া রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসে। অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গার সুশীতল জল পান করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতার ভজনে দীর্ঘরাত্রি অতিবাহন করে।

সাধু পুনরায় আসিলেন। দেখিলেন সেই জীর্ণ কুটীর তেমনই আছে। রুইদাসের শীর্ণ দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রের শতচ্ছিদ্র দারিদ্র্যের শত পতাকার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রুইদাস, তোমার দুঃখ ত' ঘুচিল না?'

রুইদাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ

রুইদাস বিনীতভাবে উত্তর করিল. 'প্রভু, দুঃখ ঘুচিলে যে দুঃখেব ঠাকুরকে হারাইব।'

'কিন্তু এত দুঃখ কি ঠাকুর সহ্য কবিতে পারেন? তোমাব দুঃখ কি তোমাব ইষ্ট-দেবতাব প্রাণে বাজে না?'

'এই ত' আমাব পরম সুখ, দুঃখ না পাইলে কি এই সুখ পাইতাম, প্রভু?'

'যাক্, তুমি আমাব সে স্পর্শমণি কি কবিলে?'



রুইদাসের সে মণির কথা মনে পড়িল, সে তাহার চালের বাতা হইতে প্রস্তরখণ্ড আনিয়া সাধুকে ফিবাইযা দিল। বলিল, 'প্রভু, আর আমাকে লোভ দেখাইবেন না। আমি আপনাকে প্রণাম করি।'

সাধু বলিলেন, 'তুমি আমাকে বিদায করিতে চাহ, তাহা বুঝিতেছি। কিন্তু রুইদাস, তুমি ভক্ত, তোমার বামরঘুমণি তোমার জন্য ব্যথিত। তিনিই আমাকে পাঠাইয়াছেন। তোমার এ দুঃখ আমায় দূর করিতেই হইবে। বল, তুমি আমার কথা রাখিবে?'

রুইদাস বলিল, 'আপনি কে, তাহা জানি না। আমার জন্য আপনার এত মাথাব্যথা কেন, তাহাও বুঝিতে পারি না। কিন্তু আপনি আমার শ্রীবামচন্দ্রের নাম লইতেছেন, বলুন, আপনার যাহা অভিপ্রায়, তাহা করিব।'

আহেরিকা

রুইদাস

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

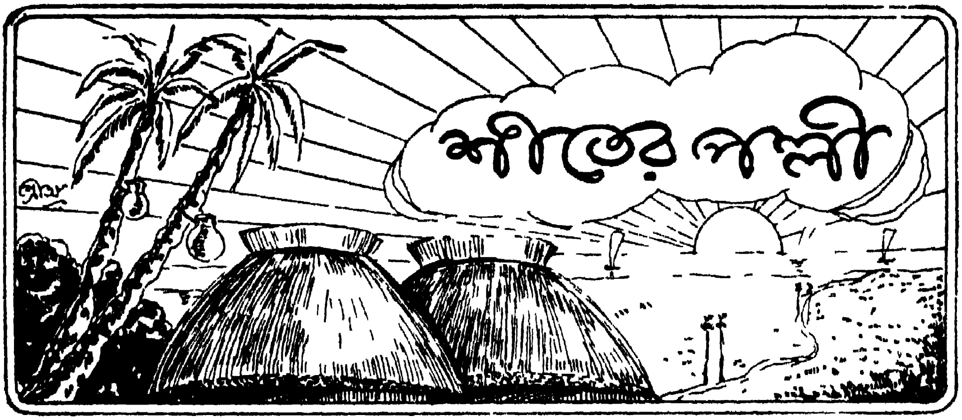
তখন সাধু বলিলেন, 'রুইদাস, তুমি প্রতিদিন ঠাকুরের সিংহাসনতলে পাঁচটি সোনার মুদ্রা পাইবে, তাহার দ্বারা বৈষ্ণব-সেবা করিও। তোমার নিজের জন্য কিছু না লইতে চাও, লইও না। বৈষ্ণব-সেবাব জন্য এই অর্থ ব্যয় করিও।'

সাধু চলিয়া গেলেন। রুইদাস সন্ধ্যারতির সময় দেখিল, ঠাকুরের সিংহাসনতলে স্বুবর্ণমুদ্রা পড়িয়া রহিয়াছে। রুইদাস ঠাকুরেব দিকে চাহিয়া দেখিল, সেই নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম, শান্ত স্নুন্দর রঘুকুলতিলকেব মুখে মৃদুমন্দ হাসি। রুইদাস মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।*

---

* লালদাস বাবাজি কৃত ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে রূপান্তরিত।





গোলাম মোস্তাফা

এবারকার এই 'বড়দিনে'র ছোট্ট ছুটীতে
সহর ছেড়ে এসেছি ভাই গাঁয়ের কুঠিতে।
সহর চেয়ে লাগ্‌ছে ভাল পল্লী-মায়ের কোল,
হেথায় শুধু আলো-বাতাস—হাসিরই হিল্লোল।
কলিকাতার গন্ধ গায়ে নাইক এখন আর,
গাড়ী ছেড়ে বাড়ী এসেই শেষ করেছি তার।

গাছের পাতার সবুজ রংএ ভুলেছে মোর মন,
নীল আকাশের নিবিড় নীলে জুড়ায় দু'নয়ন।
হাজার পাখীর কলরবে রাত্রি হ'লে ভোর
পূব্ আকাশে তরুণ রবি খোলেন তোরণ-দোর!
ঝাঁটার মতন ছড়িয়ে পড়ে রবির কিরণ জাল
সাফ্ হ'য়ে যায় ধরার দেহের যা-কিছু জঞ্জাল।
ঊষা এসে নিতুই যেন আলোর ঝাড়ু হাতে
বিশ্ব-মায়ের আঙ্গিনাটী ঝাট্ দিয়ে যায় প্রাতে।

শীতের পল্লী

গোলাম মোস্তাফা

রাতের বেলার কন্‌কনে শীত সব হ'য়ে যায় দূর,
বড়ই মিঠে লাগে রেঁ ভাই শীতের এ রোদ্দুর।
ঘরের দাওয়ায় রোদ আসে যেই, খোকাখুকুর দল
অম্‌নি সেথায় জটলা ক'রে জাগায় কোলাহল।
পাটালি গুড়, টাট্‌কা মুড়ি দেয় পূরে সব মুখে,
মচ্‌মচিয়ে খায় সবে সেই রৌদ্রে ব'সে সুখে!
শীতের চোটে কাঁপতে থাকে,—হাত-পা যে অ-বশ,
তবু সবাই ঢকর্-ঢকর্ খায় খেজুরের রস!

দুপুর বেলা পুকুরেতে স্নান করা যে দায়
পুকুর পাড়ে ব'সে সবাই রৌদ্র লাগায় গায়।
জলের ভিতর নাম্‌তে কারো চায় না যেন প্রাণ,
দু-এক ডুবেই কোনমতে শেষ ক'রে দেয় স্নান।
গা মোছে আর কাঁপ্‌তে থাকে বাজিয়ে দাঁতে দাঁত,
বরফ সম ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে সবার হাত।

বিকেল বেলা রাস্তা দিয়ে লাল আলোয়ান গা'য়
কত লোকে হাটের পথে হাট করিতে যায়।
অস্ত রবির রাঙা আলোয় লাল হ'য়ে যায় মাঠ,
নীরব হ'য়ে আসে ধীরে গাঁয়ের পথ ও ঘাট।
মস্‌জিদেতে আজান পড়ে, শুন্‌তে লাগে বেশ,—
এম্‌নি ক'রেই পাড়াগাঁয়ের দিন হ'য়ে যায় শেষ।



অচল সিকি

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র শীল

উপাধি সিংহ হ'লেও এবং সহপাঠিরা 'সিঙ্গি' ব'লে ডাকলে-ও দ্বিজদাসকে দেখ্‌তে কিন্তু মোটেই সিংহের মতো ছিল না, বরং সে ছিল রোগা ছিপ্‌ছিপে। রোগা হ'লে কি হয় তার জেদ ছিল অনেকটা সিংহের মতোই ভয়ঙ্কর। যে-কাজটা করবে ব'লে সে একবার জেদ ধ'রত, সেটাকে সুসম্পন্ন না ক'রে কিছুতেই ছাড়ত না। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে সে, কাজেই অন্যলোকের অভাবে তার মাকে অনেক সময় ছেলের অনেক জেদই সহ্য করতে হোত এবং তিনি তাকে 'একরোকা' বল্‌তেন, শুনে দ্বিজদাস ভারী আনন্দ পেত।

সেদিন স্কুল থেকে ফেরবার পথে দ্বিজদাস একটা সিকি কুড়িয়ে পেলে। সেটাকে হাতে নিয়েই একবার তার মনে হোল ফেলে দিই। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার কী আবার মনে হোল, সে সিকিটি পকেটের মধ্যে রেখে বাড়ী এলো।

মায়ের কাছে সে কোনদিন কোন কথাই লুকোত না। সিকিটি সে মা'র হাতে দিল। মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পেলি? ··· কুড়িয়ে।

মা বল্‌লেন,—ছি বাবা, রাস্তার জিনিষ কি কুড়িয়ে নিতে আছে? যা এনেছ, এনেছ। ভবিষ্যতে আর কিছু কুড়িয়ে এনো না। এটা ঠাকুর তলায় দিয়ে দিলেই হবে'খন—বলে সিকিটার দিকে চাইতেই তিনি বললেন, ওরে এ যে একটা অচল-সিকি দেখ্‌ছি। জেনে শুনে ত' আর এ জিনিষ দেবালয়ে দিতে পারব না।

মার মুখে অচল-সিকির নাম শুনে দ্বিজদাসের চোখ দু'টী কিসের আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। গম্ভীর চালে হাসতে হাসতে সে ব'লে উঠ্‌ল,—মনে হয়, অচল ব'লে দুনিয়ায় কোন জিনিষ-ই নেই মা। তুমি দেখো আমি এটাকে চালিয়ে দেবো।

অচল সিকি

ডা. কার্ত্তিকচন্দ্র শীল

দ্বিজদাসের মুখপানে চেয়ে তিনি বলে উঠলেন— ঐ অচল সিকিটা কি তুই চালাতে চাস্ নাকি ? ওতে অপরাধ করা হয়।

একটা জোয়ান ভিখিরীর কথা মনে পড়ে দ্বিজদাসের মনটা হঠাৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। সে স্কুল যাবার পথে প্রায় দিনই লক্ষ্য করেছে, একটী ভিখিরী রোজই হাত পেতে বসে থাকে। সে কাণা সেজে ভিক্ষে করে বটে, কিন্তু তার হাবভাব, কথা বলার ভঙ্গীতে দ্বিজদাসের ঘোরতর সন্দেহ হয় আসলে লোকটা কাণা নয়, ওটা একটা ভণ্ড। হঠাৎ তার জেদ যায় বেড়ে। সে মনে মনে ঠিক করে, ভিখিরীটা ভণ্ডামি ক'রে প্রত্যহ যখন লোক ঠকাচ্ছে, তখন ঐ অচল সিকিটা দিয়ে ওকেই ঠকানো উচিত। যেমন কাণা সেজে বসে থাকে, তেমনই জব্দ হবে।

সন্ধ্যার একটু পরে দ্বিজদাস সেই ভিখিরীটার কাছে এসে দাড়ান। ভিখিরীটি



নিত্য-দিনের মতো চোখ বুজিয়ে হাত পেতে তখনো বসে আছে। মাঝে মাঝে চাৎকার করছে, কাণা মানুষকে একটী পয়সা দিয়ে যাও বাবা—

দ্বিজদাস আস্তে আস্তে কাণা ভিখিরীটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে—খুচরো পয়সা ত' নেই, সিকির পয়সা দিতে পারবে ?

কাণাটা ব্যথিতের ভাণ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল, দেখতে ত' পাইনা বাবা, গুণে দেখুন না কতো আছে।

মনে একটু শক্তি সঞ্চয় ক'রে, দ্বিজদাস তার হাত থেকে পয়সা তুলে গুণতে লাগল বললে, সাড়ে তের পয়সা রয়েচে।

অচল সিকি

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র শীল

একটু থেমে কি ভেবে দ্বিজদাস বললে,—তোমায় দোব যখন মনে করেছি, না হয় আড়াই পয়সাই দিলুম। এই নাও সিকি,—বলে সেই অচল সিকিটি তার হাতে দিয়ে পয়সাগুলি তুলে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে স'রে পড়ল।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বাড়ীর দরজার কাছে এসে, আবার সে ঘুরে গেল। মনে মনে বললে, 'না, কাণা সেজে ও লোককে ঠকায় ঠকাক্, আমি তাকে ঠকাই কেন?' বলে সেই কাণার বসবার জায়গাটীর দিকে ফিরে চলল। গিয়ে শুনলে, কাণা আজ অনেকটা আগেই চলে গেছে। তার মনটায় কি জানি কেন ভারি কষ্ট হ'লো।

* * * *

এর পর প্রায় সাত আট মাস কেটে গেছে। তার দাদামশাই অসুস্থ হওয়ায় তার মা তাকে প্রতিবেশী রামকমলবাবুর তত্ত্বাবধানে রেখে স্বগ্রাম চাকদহে চলে গেছেন। রামকমলের বাসায় থেকে দ্বিজদাস লেখাপড়া করে, মাঝে মাঝে ছুটি ছাটায় রামকমল-দা' তাকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসে, সে বাড়ী যায়।

মজার কথা এই যে, সেই সিকি দেওয়ার ঘটনার পর থেকে দ্বিজদাস আর সেই ভিখিরীটাকে সেখানে ভিক্ষে করতে দেখতে পায়নি কোনদিনই। দ্বিজদাস ভাবে, হয়ত সে মরে গেছে,—না হয়ত তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। কি বা কতো এলোমেলো ভাবনায় সে ছট্‌ফট করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন কিনারা ক'রে উঠ্‌তে পারে না।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরে সে দাদুর একখানি চিঠি পেল, লেখা আছে—মা'র অসুখ, চলে এসো।

বার আনা দিয়ে একখানা টিকিট ক'রে, বাকী চার আনা পয়সা কাছে দিয়ে, রামকমল তাকে সাড়ে আটটার ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ চলার পর ট্রেণখানা কি একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। তৃষ্ণায় তার বুকের কাছটা ফেটে যাচ্ছে— দ্বিজদাস চেঁচাতে লাগল, পানি-পাঁড়ে এই পানি-পাঁড়ে।

কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। খরিদ্দার পাবার লোভে সোডা লেমনেড-ভেণ্ডার বলে উঠ্‌ল, পানি-পাঁড়ে ত' নেই বাবু, লেমনেড কিম্বা আইসক্রীম খাবেন?

অচল সিকি

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র শীল

তাই দাও একটা। লেমনেডওলা গাড়ীতে উঠে এলো। গাড়ী ছেড়ে দিলে।

* * * *

দাম দিতে, সিকিটা বাজিয়ে লেমনেডওলা বললে, বাবু আর একটা দিন, এ সিকিটা ঠিক নেই। শুনে দ্বিজদাস চমকে উঠল—মুখখানা তার মড়াব মতো শাদা হয়ে গেল! বললে, ওটা অচল? কৈ দেখি? সে নিজে বাজাতে লাগল। এখন উপায়! তার কাছে ত' আর একটী পয়সাও নাই!

একজন আরোহী করুণাপরবশ হয়ে বললে, কৈ দেখি হে ছোকরা, দেখি— সিকিটা বাজিয়ে, কৈ নাঃ, ঠিকই ত' আছে দেখ্‌চি।

—ঠিক আছে? দ্বিজদাস উল্লাসে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আবোহীটী সিকিটা লেমনেডওলার দিকে বাড়ালে, কিন্তু সে ঘাড় নাড়তে লাগল।

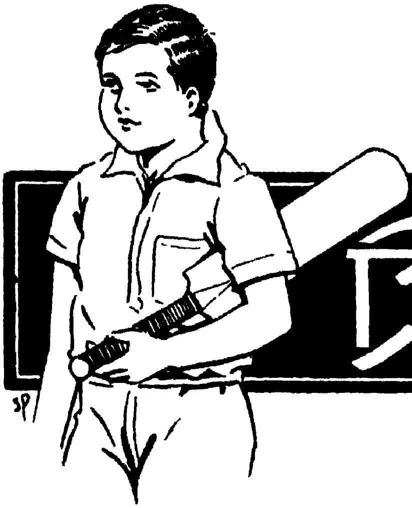
আর কোন আরোহী কোন কথা বলে না দেখে, দ্বিজদাস সেই আরোহীটীব উদ্দেশ্যে বললে, যখন ঠিক আছে বলছেন, তখন আপনাব কাছ থেকেই না হয় এটা ভাঙিয়ে দিন না। আমাব কাছে আব পয়সা নাই।

ভদ্রলোক একেবারে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল, তুমি ত' ভারী জ্যেঠা ছোক্‌রা দেখ্‌ছি হে! এর মধ্যেই জুচ্চুরি করতে এতো পেকে উঠেচ?

অভিমানে দ্বিজদাস কেঁদে ফেল্‌লে। সেদিন অচল সিকি চালানোর কাহিনী হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। সোডাওলাব হাতটা ধরে সে বলে উঠ্‌ল, আমার কাছে আর একটীও পয়সা নেই, এই আমার পকেট দেখ। তোমাব লেমনেডের দাম দু' আনা, তুমি এই সিকিটি নিয়ে আমায় রেহাই দাও ভাই, আমার মা'র বড্ড অসুখ······

ট্রেণের গতি কমে এল, দ্বিজদাস স্পষ্ট শুনতে পেল ষ্টেশনেব একটা কুলি হাঁকচে, 'চাকদহ।'

সোডাওলা কি ভেবে সিকিটা না নিয়ে আর কোন কথা না বলে নেমে গেল, দ্বিজদাসও কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছে ছোট পুঁটলিটী নিয়ে অপরাধীর মতো নেমে পড়ল। তার কাণে স্পষ্ট আওয়াজ এলো সেই আরোহীটী বলচে, দেখলেন মশাই, এই বয়সেই কেমন সুন্দর শিখেচে!···



ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

ন' বছরের দাশু। বাড়ীশুদ্ধ সব্বাই ডাকে—'দাশুবাবু।'

যেমন মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, তেমনি ফুটফুটে সুন্দর তার গায়ের রঙ,—ভারি মোলায়েম স্বভাব। পড়াশোনায় ক্লাশের মধ্যে সে সবচেয়ে সেরা। খালি পড়াশোনায় সেরা ব'ললে অন্যায় বলা হবে,—সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে তার জোড়া নেই,—গত বছর ইস্কুলে দৌড় আর লাফালাফিতে সে প্রথম হ'য়ে পুরস্কার পেয়েছিল।

আবার শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে—এই ছোট্ট ন' বছরের দাশু, বড় বড় পুকুর সাঁতার দিয়ে পার হ'তে পারে।

এ বছর তার জন্মদিন উপলক্ষে, অনেকে অনেক জিনিস তাকে উপহার দিলেন। কেউ ফুলের তোড়া, কেউ ছবির য়্যালবম্, কেউবা ছোটদের ভালো ভালো গল্পের বই—এমনি কত রকম।

তার কাকামণি ছিলেন মস্তবড় একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়।

তিনি বাজার থেকে একখানা খুব সুন্দর দামী ব্যাট কিনে এনে দাশুবাবুর হাতে দিয়ে ব'ললেন—কাল থেকে আমার কাছে খেলা শিখিস। তোকে আমি বড় খেলোয়াড় বানিয়ে তবে ছাড়বো।

দাশুর আনন্দ দেখে কে!

ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

হেসে, দৌড়ে, লাফিয়ে—জন্মদিনের ধুমধামের বাড়ীখানা সে-যেন তোলপাড় ক'রে তুললে। ওঃ—কাকামণির মতন ক্রিকেট খেলোয়াড় হ'তে পারলে, ইয়া বড় বড় গোঁফ-দাড়ীওয়ালা খেলোয়াড়দের সঙ্গে সে ম্যাচ খেলবে। সে তো এখন 'ক্লাশ ফোর'এ পড়ে,—দিন পনের কাকামণির কাছে খেলা শিখতে শিখতেই সে দিব্বি ক্লাশ 'নাইন-টেন'এর ছেলেদের সঙ্গে ম্যাচ খেলবে। খেলবেই সে।

পরের দিন থেকে দাশুর কাকামণি সত্যি সত্যিই দাশুকে খেলা শিখাতে সুরু করলেন।

বেশীদিন নয়, দিন পাঁচ-সাত খেলতে খেলতেই দাশু ক্রিকেট খেলার ফিকিরগুলো বেশ বুঝ্‌তে পারলে। এখন আর তাকে পায় কে। ইস্কুল থেকে এসেই বই দপ্তর রেখে ব্যাট করা, বল করা—সব অভ্যাস করে।

সেদিন 'ক্লাশ-নাইনের' অমল এসে দাশুকে ব'ললে—তোর ব্যাটখানা নিয়ে ও-বেলা মাঠে যাস। 'ক্লাশ-টেন'-এর ছেলেদের সঙ্গে একটা ম্যাচ্ আছে। তোকে আমরা খেলতে নেব।

দাশুর মনে মনে খুব আনন্দ হ'লো। তার চেয়ে বয়সে বড়'-রা তাকে যেচে ম্যাচ্ খেলতে ডেকেছে। ইয়ারকির কথা নয়। তাদের 'ক্লাশ-ফোর'-এ তো অনেক ছেলে র'য়েছে,—কে পারে তার সঙ্গে? কাকে অমল দা' ডাকলে?

দাশুর যেমন আনন্দ তেমনি অহঙ্কার।

ম্যাচের সময় ছিল বেলা চারটেয়। দাশু কিন্তু দু'টো বাজতে-বাজতে, ফ্লানেলের হাফ্-শার্ট আর খাকী হাফ্-প্যান্ট প'রে, শাদা ক্যাম্বিসের জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে হেল্‌তে-দুল্‌তে ব্যাট হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়লো।

মাঠে গিয়ে দেখে,—কারুর দেখা নেই।

সারা মাঠে শীতের মিষ্টি রদ্দুর সবুজ ঘাসের উপর এলিয়ে প'ড়েছে।

দাশু একপাশে ব'সে ব্যাটখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, এক-দু'জন ক'রে খেলোয়াড়রা আসে আর দাশুর ব্যাটখানা দেখে খুব তারিফ্ করে।

আহরিকা

ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সাত আট জনের বেশী খেলোয়াড় জমলো না। অথচ সময়ও হ'য়ে এসেচে।

যাদের সঙ্গে ম্যাচ হবে, তাদের তো দেখাই নেই—এক প্রাণীও আসে নি।

দলের ক্যাপ্টেন অমল।

সে ব'ললে—ওরা পারবে কেন আমাদের সঙ্গে। ভয়ে এলো না। যাক গে; এক কাজ করা যাক। আয় আমরা সব নিজে নিজে দু'টো দল ক'রে খেলা সুরু করি। দেখি কে কত 'রান' করতে পারে।

দাশু সব বিষয়ে ভালো হ'লেও, একটা তার দোষ ছিল। ভারি লাজুক সে। বাজে বকতে বা ইয়ারকি দিতে সে মোটেই জানতো না।

সবাই যখন খেলার আমোদে আপন-আপন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েচে, দাশু তখন কোণ-ঠেসা হ'য়ে একধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

খেলা সুরু হবে,-- হুইশেল পড়লো।

দাশু ব্যাটখানা নিয়ে তখনো একপাশে দাঁড়িয়ে। মুখচোরা ছেলে, এগিয়ে এসে বলতে পারে না—কি,--'অমল দা, আমি কোন্ দিকে।'

অথচ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমলেরই প্রতীক্ষা করছিল।

অমল এগিয়ে এলো।

দাশুর ব্যাটখানা ওর হাত থেকে টেনে নিতে নিতে ব'ললে দে তো তোর ব্যাট। দেখি একবার। আজ আমি একাই একশো 'রান্' করবো।

দাশু ব্যাটখানা দিলে। তারপর তাকে খেলতে হবে ভেবে, এক জায়গায় তৈরী হ'য়ে দাঁড়ালো।

একজন একজন ক'রে সব্বাই ব্যাট ধরলে। কিন্তু তেমন 'রান' করতে কেউ পারলে না।

অমল একাই একশো 'রান্' ক'রবে ব'লে স্পর্দ্ধা ক'রেছিল, সে তো এক বলেই 'আউট্' হ'য়ে গেল।

দাশু কিন্তু খেটেই সারা হয়।

সে খালি বল কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ায়। নিজের পালা এলো, তবু কেউ ব'ললে না যে, 'দাশু, ব্যাট ধর।'

ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

দাশু লাজুক, মুখচোরা।

ব্যাট ধর্‌বার ইচ্ছে তার মনে প্রবল হ'য়ে থাকলেও, ভাবে-ভঙ্গীতে তেমন আগ্রহ দেখালো না।

একমাত্র দাশু ছাড়া, একে-একে সবাই ব্যাট ধরলে। একজন ক'রে আউট হয়, আর দাশুর হাত দু'টো নিশ্‌-পিশ্‌ করে। ভাবে এইবার বুঝি তার ডাক হবে।

কিন্তু কেউ তাকে ডাকলো না।

তার ব্যাটখানা তখনো দলের পাণ্ডা অমলবাবুর হাতে।

দাশু ছাড়া অন্য সকলের ব্যাট করা শেষ হ'য়ে গেলে, অমল হুইসেল্‌ দিয়ে হাঁকলে—ঠিক জায়গায় সব তৈরী হ'য়ে দাঁড়াও। আবার নতুন ক'রে খেলা সুরু হবে। এবার আমি আগে ব্যাট ধরবো।

দাশুর চোখ দুটো ছল-ছল ক'রে উঠলো। তবু সে একবার মুখ ফুটে কোনো কথা ব'লতে পারলো না।

অমল তখন দাশুর সেই ব্যাটখানা বেশ ক'রে বাগিয়ে ধ'রে তৈরী হ'য়েছে। বল্‌ পেলেই যেন মারবে।

ঠিক এমনি সময় ইস্কুলের হারু মাষ্টার এসে হাজির।

ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—ওদের দল বুঝি আসে নি? তোমরা সব নিজে নিজে খেলছো? এ কি,—বাঃ বাঃ এযে দাশুবাবুও খেলতে এসেছে দেখছি। বেশ—বেশ! তা কে-কত 'রান্‌' করলে হে? অমল?

অমল ব'ললে—কেউ সে রকম কিছু করতে পারি নি স্যর্‌! সবশুদ্ধ মোট সাতের 'রান্‌' হ'য়েছে।

হারু মাষ্টার তখন দাশুর দিকে ফিরে ব'ললেন—আর তুমি?—তুমি একা কত 'রান্‌' করলে, দাশু?

দাশু কিছু না ব'লতেই অমল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো—ও তো নেহাৎ ছেলে-মানুষ। মোটে 'ক্লাশ ফোর-'এ পড়ছে। ও কি আর ব্যাট করতে পারে, স্যর্‌? ওকে আমি খেলা দেখতে ডেকে এনেছি। ব্যাট করতে দিয়ে শেষটায় খুন জখম হবে?

হারু মাষ্টার ব'ললেন—সে কি! দাশু একবারও ব্যাট করে নি?

ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

অমল জবাব দিলে—নাঃ। আমিই তো ওর হ'যে ব্যাট করছি।

হারু মাষ্টার হেসে ব'ললেন—ও, তাই নাকি! বেশ-বেশ। তা অমল, তুমি দেখছি নতুন ব্যাটও একখানা কিনে ফেলেছ। খাসা ব্যাট তো!

অমল লজ্জিত হ'লো।—মুখ নামিয়ে ব'ললে—ব্যাটখানা দাশুর স্যর। আমার নয়।

হারু মাষ্টার হেসে ব'ললেন—তাই নাকি। দাশুবাবুকে তবুও তোমরা ব্যাট করতে ডাকো নি। যার এমন সুন্দর ব্যাট থাকে, সে বুঝি খেলতে জানে না ভাবছ? .. আচ্ছা, আমাকেও নেবে খেলতে তোমরা?

সব ছেলেরাই খুশী হ'যে উঠলো।

খেলা সুরু হ'লো।

হারু মাষ্টার এক সময় দাশুকে ডেকে ব'ললেন ব্যাট ধরো, দাশু। এইবার তোমার পালা।

অমল ব'ললে—ছেলে মানুষ, ও কি আর খেলতে পারবে?

তবু মাষ্টার দাশুকেই ব্যাট করতে ব'ললেন।

মাঠের সব ছেলেগুলিই 'ক্লাশ-ফোর'-এর দাশুবাবুর খেলা দেখে অবাক। কারুর চোখের আর পলক পড়ে না যেন।

দাশু পাক্কা আধ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে সবশুদ্ধ তেইশটি 'রান' করলে। অত আর কেউ পারে নি। মাষ্টার হারুবাবুও পারেন নি।

যে বলগুলি তীরের মত বেগে আসে, দাশু সেগুলি আস্তে ঠেকায়, আর যে সব বল খুব বেশী জোরে আসে না, দাশু সেইগুলিই হিট্ করে।

শেষটায় 'কট-আউট' হ'যে গেল সে।

হারু মাষ্টার তখন দাশুকে ব'ললেন- সাবাস দাশুবাবু। এইবার তুমি বল করো।

অমল ব্যাট ধ'রেছে।

দ্বিতীয় বলেই দাশু মাঝের ক্রিকেটখানা উড়িয়ে দিয়ে অমলকে 'আউট' ক'রে ফেললে।

ছেলের দলে হাততালি প'ড়ে গেল। আর কী সে হাসি।

আহেরিকা

ক্রিকেট ম্যাচ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

হাক মাষ্টাব তখন দাশুর পিঠ চাপড়ে ব'ললেন—ভারি খুশী হ'লাম, দাশু। জানো হে, ছোক্‌বাবা ?—শুনচো অমল ? --দাশুকে তোমবা ছেলেমানুষ ভেবে অগ্রাহ্য ক'রোনা।



দেখবে, তোমাদেব মধ্যে এই দাশুই একদিন সত্যিকাবের পাকা খেলোয়াড় হ'তে পারবে

*   *   *   *

সেদিন দাশুর চেয়েও বেশী আনন্দ হ'য়েছিল কা'র জানো ?—দাশুর কাকামণির



পলাতকা



জসীমউদ্দীন

হাস্থ ব'লে একটি খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে,
না জানি কোন্ অজান দেশে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে।
বন হ'তে সে পালিয়ে গেছে, বনে কাঁদে বনের লতা,
ফুল ফুটে কয়, সোনার খুকু! ছেড়ে গেলি মোদের কোথা?
বনের ছিল অপ্সরী সে, চলত পথে নূপুর পায়ে,
গাছের শাখা দুলিয়ে পাতা—করত বাতাস তাহার গায়ে।
তাহার শাড়ীর আঁচল লাগি ঝুম্‌কো-লতা দুলত বনে,
গাছে গাছে ফুল নাচিত তাহার পদধ্বনির সনে।
বনের পথে ডাকত পাখী, তাদের স্থরের ভঙ্গী ক'রে—
কচি মুখের মিষ্টি ডাকে সারাটি বন ফেলত ভ'রে।
প্রতিধ্বনি তাহার সনে করত খেলা পালিয়ে দূরে,
স্থরে স্থরে খুঁজত সে তায় বনের পথে একলা ঘুরে।
সেই হাস্থ আজ পালিয়ে গেছে, পাখীর ডাকের দোসর নাহি,
প্রতিধ্বনি আর ফেরে না তাহার স্থরের নকল গাহি।

পলাতকা

জসীমউদ্দীন

হাসু নামের একটি খুকু পালিয়ে গেছে অনেক দূরে,
কেউ জানে না কোথায় গেছে কোন্ বা দেশে কোন বা পুরে।
বাপ জানে না, মা'য় জানে না, কোথায় যে সে পালিয়ে গেছে
সেও জানে না, কোন্ সুদূরে কে তাহারে সঙ্গে নেছে।
কোনোখানে কেউ ভাবে না, কেউ কাঁদে না তাহার তরে,
কেউ চাহে না পথের পানে কখন হাসু ফিরবে ঘরে।
মা'য় কাঁদে না, বাপ কাঁদে না, ভাই বোনেরা কাঁদছে না তার,
খেলার সখি কেউ জানে না, সে কখনও ফিরবে না আর।
ফিরবে না সে ফিরবে নারে, খেলা-ঘরের ছায়ার তলে,
মিলবে না সে আর আসিয়া তার বয়সের শিশুর দলে।
পেয়ারা-ডালে দোল্না খালি, ইঁদুরে তার কাটছে রশি,
চোড়ুই-ভাতির হাঁড়ীর পরে' কাক দুটি আজ ডাকছে বসি।
খেল্নাগুলো ধূলায় পড়ে, হাত-ভাঙা কার, পা-ভাঙা কার,
ঝুম্-ঝুমিটি বেহাত হ'য়ে বাজছে হাতে যাহার তাহার।

এ সব খবর কেউ জানে না, সে জানে না কেমন করে
কখন যে সে পালিয়ে গেছে তাহার চির জনম তরে।
জানে তাহার পুতুলগুলো অনাদরে ধূলায় লুটায়,
বুকে করে আর না চুমে, পুতুল-খেলার সেই ছোট মা'য়।
মাতৃহারা মিনি-বিড়াল কেবা তাহার দুঃখ বুঝে;
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সে তার ছোট্ট মায়ের আঁচল খুঁজে।
খেলা-ঘর আজ পড়ছে ভেঙে, শিশু-কল-তানের সনে
পুতুল-বধূ আর সাজে না পুতুল-বরের বিয়ের ক'ণে।

হাসু নামের সোনার খুকু আজ যে কোথা পালিয়ে গেছে,
সাত-সাগরের অপর পারে কে তাহারে ভুলিয়ে নেছে।
পালিয়ে গেছে সোনার হাসু ;—খেলার সাথী আয় রে ভাই,-
আজের মত শেষ খেলাটি এইখানেতে শেষ ক'রে যাই।
যেখানটিতে খেলেছিলেম 'ভাঁড় কাটি' সঙ্গে নিয়ে
সেইখানটি দে রুধে ভাই ময়না-কাঁটা পুঁতে দিয়ে।



খোকন

কিরাটিকুমার

ছেলেটী কেঁদে ওঠে, বলে, মা, খাবার দাও, খিদে পেয়েছে। নীরবে মায়ের চোখে জল পড়ে, বলেন, বাবা, খাবার পাব কোথায়? তুই যে গরীবের ছেলে। অবোধ শিশু বোধ মানে না, শুধু কাঁদে। মা সরে যান। আড়ালে গিয়ে চোখের জল ফেলেন আর বলেন, ভগবান, ঐটুকু আমার বাঁচিয়ে রেখো।

*   *   *   *

ছেলেটীর নাম খোকন্ মা-ই রেখেছেন। মা পাশের বাড়ীতে কাজ করেন। যা কিছু পান, তাতে অতি কষ্টে সংসার চলে। ছেলেটী যখন কাঁদে মা তখন বলেন, বাবা তুমি বড় হও, লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, তখন কত খাবে, আমাকে কত খাওয়াবে। বলতে বলতে মায়ের মুখখানি সুদূর ভবিষ্যতের আশায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। অদৃশ্য-দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।

*   *   *   *

পাশের বাড়ীটী যেন ইন্দ্রপুরী। বিশ্বকর্ম্মা যেন তাঁর সমস্ত কারিকুরি ঐ বাড়ীটীর উপর খাটিয়েছেন। অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় সজ্জিত বাড়ীখানা যেন পাশের কুঁড়ে ঘরটাকে উপহাস করছে। ছেলেটীর মা ঐ বাড়ীতে কাজ করেন। বাড়ীটী দেখে ভাবেন, তাঁর ছেলে বড় হবে, ঐরূপ অট্টালিকার মধ্যে তিনি বাস করবেন। লোকে তাঁকে

খোকন

কিরীটিকুমার

বলবে, 'রাজার মা'। আনন্দে মায়ের বুক ফুলে ওঠে। কাজে অন্যমনস্ক হ'য়ে ওঠেন, সময়ে সময়ে কাজ করতে ভুলেই যান। তার জন্য নিত্য তাঁকে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রতে হয়। মায়েব মন তাতে ব্যথিত হয়, নীরবে চোখেব জল গড়িয়ে যায়, ভাবেন আর কতদিন! · খোকন্ তার বড় হবে—এখন ত' সে অবোধ শিশু। বাঁচবে ত'! মায়ের মন চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ··ষাট্-ষাট্! তিনি যে মা, অমন অমঙ্গলের কথা কি মনে করতে আছে! আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন প্রার্থনা করেন, খোকনেব মঙ্গল কামনায়-- আবাব তখনি কোন কাজে লেগে যান কথাটাকে ভোলবার জন্য।

*   *   *   *

পাঁচ বছব পরে·· এখনও মা সেই কাজ কবেন। খোকন্ এখন আট বছরের। গাঁয়ের পাঠশালায় পড়ে। মাষ্টারবা বলেন ছেলে খুব বুদ্ধিমান। মা আনন্দে স্ফীত হন। খোকন্‌কে কোলে টেনে নেন্, বলেন, ওরে খোকন, খোকন্ রে। ছেলেটি মুখ তুলে চায়, বলে, কি মা কি? মা তখন খোকনেব সাথে শিশুর মত খেলা কবেন।

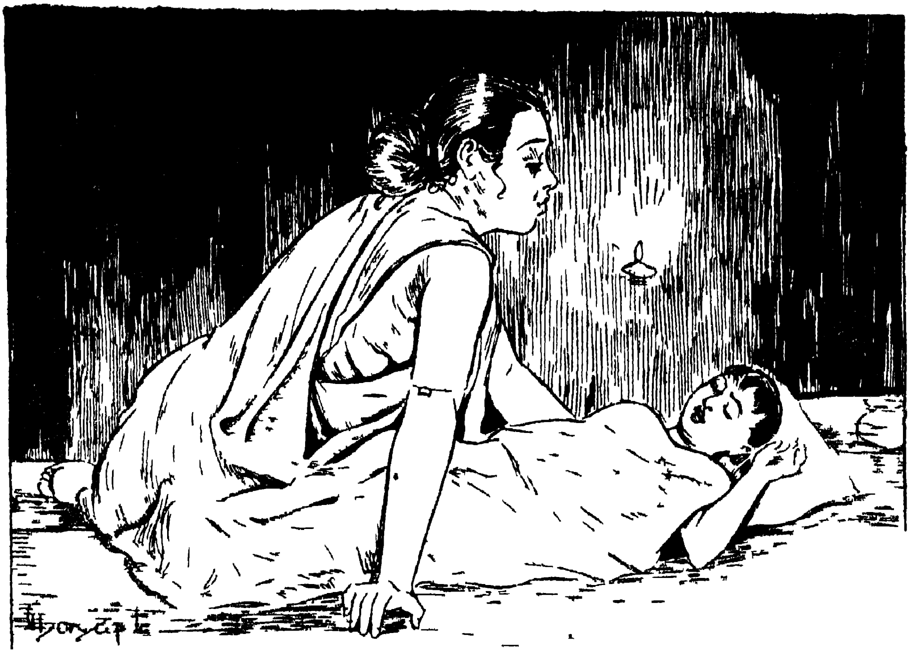
দিন পাঁচ-ছয় পরে · খোকনের সাথে বাবুদেব ছেলে মণ্টুব খুব ভাব। খোকন্ যায় মণ্টুব বাড়ীতে খেলাব তরে। মণ্টুব বাপ মা সেটা পছন্দ কবেন না। 'একটা ছোটলোক · ঝিয়ের ছেলের সাথে তাঁব ছেলে কিনা অবাধে মিশবে! মণ্টুকে ডেকে বলেন, তুমি ওব সাথে মিশতে পাবে না। ও ছোটলোকেব ছেলে ও-ব সবাই ভাল। এতদূব সাহস--আমার ছেলের সাথে মেশে। খোকনেব মা কাজ কবতে কবতে শুনতে পান। কাজ ফেলে ছুটে যান খোকনের কাছে। খোকনকে ডেকে ধমকে বলেন, তুমি ভারী দুষ্টু হ'য়েছ—মণ্টুর সাথে মেশ কেন? জান-না ওবা বড়লোক আর আমরা···আব বলতে পাবলেন না।···জল গড়িয়ে গেল চোখের দু' কোণ বেয়ে। খোকনও কেঁদে ফেলেছিল। মা তাড়াতাড়ি খোকনের সামনে হ'তে সরে গেলেন। মন তাঁর ভারি হ'য়ে উঠেছিল। একদিনও তিনি খোকন্‌কে বকেন নি—আজ প্রথম। সেদিন আর কাজ করতে গেলেন না তিনি।

*   *   *   *

পাশের বাড়ীতে বিবাহ—মহা উৎসব। লোকজন দিন রাত যাতায়াত করছে। আর কুঁড়ে ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে খোকন্, পাশে বসে মা। আজ চার দিন হ'ল খোকনের

খোকন

প্রবল জ্বর—জ্বরের ধমকে প্রলাপ বকচে। মা শুধু ভগবানকে ডাকছেন। হাতে একটি পয়সা নাই—ডাক্তার ডাকবার মত সামর্থ্যও নাই। তাই শুধু ডাকছেন 'তাঁকে' তাঁর ছেলের মঙ্গলেব জন্য।



বাত দু'টো। মলিন শয্যাব ওপব শুয়ে আছে খোকন। প্রলাপ বকচে, আমি ছোট-লোক গরীব মন্টু বড়লোক। না ভাই মন্টু, তুমি আমাব সঙ্গে আব মিশো না। মা বকেচেন, তোমার বাবা এতে বাগ করবেন। পাশেব বিয়ে-বাড়ীর সানাযেব সুর তখন বেজে ঠছে মিলন-বাগিণীর সুরে। খোকন্ একবাব চীৎকাব কবে উঠল—মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার র উঠলেন আশঙ্কায়। পাশের বাড়ীব বিযের তখন লগ্ন। তার পাশে ভেসে এল' এক ছেঁড়া ক্ষীণ করুণ আওয়াজ · খোকন্। ওরে আমার খোকন্ বে! · পাশের বাড়ীর সবের মাঝে এব দাম কিছুই নয়। ও-যে 'গরীবেব ছেলে'।



রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সেদিন শনিবার—শনিবারে ক্লাশে বইয়ের পড়া থাকে না ; মাষ্টার মশায়রা মুখে মুখে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ছেলেরা তাই বই নিয়ে স্কুলে যায় না, খাতা নিয়ে যায় ; —কেউ বা এক্‌সাইজ খাতা, কেউ বা শ্রীরামপুরী কাগজের, কেউ বা বালির।

তখনও স্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ে নি। ছেলেরা পুষ্করিণীর ধারে, মাঠে, রাস্তায়, জলখাবার ঘরে, ক্লাশে টেবিল ও ডেস্কের নীচে মার্ব্বেল, লাট্টু, ভানুমতীর খেলায় মত্ত। দু' চারজন বড় বড় ছেলে জলখাবার ঘরের পিছনে ও মালীর ঘরেও কি যেন করছে। ছেলেদের চীৎকারে, ডেস্ক বাজানোর শব্দে, হাততালিতে স্কুল-বাড়ীটা ফেটে যাবার মত। মাঝে মাঝে এক একবার সুতীক্ষ্ণ শব্দ হয় ; শব্দটা কাণে গিয়ে লোহার শলার মত বেঁধে। তাতে মগজ পর্য্যন্ত শির্ শির্ করে ওঠে।

হুড়োহুড়ি ও চীৎকার সব চেয়ে বেশী ছিল, ক্লাশ ফোরের সামনে ও-ঘরে।

প্রতুলের পায়ে নতুন চটি। গোপীলাল বল্‌লে—"ওরে বাবাঃ! প্রতুল আজ নতুন চটি পরেছে—"

তার কথায় কেউ কেউ সেদিকে চেয়ে দেখ্‌লে। প্রতুলের গায়ের জামাটাও ছিল নতুন ও লাল নীল ডোরা-কাটা।

গোপীলাল আবার বল্‌লে—"ওরে বাপ্‌স্! আবার রঙ্গীন সার্ট গায়ে দিয়ে বাটার-ফ্লাই—"

প্রতুল তখন ক্লাশে ঢুক্‌ছিল। বল্‌লে—"শাট্ আপ্—"

রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

অশোক তখন লাটুতে লেত্তি জড়াতে জড়াতে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে। সে গোপীলালকে পছন্দ করে না। বল্‌লে—"বাটারফ্লাই মানে জানিস্?"

"তুই জানিস?"

"শিওরলি জানি—"

"কি বল না—"

"কেন বলব? তুই যে শিখে নিবি—"

"ভারী একটু ইংরেজী শিখেছেন তাই আবার জানান হচ্ছে। খোসামুদে কোথাকার!"

"টেক্ কেয়ার—"

"আমি কারুকে ভয় করি না—" বলে সে বুক ফুলিয়ে ঘুষি পাকিয়ে অশোকের দিকে এগিয়ে গেল।

অশোক ইংরেজী জান্‌লেও তার গায়ে জোর কম। সে বল্‌লে "গায়ের জোর দেখান হচ্ছে?"

প্রতুল এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বল্‌লে—"গুপে, ওর গায়ে যদি হাত তোল—"

"কি করবি? বড়লোকের ছেলে বলে আমি ওকে খাতির করি না—"

"আমাকে ধামাধরা বল্‌ছিস্?"

ইতিমধ্যে তাদের চারধারে আরও অনেক ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ "নারদকে" ডাক্‌ছে। কিন্তু নারদ এসে পড়বার আগেই এলেন, মাষ্টার রামবাবু।

তাঁকে দেখেই ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে ক্লাশের মধ্যে ঢুকে যে যার জায়গায় গিয়ে বস্‌ল। কখন ঘণ্টা পড়েছে তারা কেউ জানতেও পারে নি। গোপীলাল কিন্তু যাবার সময় প্রতুলের নতুন চটিশুদ্ধ পা-খানা মাড়িয়ে দিয়ে গেল।

প্রতুল "উঃ" বলে চীৎকার করতে গিয়েই সাম্‌লে নিয়ে নিজের জায়গায় বসে একবার তার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকালে। গোপীলাল তখন নিতান্ত ভাল মানুষের মত রামবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

রামবাবু গোপীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কুকুম্বার মানে কি বল্?"

৩৫

রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

গোপী বল্‌লে—"কুকুম্‌বার? কুকুম্‌বার মানে কুম্‌ড়ো—"

অশোক বসেছিল তার পাশে। ক্লাশ শুদ্ধ সকলে হেসে উঠ্‌ল। রামবাবু বল্‌লেন—"অশোক বল—"

"শশা—"

"দে ঐ কুমড়োটার কাণ মলে—"

অশোক মহা উৎসাহে গুরুর আদেশ পালন করতে গেল। গোপীলাল অশোকের চেয়ে লম্বা। সে মাথা সরিয়ে নিলে। মাথা সরলে কাণও সরে। গোপীলালের কাণও অশোকের হাতের বাইরে চলে গেল।

রামবাবু বললেন—"আচ্ছা, এবার বল। পরকুপাইন মানে কি?"

গোপীলাল বল্‌লে—"আনাবস—"

"বড় আনাবস খেতে ইচ্ছে হয়েছে, না? থাক বেঞ্চীর ওপর দাঁড়িয়ে—"

"না, স্যার, আর একটা ঠিক বল্‌তে পারব স্যার—"

"বল্, সজারুর ইংরেজী কি?"

"পাইন্যাপ্‌ল—"

"টকাটক্ বল্‌ছে রে! দাঁড়া বেঞ্চীর ওপর—"

"বল্‌ছি স্যার, সজারুর ইংরেজী পর্‌কুপাইন স্যার, পর্‌কুপাইন—বসি স্যার?"

রামবাবু বল্‌লেন—"না—"

গোপীলাল দাঁড়িয়ে রইল। সে একবার আড়চোখে দেখ্‌লে, অশোক হাস্‌ছে, প্রতুলের মুখেও হাসি। তার লজ্জাও করতে লাগ্‌ল; আবার ঐ দুজনের ওপর রাগও হ'ল, যেন ওদের জন্যেই তার এই শাস্তি।

যাই হোক, রামবাবু শাস্তি দিলেও ছেলেদের বেশী কষ্ট দেন না। কয়েক মিনিট পরেই গোপীলাল বস্‌ল। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, অশোক ও প্রতুলকে সে জব্দ করবেই।

অশোক ও প্রতুল তখন ভাব্‌ছিল, গুপেটার অপমানের শোধ নিতে হবে।

তারপর আর কিছু হ'ল না, তিনটি পিরিয়ড্ কেটে গেল। ছুটির ঘণ্টা বাজল, ঢং ঢং ঢং ঢং—

রামবাবুর বিচার

আহরিকা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সকলে হৈ হৈ শব্দে বার হ'ল।

স্কুলের পর ফাঁকা মাঠ। মাঠের পর একটা নালা। শীতকাল বলে নালাটা শুক্‌নো। নালার পর পাকা রাস্তা। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝাউ গাছ। পথের ওপর ঝাউয়ের পাতা ও ফল পড়ে আছে। বাতাসে ঝাউ গাছের শব্দ হচ্ছে—সোঁ—সোঁ—সোঁ। রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে চৌমাথায় শেষ হয়েছে। সেখানে অনেককালের পুরোনো একটা ঝাঁকড়া অশ্বত্থ গাছ আছে। গাছটা দিনরাত চট্‌পট্‌ শব্দে তালি দিচ্ছে। সেটা ছাড়ালে কিছু দূরে একটা ভাঙা বাড়ী। বাড়ীটার পিছনে একটা প্রকাণ্ড পুষ্করিণী। পুষ্করিণীটার চার ধারে ভাঙা পাঁচীল ও কুলের গাছ। পাঁচীলটার মাথায় ও নীচে রাম-তুলসীর জঙ্গল। জঙ্গলে আরও অনেক রকম ছোট ছোট গাছ। সেই বাড়ীতেও কেউ থাকে না, পুকুরেও কেউ নামে না। সেদিকে কারো বাড়ীও নেই, কেবল দূরে একখানা ছোট মাঠের মধ্যে মসজিদের পিছনে নিত্য-পাগলীর কুঁড়ে দেখা যায়। শীতকালে কুলগাছগুলো ভরে কুল পেকে ওঠে। তার কতক খায় পাখী, কতক পড়ে ঝরে, কতক খায় নিত্য-পাগলীর রামছাগলগুলো। —দের কেউ কেউ স— ...ও করে

ঠেলে, পাঁচীল টপ্‌কে কুল পাড়ে

পাঁচীলের ওধার থেকে একটা কুকুর মহানন্দে ছুট্‌তে

একজন গোপীলাল।

ছেলেরা প্রায় সকলে বা— তুলের এক পাটি চটি।

মালকোঁচা মারলে। তারপর বনক্ষণাৎ গোপীলালের কাণ ছেড়ে দিয়ে ছুট্‌ল।

খালি পা। উঠ্‌তে কষ্ট হ'ল জঙ্গলের মধ্য থেকে নিত্য-পাগলীর একটা লাল রঙের

রেখে গাছে উঠে পড়ল। খাত— বতে চিবতে বেরিয়ে এল। গোপীলাল অশোকের কাণ

সে গাছে উঠে একমনে —রলে।

উড়ে জঙ্গলের ওপর পড়ল। — চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দু'চোখে জল।

ওদিকে সেখান থেকে —

চটি জোড়া রয়েছে ঠিক গাছের গো— ক চটি, আর রামছাগলের মুখ থেকে খাতা উদ্ধার

গাছে উঠে কুল পাড়ছে, আর, বাঁ— তখন শোচনীয়। এ বিষয়ের তখন আর কিছু

হ'ল, সে চীৎকার করে বলে—"বাঁদর কু—

ঠিক গোপীলালের মত কুল খেতে লাগ্‌ল।

আহেরিকা

রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

কিছুক্ষণ গেল। সে হঠাৎ তাকিয়ে দেখে গোপীলাল নেই। সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে ; ডালে পাতায় কিছুই দেখা গেল না। সে তারপর আর গোপীলালের দিকে মনোযোগ দিলে না।

এদিকে গোপীলাল কিন্তু তাকে দেখে নি। সে গাছ থেকে পাঁচীলের ওপর নাম্‌ল। তার দু'পকেটে ভরা কুল। সে পাচীলে নেমে দেখে তার খাতাখানা নেই। ভাবলে হয়ত নীচে পড়ে গেছে। সে নীচে নেমে জঙ্গলের চারধারে খুঁজতে লাগ্‌ল নেই! কি হ'ল? বোধ হয় বাইরে পড়েছে। সেদিক থেকে পাঁচীলে ওঠা একটু শক্ত।

প্রতুল যে গাছে ছিল, তার কাছের পাঁচীলটা ভাঙা। সেখান দিয়ে বার হওয়া সহজ। সে সেইদিকে ছুট্‌ল।

প্রতুল দেখ্‌লে, গোপীলাল তার গাছের তলা দিয়ে সাঁ করে ছুটে বাইরে চলে গেল। মনে হ'ল, যাবার সময় সে গাছের গোড়া থেকে কি যেন কুড়িয়ে নিলে। প্রতুল ভাবলে, " তার চটি জোড়া! সে তাড়াতাড়ি ার,গাছ থেকে নাম্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু তক্ষণে গোপী পাঁচীল পার হ'য়ে আড়চৌলের পাশে সরু পথ দিয়ে ্ল ; ছে। তার আগে আগে শাক।

“বল, সজা [illegible]

ার বেশী স্কুলের লাইব্রেরীতে বসে জ্জা শোক এতক্ষণ “বিক্রমাদিত্যের ত্রিশ সিংহাসনের” গল্পগুলো পড়ছিল। তাই বাড়ী যেতে দেরী। এদিক দিয়ে গেলে, তাদের বাড়ীটা কাছে হয়।

রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

গোপী ভাবলে, অশোক তার খাতা নিয়ে পালাচ্ছে। সে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে পিছন থেকে তার কাণ চেপে ধরে বল্‌লে—"আমার খাতা ?"

ঠিক তখনই গোপীরও পিছন থেকে তার একটা কাণ খুব শক্ত ক'রে ধরে প্রতুল বল্‌লে—"আমার এক পাটি চটি ?" তার আর-এক হাতে এক পাটি চটি।

অশোক রাগে, দুঃখে, বিস্ময়ে ফিরে দেখে, গোপী। গোপীও রাগে ফুলতে ফুলতে দেখে, প্রতুল।

অশোক বল্‌লে "আমার কাণ ছাড—"

গোপী বল্‌লে -"তোমার চটি আমি কি জানি ? ছাড আমার কাণ " বলে সে মাথা ঝাঁক্‌লে।

প্রতুল বললে - "আগে চটি দে, তবে কাণ ছাড়ব– "

গোপীর কাণটা লাল হয়ে উঠেছে, খুব জ্বালা করছে, তবুও সে শক্ত করে অশোকের কাণ ধরে আছে।

এমন সময় তারা দেখ্‌লে, পাঁচীলের ওধার থেকে একটা কুকুর মহানন্দে ছুটতে ছুট্‌তে বেরিয়ে এল। তার মুখে প্রতুলের এক পাটি চটি।

প্রতুল লজ্জায় ও ভয়ে তৎক্ষণাৎ গোপীলালের কাণ ছেড়ে দিয়ে ছুট্‌ল।

ঠিক তখনই দেখা গেল, জঙ্গলের মধ্য থেকে নিত্য-পাগলীর একটা লাল রঙের রামছাগল গোপীলালের খাতা চিবতে চিবতে বেরিয়ে এল। গোপীলাল অশোকের কাণ ছেড়ে দিয়ে ছাগলটাকে তাডা করলে।

অশোক বেচারা সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার দু'চোখে জল।

তার পর কুকুরের মুখ থেকে চটি, আর রামছাগলের মুখ থেকে খাতা উদ্ধার হ'ল বটে, কিন্তু দু'টোর অবস্থাই তখন শোচনীয়। এ বিষয়ের তখন আর কিছু করবার ছিল না।

তিনজনেই বাড়ী চলে গেল।

রামবাবুর বিচার

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

সোমবার দিন ক্লাশ বসতেই অশোক গিয়ে রামবাবুর কাছে নালিশ করলে গোপীলালের নামে, গোপীলাল গিয়ে নালিশ করলে প্রতুলের নামে।

রামবাবু সমস্ত ব্যাপারটা শুন্‌লেন। শুনে ক্লাশের সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বল ত দোষী কে ?"

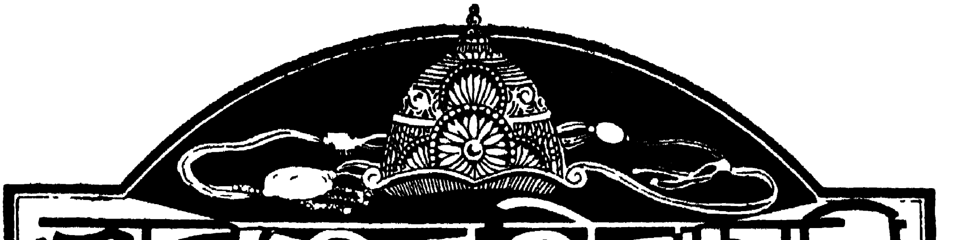
সকলেই বল্‌লে—"কুকুর ও রামছাগল—"

রামবাবু বল্‌লেন- "কিন্তু তাদের ত আর পাওয়া যাবে না, প্রতুল ক্ষমা চাও গোপীলালের কাছে, আর গোপীলাল মাপ চাও অশোকের কাছে—"

ছেলেরা কিন্তু রামবাবুর এ বিচারে খুশী হ'ল না, তারা ভাবতে লাগ্‌ল, নির্দ্দোষরাই শাস্তি পেয়েছে! দোষী দু'জন মহাস্ফূর্ত্তিতে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তোমাদের মতও কি তাই ?





ভারতের হীরামণি

আলোকদূত

ইতিহাস লেখাব হাজার হাজাব বছব আগে থেকে ভারত ছিল রূপকথার দেশ। দেশ-বিদেশের লোকে জানতো ভারতে পান্নাব গাছে চুনীব পাতা আর মুক্তাব ফল বারমাস ঝলমল করে, সেখানকাব চাষাভূষাব মেয়েরাই সোণা চাঁদীর গহনা পরে। বাজপুরীতে সোণাব ব্যবহাব ছিল তৈজসপত্রেব মত—নিত্য-ব্যবহার্য্য থালা ঘটিব মত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, যদিও হীরেব খাটে ঘুমন্ত বাজকুমারীব নিশানা কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিব উপর আমরা পাই না, তথাপি বামায়ণে, মহাভারতে, কালিদাসের কাব্যে বৈদুর্য্যমণি, অয়স্কান্তমণি, নীলকান্তমণি, কৌস্তুভমণি প্রভৃতির এত বেশী প্রাচুর্য্য দেখি যে, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে না। তার উপর ইতিহাসের আমলে যাঁরা ধনরত্ন লুণ্ঠনের মতলবে বার বার ভারতে হানা দিয়েছেন, তাঁবাও আর্য্যাবর্ত্তের অনেক মন্দির থেকে প্রচুর বহুমূল্য মণিমাণিক্য নিয়ে গেছেন। সেকালে হিন্দু-মন্দিরের বিগ্রহ তৈরী হতো সোণা-রূপা-তাঁমা প্রভৃতি ধাতুতে বা কোথাও নিকষ কোষ্ঠী পাথরে—মর্ম্মরে--দেবদেবীর চোখ দুটীব তারকা হ'তো অতি দামী হীবকে, গলায় মতির মালা—এক একটা মুক্তাব দামে রাজ্য কেনা যেতো—হাতে কেয়ূর ও বাজুতে থাক্‌তো নীলকান্তমণি, বৈদুর্য্যমণি। কাজেই ভিন্‌ধর্ম্মী যাঁরা ভারতে আস্‌তেন কেবল লুঠতরাজ ক'রতে তাঁদের সহজেই চোখে প'ড়তো এই সব মন্দিরেব বিগ্রহের জৌলস্‌ ও ঐশ্বর্যে। থানেশ্বর প্রভৃতি উত্তর ভারতের অনেক মন্দিরের বিগ্রহকে চূর্ণ ক'রে আক্রমণকারীরা নিয়ে গেছেন বহু ধনরত্ন মণিমাণিক্য জহরৎ।

অতি প্রাচীনকাল থেকে দেশ-বিদেশের মণিকার ও সদাগররা পালের জাহাজে চ'ড়ে, রোম, গ্রীস প্রভৃতি সুদূর রাজ্য থেকে এ-দেশে আস্‌তেন গোলকুণ্ডার হীরা কিনতে মদ্র-

আহেরিবক

ভারতের হীরামণি

আলোকদূত

দেশের উপকূলে। সে-যুগে গোলকুণ্ডার হীরাই ছিল গুণে বর্ণে পৃথিবীর সেরা, যেমন 'জল' স্ফটিকের মত নীলাভ—তার উপর খুব কড়া ধাতু,—অস্ত্রাঘাত ক'রলেও ঠিক্‌রে যেত। ট্যাভারনার (Tavainier) তার দিন-পঞ্জীতে লিখে গেছেন যে, ১৬৪০ হ'তে ১৬৮০ খ্রীঃ আঃ মধ্যে তিনি ভারতে ছ'বার মণিমুক্তা কিনতে এসেছিলেন এবং সে-সময়ে ভারতের জহরৎ-বাজারের সুনাম ছিল জগৎ জুড়ে। তিনি আরো বলেছেন যে যদিও সুমাত্রা দ্বীপে, বোর্ণিয়োতেও অল্পবিস্তর হীরা পাওয়া যেত তবুও ভারতের তুলনায় তা যৎসামান্য।

ভারতের হীরকের তুলনা নেই। এখনও বাজারে ভারতীয় হীরকের খুব ইজ্জৎ আছে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোগাসফনটেন্ (Jogersfontein) খনির প্রথম শ্রেণীর হীরকগুলি অনেকটা গোলকুণ্ডার হীরার গুণের অধিকারী হ'য়েছে। শুনতে পাই য়ুরোপের বহু রাজমুকুটের ঐতিহাসিক সুবৃহৎ মূল্যবান হীরকগুলির কয়েকটা ভারতের খনিগর্ভে জন্মলাভ ক'রেছিল—এটা আমাদের কম গর্বের কথা নয়। কখন কখন নদীর স্রোতে খনিজ হীরা তার আতুর-ঘর (Matrix) ত্যাগ ক'রে হাজার হাজার ক্রোশ দূরে কোন বেগানা শুক্‌নো নদীগর্ভে বালির সঙ্গে অবহেলায় প'ড়ে আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এমনি কত সাত-রাজার-ঐশ্বর্য্য মাণিক, রাখাল ছেলে কুড়িয়ে পাবার গল্প আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আস্‌চি।

যাহ'ক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতের হীরার খনি প্রায় নিঃশেষিত হ'য়েছে।

এর পর থেকে—১৭২৫ খ্রীঃ আঃ হ'তে ব্রেজিলের হীরাই বাজারে উৎকৃষ্ট। নদীগর্ভের বালিতে ব্রেজিলের বেশীর ভাগ হীরাই মেলে এবং এগুলি গুণে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ হীরার চেয়ে বহুগুণে ভাল। আগ্নেয়গিরির দেশে অগ্নিগর্ভ নলের নীচে অনেক হীরা পাওয়া যায়। জহরতের বাজারে সে হীরা কিছু সুলভ কিন্তু চলন খুব কম। জার্ম্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ছোট ছোট হীরা সমুদ্রের বালুচর থেকে প্রচুর আমদানী হয় বাজারে—একেবারে ধব্‌ধবে সাদা কিন্তু কোনটাও আকারে এক রতির বেশী হয় না।

যাই-হ'ক ভারতের হীরা—আজও যাঁহারা হীরা চেনেন তাঁদের কাছে খুবই আদর ও কদরের জিনিষ।

আহরিকা

ভারতের হীরামণি

আলোকদূত

ভারত ও নানান্-দেশের কয়েকটি হীরার একটুখানি ইতিহাস ও জনরবঃ—

কোহীনুর— কোহীনূব ভাবতেব সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হীবা, চিবদিনই দিল্লীর রাজকোষে থাক্তো. ১৫২৬খৃঃ স্থলতান বাববেব অধিকাবে আসে তাঁব ভাবত শাসনকালে। আগে এটিব ওজনে ছিল ৭৯৩ ক্যাবেট্ কিন্তু এক অনিপুণ মণিকাব একে কেটে ১৮৬ ক্যাবেটে দাঁড় করায়। কোহীনূর অধিকাব নিয়ে নানাবকম জনশ্রুতি আছে, কত 'হাত-ফেবৎ' যে এ হ'যেছে। শেষে ১৮৫০ সালে মহাবাণী ভাবতেশ্ববী ভিক্টোরিয়াকে এই মণিটি উপঢৌকন দেওয়া হয়। ১৮৫১ সালেব প্রদর্শনীতে কোহীনূব প্রদর্শিত হবার পর আমার্ষ্টড্রামেব মিঃ কষ্টব এব অতুলনীয় জৌলস্ ও গঠন প্রায় ঠিক রেখে একে কেটে ১০৬ ক্যারেটে দাঁড় করান। এখন কোহীনূব ভারতেশ্ববের বাজমুকুটেব অন্যতম মণি। এখনকাব দিনে কোহীনূবেব আনুমাণিক দাম ৫০০,০০০ পাউণ্ড—প্রায় ষাট লক্ষ টাকা।

ওরলফ্ মণি (orloff diamond) —ওবলফ্ এখন বাশিয়াব রাজদণ্ডের শোভা বৰ্দ্ধন ক'ব্ছে। এই মণিব গোড়াব ইতিহাস জানা নেই কাবোব, শোনা যায় ভারতেব কোন বিগ্রহেব চক্ষু থেকে অপসাবিত ক'রে কে যে কবে এ বস্তুটি বাশিয়াব ক্যাথোবিনের হাতে দিযেছিলেন কে ব'ল্বে ? তাবপব একেবাবে 'জাবে'ব বাজদণ্ডে।— এই মণিব ওজন ১৯৩ ক্যাবেট্। দাম ৩৬৯,৮০০ পাউণ্ড।

নিজাম্—শোনা যায় গোলকুণ্ডাব বাজা বববাতের কাছে এই মণিটি ছিল একেবাবে অ-মসৃণ অবস্থায। এই জ্বলজ্বলে পাথরটিব নাম নিজাম্। এর ওজন ৩৪০ ক্যারেট্। আনুমানিক দাম ২০০,০০০ পাউণ্ড।

গ্রেট-মোগল – দিল্লী লুণ্ঠনের দিনে হযত এই গোলাপী আভাযুক্ত হীবকটি অপহৃত হইয়াছিল। এখন কার আস্তানায় কোথায আছে জানি না। তবে বোধ হয় এই মণিটি কোহীনূবেবই একটা অংশ বিশেষ। ওজন ২৮০ ক্যাবেট্। দাম ৪২০,০০০ পাউণ্ড।

রিজেণ্ট্ বা পিট্ হীরক—এই হীবাটি ফরাসী বাজভাণ্ডারেব গর্ব্ব। ১৭১৭ খ্রীঃ অঃ সেণ্ট্ জর্জ্জ কেল্লাব শাসনকর্ত্তা পিট্ সাহেবেব কাছ থেকে এই হীরা বিক্রীত হয় ফবাসীর 'রিজেণ্ট্' ওর্লিন্সের ডিউকের কাছে। আগে এব ওজন ছিল ৪১০ ক্যারেট্। পরে দু'বছব খাটুনীর পব ৩,৫০০ পাউণ্ড খবচ ক'বে এখন এর ওজন দাঁড়িয়েছে ১৩৬½ ক্যারেট্। আনুমাণিক দাম ৪৮০,০০০ পাউণ্ড।

আহরিকা

ভারতের হীরামণি

আলোকদূত

দক্ষিণের তারকা—১৮৫৩ খ্রীঃ অঃ মাইনাস্ জিরিজের বোগাজেম্ নগরের কোন নিগ্রোর বরাতে এই হীরাটি হঠাৎ কেমন ক'রে মেলে। এটি আবাব ডিমের মত—ভিতর থেকে রোশ্‌নাই ঠিক্‌রে বেরোয়। এখন এর অধিকারী ভারতেরই কোন রাজা। এটি বিক্রীত হ'য়েছিল ৮০,০০০ পাউণ্ডে।

গ্রেট্‌-সাঁশী—একটা জবর ইতিহা আছে রূপকথার মত এই হীরাটির। ১৪৮৯ খ্রীঃ অঃ সাঁশীর ব্যারনেট্ নিকোলসের কাছে এটি বিক্রীত হয়, এবং তাঁরই নাম-অনুযায়ী এর নাম হ'য়েছে 'সাঁশী'। একদিন ব্যারেনেট্ এই মূল্যবান পাথরটি রাজাকে উপহার দিতে তাঁর কোন চাকরকে পাঠান। পথিমধ্যে দস্যুরা যখন তাকে আক্রমণ করে সে মনিবের অমূল্য সম্পদ রক্ষা ক'র্‌তে পাথরটি গিলে ফেলে, তার মৃত্যুর পর মণিটি তারই দেহ থেকে বার করা হয়। রাণী বেসের কাছেও এই হীরাটি একসময় ছিল। ওজন ৫৩½ ক্যাবেট্—দাম ৪০,০০০ পাউণ্ড।

দি ফ্লোরেণ্টাইন্—এটি ভারি মোটা জরদ্ রঙের হীরা। অপর অপর মণির মত এরও জীবনের অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে। যাক্ সে কথা। অনেক হাত-ফেরৎ হ'য়ে শেষে এটি দ্বিতীয় জুলিয়াস্ পোপের অধিকারে আসে। তিনি এটিকে অষ্ট্রীয়াব সম্রাটকে দিয়েছিলেন। এর ওজন ১৩৯½ ক্যারেট্। দাম ১১০,০০০ পাউণ্ড।

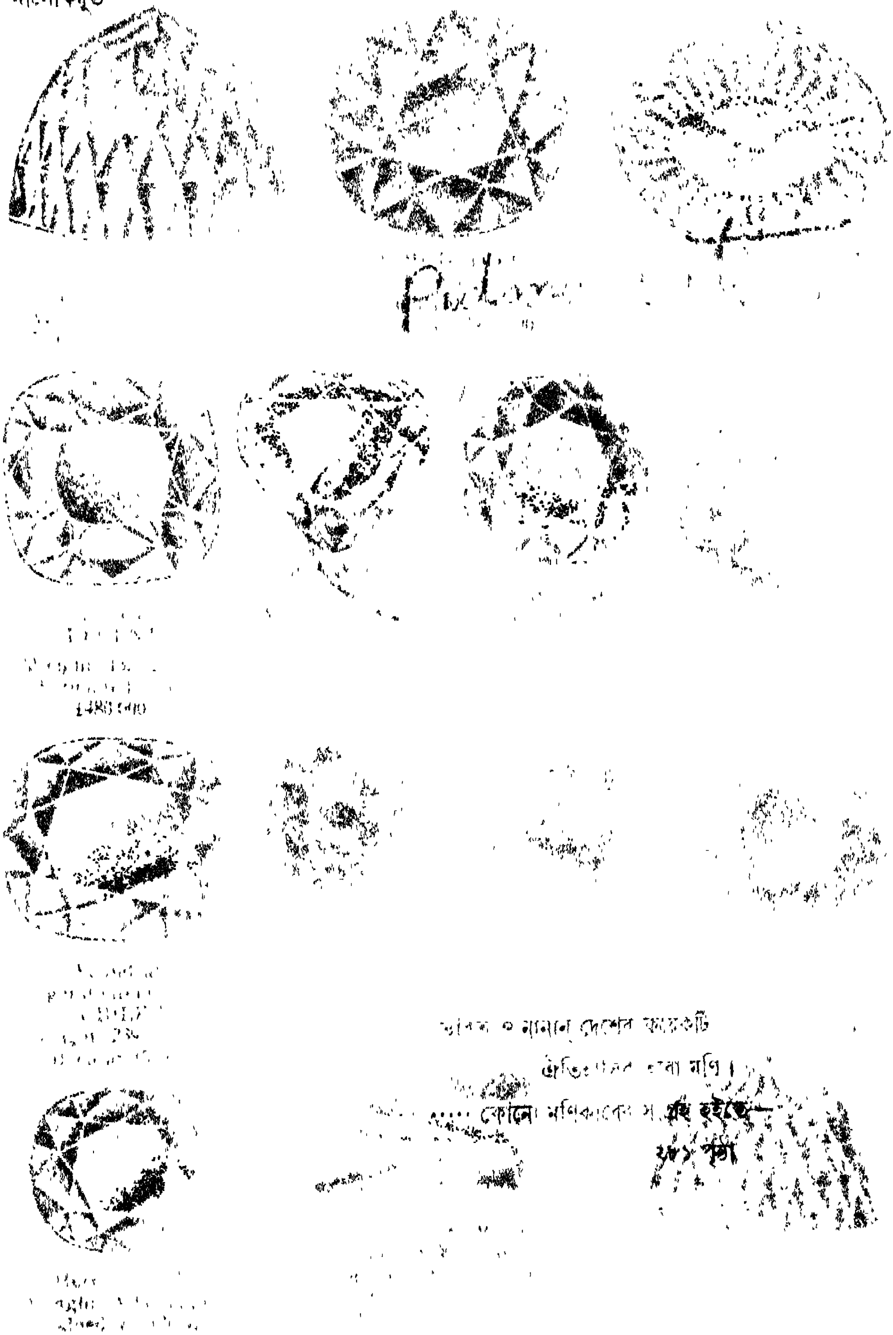
মাত্তাম হীরক—১৭৬০ খ্রীঃ অঃ এই হীরাটির প্রথম সন্ধান মিলে। এটি মাত্তামের রাজার সম্পত্তি—মাত্তাম্ ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ বোর্ণিও-র মধ্যে একটি দেশ। এই পাথরটি কিন্‌তে অনেকে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের কথা রাখা হয়নি। ওজন ৩৬৭ ক্যারেট্। দাম ২৬৯,৩৭৮ পাউণ্ড।

পিগট্ হীরক—সুন্দর বাদামী পাথর। ওজন ৪৭½ ক্যারেট্। ৩০,০০০ পাউণ্ডে একশ বছর আগে ঈজিপ্টের 'পাশা' কিনেছিলেন—কার কাছ থেকে জানা নেই; এখন যে কার অধিকারে আছে তাই বা কে জানে।

নাসক মণি—দাক্ষিণাত্য বিজয়ের সময় মার্কুইস্ হেষ্টিংস্ এই মণিটির অধিকারী হন্। পরে ভূতপূর্ব্ব ওয়েষ্টমিনিষ্টারের মার্কুইসের হাতে আসে। শোনা যায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেদিন সিংহাসনে বসেন, সেদিন এই হীরাটি তাঁর 'ড্রয়িং-রুমে' রাখা হ'য়েছিল। ওজন ৭৮⅝ ক্যারেট্—দাম ৩০,০০০ পাউণ্ড।

ভারতের হীরা-মণি

আলোকদূত



ভারত ও নানান্ দেশের কয়েকটি
ঐতিহাসিক হীরা মণি।
..... কোনো মণিকারের সংগ্রহ হইতে—
২৮১ পৃষ্ঠা

[illegible] জিনিষের কোনাস্কন্ন [illegible] কোন [illegible] এটি [illegible] [illegible] এখন এর অধিকারী [illegible] কোন রাজা।

[illegible]

[illegible] কাহিনী [illegible]

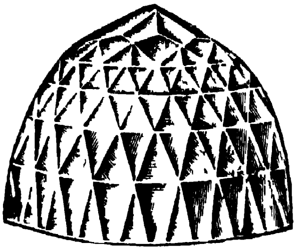
[illegible] লক্ষ [illegible] পাউণ্ড

[illegible] এই হীরাটির প্রথম সন্ধান [illegible] [illegible] রোপিং [illegible] দিয়ে [illegible] তাদের কথা [illegible] হয়নি।

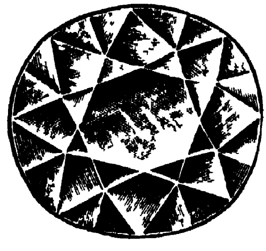
[illegible] পাউণ্ড

[illegible] ক্যারেট। [illegible] পাউণ্ডে [illegible] থেকে জানা নেই; এখন সে [illegible]

[illegible] সময় মার্কুইস হেস্টিংস এই মণিটির অধিকারী হন। [illegible] হাতে আসে। শোনা যায় মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেদিন সিংহাসনে বসেন, সেদিন এই হীরাটি তাঁর 'ড্রয়িং-রুমে' রাখা হয়েছিল। [illegible] ক্যারেট—দাম [illegible],০০০ পাউণ্ড।



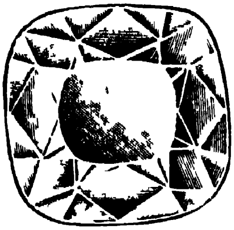
Russia
GREAT MOGUL
Weight 279 9|16 carats
Estimated value £420,000



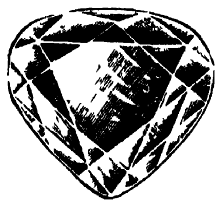
KOH I NOOR
New Cut
Weight 106 carats
Valued at £400 000



KOH I NOOR
Old Cut
Weight 186 carats
Valued at £350 000



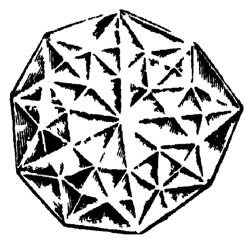
France
REGENT
Weight 137 carats
Estimated value
£480,000



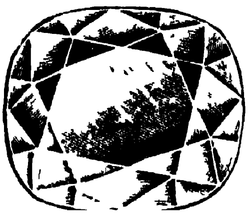
3-sided Brilliant
NASSAK
Weight 89 carats
Valued at £35,000
Recut Weight 78⅝
carats Valued at
£30,000



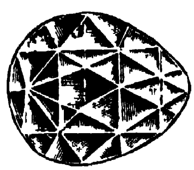
PASHA OF
EGYPT
Weight 40¼ carats
bought by the
Viceroy of Egypt
for £130 000



Austria
FLORENTINE
Weight 139½ carats
Valued at £110 000



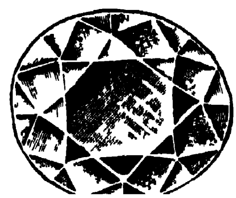
Found at
Jagersfontein, 1884
JUBILEE
Weight 239 carats
Valued at £500,000



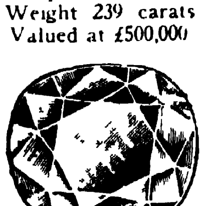
India
SANCY
Weight 53½ carats
Valued at £40 000



POLAR STAR
Weight 40 carats
with Imperial Jewels
Russia
Valued at £15 000



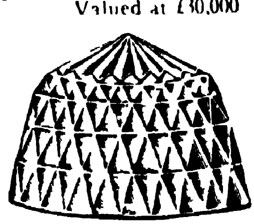
England
PIGOTT
Weight 47½ carats
Valued at £30,000



HOPE BLUE
Weight 44¼ carats
Valued at £30 000



SHAH OF PERSIA
Weight 86 carats
One of the Russian
Crown Jewels
Valued at £30 000



Russia
ORLOFF
Weight 193 carats
Valued at £369,800

ভারতের হীরামণি

আহরিকা

আলোকদূত

ইংলিস্ ড্রেস্‌ডেন্—এই আকারের বৃহৎ হীরাটি বরোদার গায়কোয়ারের সম্পত্তি। ওজন ৭১½ ক্যারেট্। দাম ৪০,০০০ পাউণ্ড।

দি ইয়োজিন্—ন্যাস্‌পাতির মত দেখ্‌তে ভারি জৌলস্—সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান্ এটি কিনেছিলেন। একদিকটা এই হীরাটির ভোঁতা। পরে এই রত্ন রাণী ইয়োজিনের অধিকারে আসে, তিনি বরোদার গাইকোয়ারকে বিক্রী করেন। ৫১ ক্যারেট্ ওজন, দাম ১০,০০০ পাউণ্ড।

পাহাড়ের চাঁদ—প্রায়ই এই হীরাটি বিখ্যাত 'ওরলফে'র সঙ্গে গুলিয়ে যায়। নাদীর-শা দিল্লী লুণ্ঠন ক'রে এই মণিটি দিল্লী থেকে নিয়ে যান। তিনি নিহত হ'লে, এক আফগান সৈনিক এটি চুরি ক'রে সাখ্‌ফারাস্ নামে এক আর্ম্মেনিয়ান্‌কে বিক্রী করে। পরে রাশিয়া খুব বেশী টাকায় কার কাছ থেকে এটা কিনে নেয় আমি জানি না। এর ওজন ১২০ ক্যারেট্—দাম ৪৮,৭৭০ পাউণ্ড।

আশা মণি—রঙীন্ হীরার রাণী—চারদিকে মানানসই—বাদামে বৃহৎ পাথর,—যেন একটি ছোটখাট নীল-সাগর। নিউ-ক্যাসেলের ডিউক-পত্নী এটা কেনেন। ওজন ৪৪¼ ক্যারেট্—দাম ৩০,০০০ পাউণ্ড।

ইজিপ্টের পাশা—বর্ত্তমান্ ইব্রাহিম পাশার অধিকারে আছে। সুন্দর 'জল', কোণাচে ও ভারি ভাল পল ব'লে এর খ্যাতিও খুব। ওজন ৪০ ক্যারেট্—দাম ১৩০,০০০ পাউণ্ড।

পোর্ত্তুগলের রিজেণ্ট্—যে নিগ্রো এই পাথরটির সন্ধান পেয়ে পোর্ত্তুগলের রাজাকে উপঢৌকন দেয়, সে জীবনভ'র ৫০ পাউণ্ড 'ভাতা' বছরে ও দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় চিরদিনের জন্যে। এর ওজন ২১৫ ক্যারেট্।

আফ্রিকার তারকা (cullinan)—হীরার খনির বিখ্যাত মালিকের নামে এই হীরাটির নাম ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের, ৯ই নবেম্বর, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে বস্‌বার দিনে এই মূল্যবান হীরাটি দক্ষিণ আফ্রিকার শাসন-পরিষদ তাঁকে উপহার পাঠান। এখন এই পাথরটি টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়েছে। টুক্‌রো হবার আগে এর দাম ছিল ৫০০,০০০ পাউণ্ড।

পারস্যের শা—১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ বাদশাহ আব্বাস্ মির্জ্জার ছোট-ছেলে শা'জাদা ছোরোস্ (chosroes) এই মণিটি জার নিকোলাস্‌কে উপহার পাঠান। আগে এর ওজন ছিল ৯৫ ক্যারেট্—দাম ছিল ৩০,০০০ পাউণ্ড।



মডার্ন রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খাজনাবাদের রাজা ছটফট সিং—রোগে দু'বৎসর শয্যাগত। ডাক্তার-কবিরাজ দেখে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেছে—রাজার রোগ আর সারে না। রোগ এমন কিছু নয়—রাজার কোনো কিছুতে রুচি নেই। দিন-রাত শুয়ে আছেন আর হাই তুলচেন।

রাজা ক্রমে নিজের জীবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন। রাজার এক ছেলে। ছেলে ডাগর, রাজকুমার কলেজে পড়েন। রাজপুত্রের নাম কুমার গজপতি সিং। পড়াশুনা হচ্ছে কেমন, সে খপর কে-বা রাখে। তবে কুমার বাহাদুরের গল্প লেখার খুব সখ। গল্প লেখেন; লিখে সে গল্প মাসিক-পত্রে পাঠান ছাপাবার জন্য। তারা ছাপে। লেখা যেমন হোক্, লেখক একজন রাজপুত্র। রাজপুত্রের লেখা ছাপালে গ্রাহক বাড়বে।

কিন্তু এ কথাগুলোর সঙ্গে আমাদের গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই—আমাদের সম্পর্ক কুমার বাহাদুরের সঙ্গে।

রাজার কাছ থেকে টেলিগ্রাম গেল কুমার বাহাদুরের নামে—তুমি এসো—জল্‌দি! টেলিগ্রাম পাবামাত্র কুমার বাহাদুর এলেন খাজনাবাদের প্রাসাদে।

রাজা বল্‌লেন—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তুমি বাপু, সব বুঝে-সুঝে নাও। দেখে-শুনে বিয়ে করো। বিয়ে করে গদি চেপে বসে রাজত্ব করো। রাজ্য-চালনায় এখন কোনো ফ্যাশাদ নেই। শত্রুর ভয় নেই। শুধু বাজে খরচ বাঁচিয়ে চলা। কতকগুলো মোসাহেব পোষা—সে কাজটি করো না। মাঝে মাঝে কলকাতায় ছোটা—সেটুকু বন্ধ রাখতে হবে, রেশ খেলো না—তবে রেসের ঘোড়া কিন্‌তে চাও, কিনো। বাঙলা লেখার নেশায় মেতো না—অনেক পাব্লিশার মাথায় হাত বুলোবে। স্রেফ খাজনাপত্র

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

আদায় করো—বন্যা-টন্যা হলে যৎকিঞ্চিৎ চাঁদা, আয় বুঝে খরচ করা—রাজ্য খাশা চলে যাবে।

কুমার বাহাদুর বল্লেন—বেশ!

রাজা বল্লেন,—বিয়ে যা' করবে, বড় ঘরে বিয়ে করা চাই। আচ্ছা, বেশ, তুমি রাজবাড়ীর পাঁচতলার ছাদে গিয়ে ওঠো—উঠে দূরবীণ কষে চারিদিকে ছাখো। দেখে যা বল্বার থাকে, এসে আমায় বলো।

কুমার বাহাদুর গেলেন ছাদে; রাজা গড়গড়ার নল মুখে তাতে দিলেন টান! তারপর হাঁকলেন,—ছপ্পড় সিং!

ছপ্পড় খাশ খানসামা। রাজার ডাকে ছপ্পড় এলো। রাজা বল্লেন—তোরাই আমাকে মারবি। কখন তামাক দিয়েছিস্—আগুন থাক্বে কেন? নিয়ে আয় আর এক কল্কে তামাক সেজে!

রাজা একালের হলেও তাঁর চাল-চলন ছিল সেকালের মত। তিনি সিগার, সিগারেট, বিড়ি মুখে স্পর্শ করেন না—ও-সব শস্তার নেশা! আলবোলা বনেদী জিনিষ। রাজার ঝোঁক বনেদীর দিকে!

ছাদে উঠে দূরবীণ কষে রাজপুত্র চারিধার দেখতে লাগলেন।

দূরে অনেক দূরে—আকাশের গায়ে কি ঐ গোলাপী আভার মত? আভার মুখে মিশ কালো ধোঁয়া!······যেন······যেন·· ···

ঠিক! রাজপুত্র দেখেন, সেই আভার মধ্যে চমৎকার একখানি মুখ! গোলাপ-বরণ এক কন্যা যেন মেঘের কোলে দাঁড়িয়ে আছে! ও তো ধোঁয়া নয়—রেশমের মত কালো চুল। কন্যার মাথা থেকে পা বয়ে ঝরে পড়েচে!

রাজপুত্র তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন, ডাকলেন,—বাবা! কন্যার সন্ধান পেয়েছি। রাজা বললেন—বটে! কোথায়?

রাজপুত্র বললেন—অনেক দূরে আকাশের গায়ে গোলাপ-বরণ কন্যা। তাঁর মাথার কেশ যেন আকাশ থেকে ঝরে পড়েচে শ্রাবণের মেঘের মত একেবারে এই পৃথিবী ছুঁয়ে।

রাজার দুই চোখ কপালে উঠলো! তিনি বল্লেন—আরে, ও কন্যাকে বিয়ে করবি কি? ও কি এ মুল্লুকের! ও তো সেই রূপকথার রাজকন্যা—থাকে কল্পনার

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

পুরীতে। পাথরের পুরী। সে পুরী চৌকি দিচ্ছে বাঁটুল রাক্ষস! ও কন্যা দেখতে পরী! কথা কয়, মাণিক জ্বলে। কন্যার হাসিতে মুক্তো ঝরে। কিন্তু ও কন্যা পাবি কেন? পাবার নয়।

রাজপুত্র বললেন,—ঐ কন্যা পাওয়া চাই! রাজপুত্রেরা চিরদিন বিয়ে করেছে অমনি রাজকন্যা। আমি রাজপুত্র। বিয়ে যদি করি তো ঐ কন্যাকেই বিয়ে করবো! ও কন্যা ছাড়া আর কোনো কন্যা বিয়ে করবো না।

রাজপুত্র নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করে গোঁশা-ঘরে পড়ে রইলেন। রাজা দেখলেন, বিপদ! রাণী বহুদিন পূর্ব্বে মারা গেছেন। মা-মরা ছেলেকে চিরদিন আদর দিয়েছেন—তার আবদারও ভীষণ হয়ে উঠেচে! যা চায়, তা পেতেই হবে! কিন্তু তা বলে ঐ কল্পনাপুরীর রাজকন্যা! কুয়াশা নদীর পারে, আজগুবি জঙ্গল পেরিয়ে, পাহাড়ের মাথায় থাকে কল্পনাপুরীর রাজকন্যা!

কিন্তু ছেলের ধনুর্ভঙ্গ পণ! রাজা কি করেন, বললেন—গোঁ যখন ধরেছ—বেশ, যাও বাপু! চিঠি-পত্র লিখো। আর হুঁশিয়ার হয়ে যেয়ো। ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ। বিপদ পদে পদে! কত রাজপুত্র তোমার পূর্ব্বে ঐ রাজকন্যার সন্ধানে বেরিয়েছেন। তাঁরা কেউ ফেরেন নি। সেই কল্পনাপুরীর মায়া-বাতাসের ছোঁয়াচ্ লেগে পাথরের ষ্টাচু-বনে গেছেন।

রাজপুত্র রাজ্য ছেড়ে বেরুলেন। হাতী বা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হলেন না। তিনি চললেন মোটর-বাইকে চড়ে। বাইকের সঙ্গে রইলো বাস্কেট! রাজকন্যাকে তাতে বসিয়ে আনবেন!

চলেছেন—চলেছেন। কত নগর-গ্রাম, পথ-ঘাট, জলা-জঙ্গল, নদী-পাহাড় পার হয়ে এক জায়গায় ছোট একটি সরাই। রাজপুত্র সেই সরাইয়ে রইলেন রাত্রের মত।

সকালে বেরুলেন। সামনে একটি লোক। সে বললে—কোথায় চলেছো রাজপুত্র?

রাজপুত্র বললেন,—কল্পনাপুরীর রাজকন্যার সন্ধানে।

লোকটি বললে,—আমায় সঙ্গে নাও। উপকার পাবে।

রাজপুত্র বললেন—তুমি যাবে?

সে বললে—যাবো। এখানে চাকরি-বাকরি নেই। চিরদিন রাজা-রাজড়ার কাছে কাজ করেছি—এখনকার এ সব ছোট-মন হঠাৎ-বাবুদের কাছে চাকরি করতে সরম লাগে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অনেক কাজ আমি জানি। সেকালের রাজপুত্রেরা কেশবতী রাজকন্যা, চম্পা রাজকন্যার সন্ধান যা করেছে, তা এই আমারি বাপ-ঠাকুর্দ্দাদার কল্যাণে!

বটে! রাজপুত্র বললেন—বেশ, এসো আমাব সঙ্গে। তোমার নাম?

লোকটি বললে—আমার নাম রকেট্। এটা নাম নয়, উপাধি। রাজাদের যেমন উপাধি সিং, লাল, রায়; আমাদের উপাধি তেমনি রকেট্! হাউই! অনেকে হালের ফ্যাসানে আমায় মিষ্টার রকেট্ বলে ডাকে। তার কারণ আমাদের বংশ মন্ত্রসিদ্ধ। সে মন্ত্রের জোরে এই দেখচো তোমাদের মত আমার সাধারণ মানুষের আকার—মনে করলে এ দেহকে আমি সরু ডিগ্‌ডিগে করে শোঁ-শব্দে আকাশে চড়াতে পারি। দেখবে?

মিষ্টার রকেট্ নিমেষে দম বন্ধ করে দাঁড়ালো। অমনি তার দেহখানা বাজির মত শোঁ করে উঠে গেল আকাশের দিকে। তবে দোকানের হাউই যেমন মাটীর স্পর্শ ত্যাগ করে যায়, রকেটের দেহ ভূমির স্পর্শ ত্যাগ করে গেল না। সে রইলো মাটীতে পা রেখে দাঁড়িয়ে। ভীষণ লম্বা সে মূর্ত্তি। হাত বাড়ালে গোটা সূর্য্যটাকে বুঝি, আকাশ থেকে পেড়ে নামাতে পারে!

তার কীর্ত্তি দেখে রাজপুত্র অবাক!

রকেট্ বললে—কল্পনাপুরী দেখতে চান্ তো আমার কাঁধে উঠুন।

রাজপুত্র তার কাঁধে চড়লেন। কি করে? যারা কখনো হাতী বা উটের পিঠে চড়েছো, তাদের আর বুঝিয়ে দিতে হবে না! কাঁধে উঠে রাজপুত্র দেখেন, বহুদূরে টালার-ট্যাঙ্কের মত মস্ত একটা প্রাসাদ দেখা যাচ্ছে—পৃথিবীর অনেক উপরে। আর তারি জানালায় দাঁড়িয়ে সেই গোলাপ-বরণ রাজকন্যা। মুখখানি মলিন! দেখে রাজপুত্র একটি নিশ্বাস ফেল্‌লেন।

রকেট বল্‌লে—দেখেচেন?

রাজপুত্র বল্‌লেন,—হ্যাঁ।

—আচ্ছা নামুন। আমিও দেহখানিকে গুটিয়ে চড়ে বসি আপনার গাড়ীর বাস্কেটে।

তাই হলো। মোটর-বাইক শ'দুই মাইল পথ অগ্রসর হয়েছে,—পিছন থেকে কে ডাকলো—রক্—রক্—ওহে মিষ্টার রকেট!

আহরিকা

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

রকেট বল্‌লে—একবার দাঁড়ান তো রাজপুত্র! আমার বন্ধু বুলাতিংয়ের গলা শুনচি যেন!

বাইক, দাঁড়ালো। একটা জামরুল গাছের তলা থেকে এলো মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। এসে সে রকেটকে বললে—কোথায় চলেছ?

রকেট বল্‌লে—রাজপুত্রের সঙ্গে যাচ্ছি কল্পনা-পুরীতে—গোলাপ-বরণ রাজপুত্রীর সন্ধানে। যাবে?

—গাড়ীতে ধরবে?

রকেট বল্‌লে—আমার বন্ধুকেও সঙ্গে নিন্ রাজপুত্র। ও-ও একজন ওস্তাদ। দেখবেন ওর ওস্তাদী?

রাজপুত্র হতভম্ব! এদিকে জনপ্রাণীর দেখা মেলে না—যে দু' চারজনকে পাওয়া যায়, সবাই ওস্তাদ!

বুলাতিং বল্‌লে—আমি সঙ্গে থাকলে কাজ পাবেন রাজপুত্র!

কথাটুকু বলে বুলাতিং ঝপ্ করে দিল একটি লাফ—তারপর মাথা নীচু করে বোঁ বোঁ দু' পাক ঘুরে নাচের ভঙ্গীতে দুটো হাত নাড়তে লাগলো। অর্থাৎ তোমরা দেখেচো, নিশ্চয়, আগ্নেয়গিরির বুক থেকে গলিত লাভা চারিদিকে কেমন ছড়িয়ে পড়ে; কিম্বা বরফের চাঁই গলে কেমন জলের বিস্তার ঘটে,—তেমনি বুলাতিংয়ের দেহ মুহূর্ত্তে সেই লাভার মত থেবড়ে একেবারে দশ-বারো মাইল পথে লুটিয়ে গেল! গাছে চড়ে রাজপুত্র কোনোমতে সে যাত্রা চুবন থেকে রক্ষা পেলেন। এমন ওস্তাদ বুলাতিং—কাজেই তাকেও সঙ্গে নেওয়া হলো।

আরো শ'তিনেক মাইল পরে আর একজন বন্ধু জুটলো। তার পরণে সাহেবী পোষাক। নাম এক্স রায়। বিলিতি ছাঁদে সে নিজের নাম রেখেচে, এক্স-রে! 'রায়' বললে লোকে ভাববে, ড্যাম্ কালা-আদমী! তাই! তার ক্ষমতা আরো অদ্ভুত! পাথরের পাঁচিল ফুঁড়ে তার নজর চলে—গভীর জল বিঁধে তার নজর চলে সাগরের অতল তলে—একেবারে সেই মণি-প্রবাল দ্বীপের খনিতে।

যেতে যেতে রাজপুত্র ভাবলেন, সেকালে এমনি অভিযানে বেরিয়ে যে-সব রাজপুত্র পথে এমন বন্ধু লাভ করেছিলেন, তাঁরাই শুধু চতুর্দ্দোলে বসিয়ে রাজকন্যা-সমেত রাজ্যে

ফিরেছিলেন; যাঁদের বন্ধু-লাভ ঘটে নি, তারা পাথরের ষ্ট্যাচু বনে ছিলেন। সে ষ্ট্যাচুর কি সংখ্যা ছিল! এ যুগের ইতালীয়ান্ জাত্ ষ্ট্যাচুর যে অত বড়াই করে—এ বড়াই শুধ্ সেই সব রাজপুত্রদের পাথরের কল্যাণেই তো!

রাজপুত্র বললেন,—এক্স রায়, তুমি একবার দ্যাখোতো, রাজকন্যা কি করচেন এখন?

এক্স রায় বললে,—বেশ!

রকেট্ হুস্ করে শরীরকে সিড়িঙ্গে সরু করে উঠে গেল আকাশের দিকে মাথা তুলে—এক্স রে চড়লো তার ঘাড়ে। কল্পনাপুরীর দিকে চেয়ে এক্স রায় বললে—পুরীর ফটক বন্ধ। লোহার বড় বড় রড দেওয়া ফটক। সেই ফটকের রড ধরে রাজকন্যা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ফটকের বাইরে একটা টুল পেতে বাঁটুল রাক্ষস বসে তাল গাছ দিয়ে দাঁত খুঁটছে!

রাজপুত্র বললেন,—তোমরা আমার বন্ধু, ভাই। বন্দিনী রাজকন্যাকে যাতে কল্পনাপুরী থেকে উদ্ধার করে আনতে পারি, তোমাদের সাহায্য করতে হবে।

তারা সমস্বরে বলে উঠলো—নিশ্চয় সাহায্য করবো, কুমার বাহাদুর!

মোটর-বাইকে চললো তারা বেগে। রাজপুত্র এই বাইক-চালানো বিদ্যাটা খুব ভালো করেই শিখেচেন। সঙ্কল্প আছে, দু' এক বৎসর পরে মোটর-বাইকে চড়ে ওয়ার্ল্ড-টুরে বেরুবেন।

পথে বাধা ঘটলো না,—এবং সন্ধ্যার পরে সকলে এসে পৌছুলেন কল্পনাপুরীর রাজ-প্রাসাদের ফটকে। ফটক খোলা।

পুরীর চারিদিকে বিজলী বাতি জ্বলছে। কিন্তু নিঝুম পুরী। জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই—কারো সাড়াশব্দ নেই। ফটকের পর সমস্ত বাগান। বাগানে অসংখ্য শ্বেত-পাথরের ষ্ট্যাচু! রাজপুত্র শিউরে উঠলেন—এ সব ষ্ট্যাচুর বুকে হয়তো প্রাণ এখনো টল-টল করচে—ডাবের পুরু খোলার নীচে জল যেমন, তেমনি!

চারজনে পুরীর এ ঘরে ও ঘরে ঢুকলেন—দর-দালান, বারান্দা পার হয়ে উঠলেন শেষে প্রাসাদের দোতলায়। ঘরে দালানে বারান্দায়—সর্ব্বত্র শ্বেতপাথরের ষ্ট্যাচু—নিথর দাঁড়িয়ে আছে।

আহরিকা

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

একটা ঘরে খাবার রয়েছে সাজানো—ঠিক চার-জনের মত। রাজপুত্র বললেন—বাঃ! কে যেন টেলিগ্রাম করে দেছে, চারজনের খাবার মজুত রেখো!

রকেট বললে—কল্পনাপুরীতে আয়োজন ভারী নিখুঁৎ। হিষ্টী পড়েন নি?

রাজপুত্র বললেন—আমার 'বি' কোর্শ। আমি হিষ্টী পড়িনি।

হেসে বুলাতিং বললে—আপনি রাজপুত্র—একদিন রাজা হবেন। হিষ্ট্রী আপনার ভালো করে পড়া উচিত।

রাজপুত্র একটু লজ্জিতভাবে বললেন—এবার পড়বো।

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ক'জনে আবার এলেন দক্ষিণের বড় বারান্দায়। আসবামাত্র দেখেন, সেই গোলাপ-বরণ রাজকন্যা! মলিন মুখ। মুখে কথা নেই!

রাজপুত্র ডাকলেন—রাজকন্যা

পিছন থেকে ভাঙ্গা কাঁশরের আওয়াজের মত ভাষা ফুটলো—জানি, জানি রাজপুত্র। তুমি এসেছ রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।

চমকে সকলে পিছন ফিরে দেখে, বদাকার-মূর্ত্তি এক বামন! তার মুখখানা লাল টক্‌টক্ করচে—দাঁতের পাটি ঠোঁটের নীচে ঢাকা থাকে না—কড়ির মালার মত দুই ঠোঁটের সঙ্গে কে যেন আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

সে বাঁটুল রাক্ষস। রাক্ষস বললে—তোমার আগে কত যুগ ধরে কত রাজপুত্রই না এলো রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। সকলে পাষাণ হয়ে এখানকার মাটীতে রইলো এঁটে। এবারে তোমার পালা। বেশ, চেষ্টা করো। রাজকন্যাকে নাও। যেখানে খুশী রাখো। তিনটি দিন ওকে পাহারা দাও। তোমাদের পাহারা এড়িয়ে রাজকন্যা যদি চলে না আসে, তাহলে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজ্যে ফিরো। নাহলে তোমাদের ভাগ্যেও পাথর বনা ছাড়া আর কিছু ঘটবে না।

বাঁটুল রাক্ষস এই কথা বলে চলে গেল। রাজপুত্র তখন রাজকন্যার হাত ধরে তাঁকে নিয়ে এলেন দোতলার ড্রয়িং রুমে। রাজপুত্র বললেন—তুমি যেন এ ঘর থেকে চলে যেয়ো না, রাজকন্যা। শুনলে তো, তুমি চলে গেলে আমাদের গতি কি হবে।

রাজকন্যা কোন জবাব দিলেন না—তাঁর চোখে কোনো ভাব ফুটলো না। তিনি একখানা চেয়ারে বসলেন। নির্ব্বাক পুতুলের মত বসে রইলেন।

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায

এরা রইলো পাহারায়।

ঘর জুড়ে বুলাতিং একেবারে বিগলিত পঙ্ক-কর্দ্দমের মত নিজেকে দিল ছড়িয়ে—তাকে সরিয়ে ঘর থেকে নড়বার সাধ্য কি! রকেট ডিগ্‌ডিগে সরু সাপের মত কুণ্ডলী রচনা করে গণ্ডী দিয়ে পড়ে রইলো; আর এক্স রায় রইলো ঘরের বাইরে—তার ছুঁচের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি উন্মুখ করে! রাজপুত্র আর-একখানি চেয়ারে বসে রইলেন রাজকন্যার ঠিক সামনা-সামনি।

রাজকন্যা যেন পুতুল! রাজপুত্র বাহিরের পৃথিবীর কত গল্পই বলতে লাগলেন। কল্পনা ছাড়া বাস্তবের রাজ্যে কত সুখ, কত সম্পদ—বললেন, মুক্তা ফলের চেয়ে সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে অনেক বেশী ভালো, মনোরথের চেয়ে মোটরে-এরোপ্লেনে চড়ে বেড়ানোয় মজা ঢের বেশী—তাও বললেন। রাজকন্যা কিন্তু চুপচাপ বসে আছেন। ঠোঁট নড়ে না! চোখের পাতা পড়ে না! রাজপুত্র বুঝলেন, বহু বহু বৎসরের বন্দিত্বে রাজকন্যার মন পাথর হতে সুরু হয়েছে। উপায় কি? বিজ্ঞানের অমোঘ বিধি!

কিন্তু ক'দিন সমানে পথে চলা—ঘুমের অপরাধ ছিল না! ক'দিন সজাগ চোখের দিকে সে ঘেঁষতে পারে নি! আজ আর থাকতে পারলো না; সকলের চোখের উপর আসন পেতে বসলো। শেষ রাত্রে চার জনের চোখ ঘুমে একেবারে জড়িয়ে এলো। চারজনেই ঘুমিয়ে পড়লো।···

ভোরের দিকে রাজপুত্রের গেল ঘুম ভেঙ্গে—বুকে কেমন ব্যথা ধরার ফলে। চোখ মেলে তিনি দেখেন—কোথায় রাজকন্যা? নেই!

বন্ধুদের তিনি ডেকে তুললেন। ব্যাপার দেখে সকলের চক্ষুস্থির!

এক্স রায় দেওয়াল ফুঁড়ে—পাহাড়-বন-নদী ফুঁড়ে ছুঁচের মত দৃষ্টি চালিয়ে দিল দূরে—বহুদূরে। চোখে যা দেখলো—দেখে সে বললে—ঐ যে রাজকন্যা! এখান থেকে দু' হাজার মাইল দূরে সীলোনের অশোক-বন। সেই বনে সবচেয়ে বুড়ো অশোক গাছের মগ-ডালে এক রাশ ফোটা অশোক-ফুলের উপর তিনি শুয়ে আছেন! খুব উঁচু গাছ!

রকেট বললে—কুছ্ পরোয়া নেহি। রাজপুত্র, আপনার বাইক বার করুন।

তখনি বাইক বেরুলো। এবং···

মডার্ণ রূপকথা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অশোক-বনে রকেট দিল তার দেহ সিড়িঙ্গে সরু করে মাথাটা আকাশে তুলে! চকিতে রাজকন্যাকে অশোক-শয্যা থেকে নামিয়ে বাইকের বাস্কেটে বসানো হলো।

অমনি পিছনে হা-হা অট্টহাস্য। চমকে সকলে দেখে, সেই বাঁটুল রাক্ষস!

রাক্ষস বললে—একটা রাত্রি কাটলো। এখনো দু'রাত হুঁশিয়ার পাহারায় রাজ-কন্যাকে ধরে রাখা চাই।··

নিরুপায়! সে রাত্রেও ঠিক এমনি ব্যাপার! শেষ রাত্রে সেই কাল-ঘুম চকিতের জন্য! ঘুম ভাঙ্গতে সকলে দেখে—রাজকন্যা নেই!

এক্স রে ছুঁচ-দৃষ্টিতে চারদিক ফুঁড়ে বিঁধে বললে—ইস—চালান দেছে একদম সেই হিমালয়ের মাথায় যে কাঞ্চনজঙ্ঘা, সেইখানে। সব্বনাশ!

রকেট বললে—ভয় নেই। আমি এখান থেকে হাত বাড়িয়ে তাঁকে এনে দিচ্ছি।

হলো তাই। দেহকে সরু লিক্‌লিকে করে কঞ্চির মত বাঁকিয়ে রকেট নুয়ে বেঁকে নিয়ে এলো রাজকন্যাকে। তাঁর দেহ একেবারে হিম—মাথায় বরফের কুচো দানামিছরীর মত প্রত্যেকটি কেশে জড়িয়ে আছে!

বাঁটুল রাক্ষস বল্‌লে—আর একটা রাত··

তারপর···সে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো। দু'চোখে যেন হাজার হাজার লাল জবা ফুটলো।·

বারে বারে তিন-বার! রাজপুত্র বললেন—আজ আর ঘুম নয়!

বন্ধুরা বললে—না। চোখে আজ লঙ্কার কাজল লাগাবো!

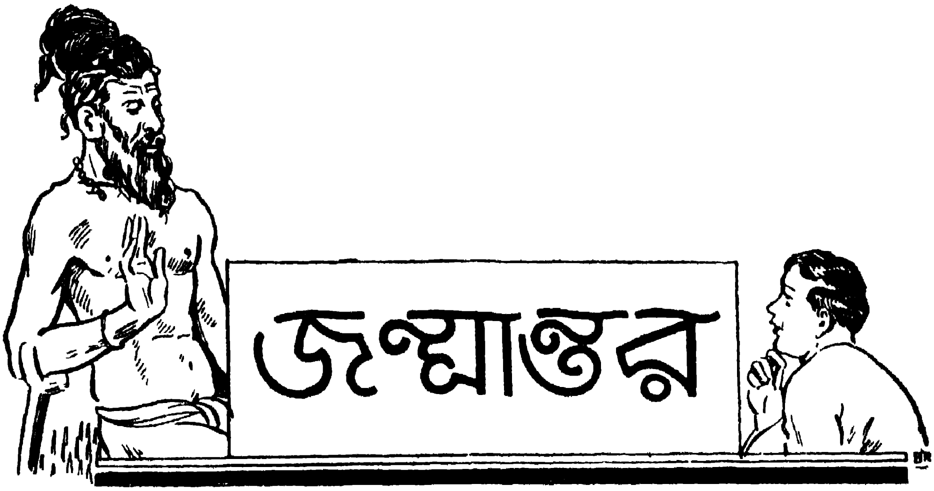
কিন্তু সব বৃথা হলো। লঙ্কার কাজল মুছে ঘুম এসে শেষ রাত্রে চারজনের চোখের পাতায় তাঁবু পাতলো।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙ্গে সকলে দেখে, আবার সেই কাণ্ড!

এক্স রায় বল্‌লে—ঐ যে রাজকন্যা! জাপানের কাছে সাগরের জলে শুক্তির রাজ্য। সেই রাজ্যে শুক্তি-রাজের মুক্তা-গুহায় বন্দী করে রেখেছে।

বুলাতিং বল্‌লে—বটে! আমাকে তবে নামতে হলো কোমর বেঁধে!

বুলাতিং বস্‌লো কল্পনাপুরীর বাগানে দীঘীর ধারে—বসে দেহখানাকে পাত্ করে



জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

আমাদের ক্লাশের পুলিনের ছেলেবেলা থেকেই অসাধারণ হবার ভয়ানক সখ! বাঁধা পথে চল্‌তে সে একেবারেই নারাজ। বাংলা দেশেব সাত কোটী মানুষ যেমন ভাবে খাচ্ছে, দাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে, ঠিক তেমনি করে দিন কাটাবাব জন্যে তার জন্ম হয়নি, [illegible] বিশ্বাস। নিতান্ত বাপ মায়ের উৎপাতে সে পুরোপুরি অসাধারণ হতে পারে নি, তবে আশা আছে সাবালক হবামাত্রই সে মনের সব সাধ মিটিয়ে নিতে পারবে।

কোথায় কোন যাদুকর এসেছে, কোন সন্ন্যাসী আশ্চর্য্য সব ব্যাপার করেছে, কোথায় ভৌতিক সব কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করেছে, এ সব তথ্য পুলিনের একেবারে নখ-দর্পণে! এদিকে দুই দুগুণে চার হয় কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে হয় ত বল্‌তে পারবে না। আমাদের দেশে যোগীরা নিশ্বাস আট্‌কে, বা মাটির তলায় কবরস্থ হয়ে কতদিন কাটাতে পারেন, তা সে তোমায় ঠিক বলে দেবে, কিন্তু হেদো থেকে গোলদীঘি অবধি হেঁটে যেতে [illegible], তখন আর পুলিনবাবুর দেখা পাওয়া যাবে না।

ডাল ভাত খেতেও তার ভাল লাগে না। বৈদিক যুগে আর্য্যরা কি খেত, মহাভারতেই বা দ্রৌপদীর রান্নার কি বর্ণনা আছে, এই সব বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে মাকে সে অস্থির করে তুল্‌ত। ভারতীয় চিত্রকরদের ছবির নমুনা দেখিয়ে দরজীকে দিয়ে বেশ

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

একটা আর্য্য পোষাকও তৈরি করেছিল, নিতান্ত স্কুলের ছেলেদের চাঁটির উৎপাতে সেটা পরে বেরতে ভরসা পেত না।

ক্লাশে ত বছরের পর বছর পড়ে থাকে, অবশেষে মাষ্টাররা জ্বালাতন হয়ে তাকে তুলে দেন। একই ক্লাশে এমন একটা উৎপাৎ কতকাল আর সহ্য করা যায়? বাবা মা ত মাষ্টারের উপর মাষ্টার রাখছেন, বইয়ের উপর বই কিনছেন কিন্তু তাঁদেব পণ্ডশ্রম।

আমি থাকি পাশের বাড়ীতে, পুলিনের মাকে মাসীমা বলে ডাকি, তাদের বাড়ী খুব যাওয়া আসা আছে। বছর দুই তিন আগে পুলিনেরই সঙ্গে পড়তাম, এখন অবশ্য অনেক এগিয়ে গিয়েছি। মাসীমা আর মেসো মশায় আমাকে খুবই স্নেহ করেন। তাঁদের বাড়ীতে, ডাকাডাকির চোটে প্রায়ই আমাকে যেতে হয়, আর তাঁদের হা-হুতাশ শুন্‌তে হয়। মাসীমা বলেন, "তোরা একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে দেখ্‌না বাবা, ছেলেটা যে একেবারে বয়ে যেতে বসেছে!"

পুলিনের বাবা বলেন, "এর চেয়ে ফিরিঙ্গীয়ানার উৎপাৎও সওয়া সহজ। তাতে বরং চাকরি বাক্‌রির সুবিধে হলেও হতে পারে। কিন্তু একি কাণ্ড দেখ দিখি! আর্য্য হয়েছেন না গুষ্টির পিণ্ডি দিয়েছেন। আরে খাবি কি হতভাগা! তোর আর্য্য ঋষিরা কি আস্‌বে তোমার মুখে ছাই তুলে দিতে?"

আমি শুনে যাই, কি আর করব? পুলিনকে কিছু বলে কোনোই লাভ নেই। আমরা নিতান্ত বিংশ শতাব্দীর চ্যাংড়া ছেলে, আমাদের কথা সে শুন্‌বে কেন? স্বয়ং রাজর্ষি জনক বা পিতামহ ভীষ্ম যদি নেমে এসে তাকে কিছু উপদেশ দেন, তাহ'লে সে শুন্‌তে রাজী আছে। বন্ধুবান্ধবরা কিছু বল্‌লে সে এমন গভীর নির্লিপ্ততা সহকারে, উদাস গলার স্বর করে উত্তর দেয়, যে ইচ্ছা করে চুলের মুঠি ধরে তাকে আবার বর্ত্তমানের গণ্ডিতে টেনে আনি।

পুলিন তার মা বাবার একমাত্র ছেলে, আর দুটি মেয়ে আছে। তাইতে ব্যাপারটা আরো শোচনীয়। মেয়েরাও অন্যের ঘরে চলে যাবে, আর এই কিম্ভূত কিমাকার ছেলে নিয়ে তাঁরা চিরকাল ঘর করবেন কি করে? পুলিনের বাবা পুলিশে কাজ করেন, তাঁর এ সব ব্যাপার একেবারে দুচক্ষের বিষ। মাও দেশে মিশনারীদের স্কুলে পড়েছিলেন ছেলেবেলায়, তাঁরও এতটা বাড়াবাড়ি বরদাস্ত হয় না।

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

আমি বল্‌লাম, "আরে বাপু বলেই দেখনা, ফাজ্‌লামী করি কি আর কিছু করি? যা শুনব তাই বিশ্বাস কবব, এমনও আবার হওয়া উচিত নয়।

পুলিনের একটু গল্প করাব ইচ্ছাও হয়েছিল বোধ হয়।

সে বল্‌লে, "কি বলব ভাই ভূপেন,. স্বামীজির কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিতে লাগ্‌ল। তোবা ত বিশ্বাস করবি না, কিন্তু যাবা এ সব নিয়ে চর্চ্চা করে, তারা বোঝে, কার ভিতর আসল জিনিষ আছে, আব কে ভণ্ড।"

আমি বললাম, "কি বিষয়ে এত কথা হ'ল?"

পুলিন বল্‌লে, "নিজেব চৌদ্দটা আগের জন্মেব কথা তিনি বলে গেলেন বে! এমন প্রাঞ্জলভাবে ঠিক যেন কালকেব ঘটনা, চোখেব উপর যেন দেখছেন।"

মাধব বল্‌লে, "সে ত আমিও পারি। তুই আমায় জিজ্ঞেস কর, আমিও তোর প্রাণ জল কবে দিচ্ছি।"

পুলিন গভীব তাচ্ছিল্যেব সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, "বানিয়ে ত সবাই বল্‌তে পারে।"

মাধব বল্‌লে, "তোমাব স্বামীজি যে বানাচ্ছেন না, তাব প্রমাণ কি?"

পুলিন বল্‌লে, "সব কিছুব প্রমাণ চাইতে গেলে আব চলে না। তাহলে ত ঈশ্ববেব অস্তিত্বেও প্রমাণ অভাবে অবিশ্বাস করতে হয়। জানিস্‌, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা, লঙ্কা-দহনের কথা পর্য্যন্ত তাঁব মনে আছে।"

মাধবটা দুপাটি দাঁত বার করে হাসতে আরম্ভ করল। আমি তাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে বল্‌লাম, "তবু কি বল্‌লেন, একটু খুলেই বল্‌না?"

পুলিন বল্‌লে, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি নিজে 'পার্ট' নিয়েছিলেন জানিস্‌? শেষে দ্রোণাচার্য্যেব এক বাণে তাঁর মৃত্যু হয়। অনর্গল সংস্কৃত কথা যখন বল্‌তে লাগলেন, তখন মনে হল, আমরাও চোখেব সামনে সব দেখতে পাচ্ছি।"

মাধব বললে, "রামায়ণের যুগে তিনি যে কি ছিলেন, তা তুই বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছি।"

পুলিন বল্‌লে, "ছাই পেরেছিস্‌। বল দেখি কি ছিলেন তিনি?"

এইবারে একটা মারামারি বেধে যাবে এই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লাম, "আরে

আহরিকা

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

মেধো, তুই থাম দেখি। তোর গল্প কেউ শুন্‌তে চাইছে না। হ্যাঁরে পুলিন, চৌদ্দটা জন্মেরই তিনি বর্ণনা করলেন নাকি?"

পুলিন বল্‌লে, "না অত সময় ছিল কোথা? ঐ মহাভারতের কথা বল্‌লেন, আর এক জন্মে মিশর দেশের এক প্রসিদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন, তাবই কথা বল্‌লেন। বল্‌লে বিশ্বাস করবি না, সেই-ভাষায় ছোট একটা বক্তৃতাও দিলেন।"

আমি বল্‌লাম, "অনেকক্ষণ ত সেখানে ছিলি, সারাদিন করলি কি?"

পুলিন এইবার আবার গম্ভীর হয়ে গেল। খানিক ভেবে বল্‌লে, "তাঁর কাছে একটু যোগাভ্যাস করছিলাম।"

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্‌লাম, "কি রকম করে?"

পুলিন বল্‌লে, "তিনি বল্‌লেন কিনা যে মানুষমাত্রেই ইচ্ছা কবলে জাতিস্মর হতে পারে, তাই উপায়টা জেনে নিচ্ছিলাম।"

এবার আমি এবং মাধব এক সঙ্গে বলে উঠলাম, "শিখতে পেরেছিস্?"

পুলিন বল্‌লে, "ও কি আর একদিনের ব্যাপাব যে শিখে নেব? অনেক দিন ধরে সাধনা করতে হবে।"

মাধব বল্‌লে, "তাইত, মুস্কিল হল ত! তোর মা বাবা আব তোকে কিছুতেই যেতে দেবেন না, এবার আরো কড়া পাহারা বস্‌বে।"

পুলিন বললে, "পাহারা দিয়ে জগতে কাকে কে কবে আটকাতে পেরেছে? আমাকেও পারবে না। আত্মার শক্তির কাছে আর সব শক্তি হার মেনে যায়। আর তাঁর কাছে না যেতে পাবলেই বা কি? পদ্ধতিটা ত শিখে নিয়েছি, মাঝরাত্রে একলা বসে অভ্যাস করলেই হ'ল? কে আমাকে বাধা দেবে তখন?"

আমার একটু কৌতূহল হল। ভাবলাম এর ভিতর সত্যি কিছু থাকলেও থাকতে পারে। বল্‌লাম "আমাকে পদ্ধতিটা শিখিয়ে দে না ভাই, একবার আমিও চেষ্টা করে দেখি?"

মাধব বলে উঠ্‌ল, "আমিও শিখব।"

পুলিন মাধবের দিকে দারুণ বিদ্বেষের সঙ্গে তাকিয়ে বল্‌লে, "হ্যাঁ, তোমায় শেখাব না ত কাকে আর শেখাব? অবিশ্বাসী, নাস্তিক!"

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

আমার ভয় হ'ল এই বুঝি লেগে যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মাধব একটুও চট্‌ল না। বরং আবার হেসে চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে বল্‌লে, "আরে আমার মত নাস্তিককেই পথে আনা ত দরকার? যারা আধাআধি পথে এসেই আছে, তাদের পথ-দেখান না দেখান সমান। আজ হোক কাল হোক, তারা পথ খুঁজে বার করবেই।"

পুলিন একটু ইতঃস্তত করে বল্‌লে, "এ সব তাড়াতাড়ি বলে বসলে কোনো লাভ হয় না। যে নিজে সিদ্ধিলাভ করেনি, সে অন্যদের শেখাতে পারে না। আগে নিজে আমি করে দেখি ক'দিন তবে ত?"

ভিতরে মেসোমশায়ের সাড়া পাওয়া গেল। তিনি গলা খ্যাক্‌রাতে খ্যাক্‌রাতে এগোচ্ছেন। তাঁর বকুনি শুনবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তাই আমি আর মাধব উঠে পড়লাম। পুলিনকে বল্‌লাম, "আচ্ছা, তুই নির্জ্জনে একলাই ক'দিন অভ্যাস কর। কিন্তু কথা রইল, যেই তুই নিজে একটু ফল পাবি, অমনি আমাদের শেখাতে হবে।"

পুলিন গম্ভীরভাবে বল্‌লে, "বেশ। কিন্তু জেনে রেখো, এ সব তামাশা করবার জিনিষ নয়। সে চেষ্টা কর যদি, অতি ভয়ানক শাস্তি পাবে।"

মেসোমশায় ঠিক এই সময়, "হ্যাঁ রে বোকা, বলি পাঁচনটা খেয়েছিস্ ত?" বলে বেরিয়ে আসাতে, আমরা উঠে পড়ে দৌড় দিলাম। মাধব বেরিয়েই বল্‌লে, "পুলিন ঠিক এর আগের জন্মে একটি লম্বকর্ণ গর্দ্দভ ছিল, এ আমি লিখে পড়ে দিতে পারি।"

কয়েকদিন পুলিনকে আমরা সময় দিলাম, অর্থাৎ তাকে আর জ্বালাতে গেলাম না। দিন ছয় পরে আবার সকালবেলা আমরা দুই বন্ধু গিয়ে উপস্থিত। সেদিন আবার রবিবার, পড়াশুনোর কোনো উৎপাৎ নেই।

পুলিন তখন বাইরের ঘরে বসে কষে সরষের তেল মাখ্‌ছে। সাবান টাবান সে ব্যবহার করে না। আমাদের দেখে বল্‌লে "কি খবর?"

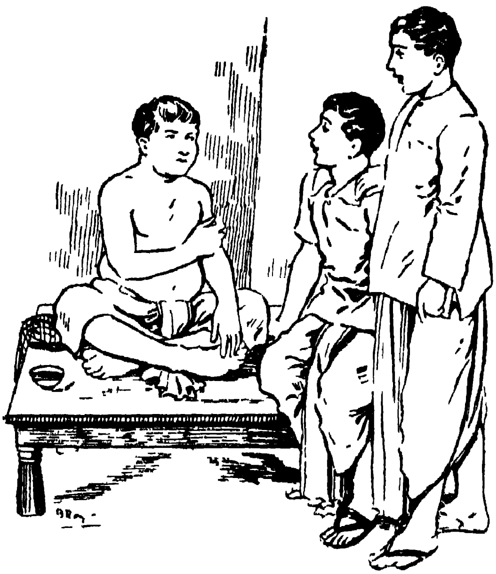
আমি এধার ওধার তাকিয়ে দেখে নিলাম, কেউ কোথাও আছে কি না। তারপর জিজ্ঞেস করলাম "তোর সাধনার কতদূর কি হ'ল রে? কিছু ফল পেলি?"

পুলিন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্‌লে, "একেবারে যে পাইনি তা নয়। তবে সিদ্ধিলাভ এখনও হয়নি।"

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

মাধব ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লে, "তবু কতটা কি ফল পেলি বল না খুলে? আমরা ত আর সেটা কেড়ে নেব না?"



পুলিন বল্‌লে, "প্রথম সবই ধোঁয়া দেখতাম। এখন আস্তে আস্তে সব আকার নিচ্ছে। তবে নিজের এই অস্তিত্বটাকে এখনও একেবারে হারিয়ে ফেল্‌তে পারি না। সেটা যে দিন পারব, সে-দিনই সিদ্ধ হব। এ শরীরটা কাঠের মত পড়ে থাকবে, আমার ইচ্ছামত তার ভেতর ঢুকব বেরব।"

মাধব বল্‌লে, "বাপ্‌, তাহলে ত কাণ্ডই করা যায়! আচ্ছা, তোকে আর এক হপ্তা দেওয়া গেল সময়।" বলেই সে আমাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

কাগজে মাঝে মাঝে নানারকম খবর পড়ি, হতেও পারে পুলিনটাও একেবারে বুজ্‌রুক্‌ নয়। কিন্তু পুলিনকেও চিনি ত! ওই রকম ছেলে যে আবার সিদ্ধিলাভ করতে পারে এটা বিশ্বাস করাও যে অসম্ভব?

এক হপ্তা ত কাল শেষ হবে। তারপর দেখা যাক পুলিন কি বলে? আগাগোড়া সব বানিয়ে বলার সাহস কি তার হবে?

কিন্তু আমরা তার কাছে যাবার আগেই পুলিন এসে হাজির। ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "আশ্চর্য্য ফল পেয়েছি। তুই মাধবকে ডেকে পাঠা, তখন সব খুলে বল্‌ব।"

পুলিনের মুখ দেখে, আর তার গলার স্বরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস হল না যে, সে বিশেষ কোনো ক্ষমতা লাভ করেছে।

আমার ছোট ভাই গিয়ে মাধবকে ডেকে আনল। সে এসেই বল্‌লে, "পেয়ে গেলি সিদ্ধি? আচ্ছা বল দেখি সব খুলে, দেখি বিশ্বাস করবার মত কি না।"

পুলিন খুব ফলাও করে তার পূর্ব্বজন্মের বিবরণ বলতে বসে গেল। মাঝরাত্রে

শ্রীসীতা দেবী

সন্ন্যাসীর শিক্ষামত সে কি সব খেয়ে আসনে বসেছিল। তিনি তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন, নিজের নাভিকুণ্ডের দিকে সমস্ত মনোযোগ একাগ্রভাবে দিয়ে কি রকম ধ্যান করতে হয়। ঘণ্টা দুই বসে থাকবার পরেই নাকি পুলিনের সূক্ষ্ম শরীর তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। সে আগের জন্মে হরিদ্বারে কোন এক ব্রাহ্মণের ছেলে ছিল, সেই জীবনের মধ্যে গিয়ে হাজির। তাদের বাড়ী ঘর দোর, কে তাঁদের আছেন, কে নেই, কার কি নাম, কে কি করে সব পুলিন পটাপট বলে যেতে লাগল।

আমি একটু অবাক হ'য়ে গেলাম। পুলিনের মত একটা আকাট মূর্খ এই রকম শক্তি পাঁচ-ছ' দিনে পেয়ে গেল এ আমার বিশ্বাস হয় না।

এমন সময় মাধবই ব'লে উঠ্‌লো, "আমি কিন্তু আজ রাত্রে যাচ্ছি তোর কাছে। কথা দিয়েছিস্ যে আমাকে শেখাবি।"

পুলিন বল্‌লে, "বেশ, আমি শেখাব। কিন্তু সিদ্ধিলাভ সে তোমার নিজের হাতে। অপবিত্র মন নিয়ে একশ বছর অভ্যাস করলেও কিছু হবে না। আবার যারা শুদ্ধ চিত্তে, বিশ্বাস নিয়ে বস্‌বে, তাদের একদিনেই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে। ভূপেন, তুইও কি আস্‌বি?"

আমি এই জন্মের ঠেলা সাম্‌লাতেই ব্যস্ত, আগের জন্মের ভাবনা ভাববার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, তবু কৌতূহলের খাতিরে বল্‌লাম, "হ্যা যাব বইকি।"

পুলিন ত বাড়ী ফিরে গেল। মাধব বল্‌লে, "খেয়ে দেয়ে একটু রাত ক'রে যাওয়া যাবে, কেমন? ওর বাপ ঘুমবার আগে গিয়ে কোনো লাভ নেই।"

খাওয়া-দাওয়া সেরে বেশ একটু রাত ক'রে আমরা দুই বন্ধু পুলিনদের বাড়ী গিয়ে হাজির। পুলিনের মা এসে তালা খুলে আমাদের ঢুক্‌তে দিলেন। বল্‌লেন, "দেখ বাবা, ওটাকে যদি একটু পথে আন্‌তে পার। বুঝলাম পুলিন তাঁকে বেশ ধাপ্পা দিয়ে রেখেছে।

পুলিনের তিনতলার ঘরে গিয়ে আমরা দুইবন্ধু উঠলাম। পুলিন খাটে শুয়ে আছে, আমাদের দেখে বল্‌লে, "তোরাও একটু গড়িয়ে নে। মা-বাবা, আর ঐ লক্ষ্মীছাড়ী দুটো বেশ ভাল ক'রে ঘুমিয়ে না গেলে কাজ আরম্ভ করা যাবে না।"

আমরাও শুলাম। মুস্কিল এই যে আমি আবার একেবারে রাত জাগতে পারিনা। বেশ ঘুম এসে গিয়েছে, এমন সময় মাধব আমাকে গুঁতো মেরে তুলে দিয়ে বল্‌লে, "এই গাধা ওঠ্, এখানে কি ঘুমোবার জন্যে এসেছিস্।"

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

উঠ্‌তে হ'ল। পুলিনের নির্দ্দেশ মত তসরের কাপড় পর্‌তে হ'ল, গঙ্গা জল দিয়ে হাত, মুখ সব ভাল ক'রে ধুতে হ'ল, গায়ের জামা খুলে ফেল্‌তে হ'ল। ঘরে ধুঁনো দেওয়া হ'ল, বাতিটা নিভিয়ে একটা রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালা হ'ল। তারপর তিনখানা কুশাসনে বসে আমরা পুলিনের নির্দ্দেশ মত ধ্যান আরম্ভ ক'রলাম।

আমার বিশ্বাস, মিনিট দশ পনেরোর ভিতরেই আমি দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কতক্ষণ পরে বল্‌তে পারবনা, একটা অদ্ভুত আওয়াজে আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখি ঘরের অবস্থা একেবারে লণ্ডভণ্ড। প্রদীপটা উল্টে পড়ে নিভে গেছে, ইলেক্‌ট্রিক বাতিটাই আবার জ্বল্‌ছে। ঘরের ভিতর চৌকী, বই, কাপড়-চোপড় যা কিছু ছিল, সব কে যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলেছে। পুলিন তার উঁচু টেবিলটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছে, তার গলা দিয়ে ভাল ক'রে স্বর বেরচ্ছে না। তবু সে আমায় ডাকবার চেষ্টা কর্‌ছে। আর মাধব জানোয়ারের মত চার পায়ে হেঁটে ঘরময় ঘুরছে, মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে পুলিনকে ধ'রবার চেষ্টা ক'রছে। তার মুখ দিয়ে যে আওয়াজটি বেরচ্ছে, তা শুনে ত' আমার বুকের রক্ত জল হ'য়ে এল। অবিকল বাঘের ডাক, চিড়িয়াখানায় এই রকমই শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।



আমাকে তাকাতে দেখে পুলিন একেবারে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠ্‌ল, "ও ভাই আমাকে বাঁচাও! মেধো বাঘের জন্মে ফিরে গেছে! ও আমাকে এখনি খাবে!"

মাধব আবার "ঘ্যাও" ক'রে গর্জ্জে উঠে আর এক লাফ দিল পুলিনকে ধ'রবার

জন্মান্তর

শ্রীসীতা দেবী

জন্যে। পুলিন মবিয়া হ'য়ে এক লাফ দিয়ে, খাটটার উপর গিয়ে পড়্ল। খাটখানি ছিল জীর্ণ এবং পুলিনের নধর দেহটির ভাব কম নয়। মড়মড় শব্দে খাট ভেঙ্গে, পুলিনকে শুদ্ধ নিয়ে, মেঝেয় চারটুক্‌রো হ'য়ে প'ডল। মাধবও তার উপর লাফিয়ে প'ডল।

নীচে থেকে পুলিনের বাবা গর্জ্জন ক'বে গালাগালি দিয়ে উঠ্‌লেন, "হতভাগা ছোঁড়াদের জ্বালায় রাত্রেও ঘুমোবনা নাকি ?"

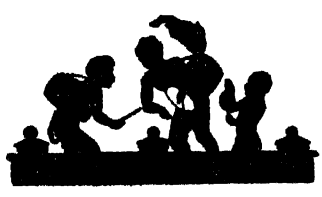
আমি তাড়াতাড়ি উঠে পুলিন ও মাধবকে টেনে ভাঙ্গাখাট, এবং বিছানার স্তূপের উপব থেকে সবিয়ে দিলাম। দেখা গেল বাঘরূপী মাধব পুলিনের নাকেব ডগায় আচ্ছা ক'রে কামড়ে দেওয়া ছাড়া আব কিছু ক্ষতি করেনি। পুলিনেব ত' সাড়া শব্দ নেই, ভিবমী গিয়েছে কিনা কে জানে।

তিনতলা থেকে নীচে নামবার একটা লোহার সিঁড়ি ছিল, জমাদার সেইটে দিয়ে আস্‌ত যেত। মেসোমশায় গাল দিতে দিতে উপরে উঠ্‌লেন, শুন্‌তে পেয়েই আমি ত লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়লাম। উঠোনে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকাব, হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সদর দরজার কাছে গিয়ে দেখি, ভাগ্যে মাসীমা আবার তালা আঁটেননি, তা' হ'লেই আজ হ'য়েছিল আব কি! দরজা খুলে বেবিয়ে এক ছুটে বাড়ী।

সকালে উঠে দেখি, মাধব দিব্যি আমার বিছানার পাশে ব'সে মায়ের তৈরি পেয়াবার জেলি দিয়ে রুটি খাচ্ছে।

জিজ্ঞেস ক'রলাম "কি হে, তোমার এমন নিরামিষে রুচি কেন ?"

মাধব চোখ টিপে হেসে বল্‌লে, "কৈ আমাব ত' এখন আগের জন্মের কোনো কথা মনে হচ্ছে না ?"





লছমী কোথায়?

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

পাহাড়তলির কোলে। আধ-ঘুমন্ত অচিন নদী চলেব ভাবে ঢুলু-ঢুলু। সহসা এলো ডাক—নীল সাগরের। তর সয় না। ছুটে চলে—তর-তর-তর! কাজ্‌লা-কালা রাত। ভেসে আসে ঝরণা-ঝবা জলেব মাথায় ছোট্ট ডিঙ্গিব তাজ—'নেয়ে' একা। কচি কাঁচা-বয়েস, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে বাঁশের বাঁশী, বুকের পাটাই বা কি কম! হিম্মৎ ওর বহুৎ, কিন্তু সে তারিফ পরে·····তুই কাদের রে? কি চাস?······বাঁশীর রন্ধ্রে লাগায় লম্বা ফুঁ। ডুক্‌রে বাঁশী ফুক্‌রে ওঠে—সাহানা কি বাগেশ্রী বা এমনি একটা কিছু। কে-ই বা সে তান শোনে! শুনতো যে সে নেই। ব্যাকুল বাঁশী গুমরে কাঁদে—রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগায় ব্যথা! কি যে সে বেদনা! আকুল-ডাকে ডাকে বাঁশী—লছমি? বহিন্? হাওয়ার স্তবে হারিয়ে যায় তার রেশ।

* * *

স্বচ্ছ চিকণ মোমের পুতুল। জুল্‌জুলে চোখ। তুল্‌তুলে গাল।······সে কি সে' সব জানে—তখন যে সে শিশু। বাপের কোলে, আপেল-গালে ছোট্ট টোকা—হাজারো চুমু। হাঁফিয়ে ওঠে। ঝাঁপাই-ঝোড়ে। পালিয়ে আসে মায়ের পাশে। নীরাপদ নীড়—তার লক্ষ্মী মা। মায়ের মুখে ফোটে হাসি—দোলে মাথা···'আও! আ-যা! আ-যা মেরা মতিয়া কি ফুল্—সোণেকা লছমী!'···সেই থেকেই সে—লছমী। তার পর এলো নবাগত অতিথি তার ছোট্ট ভাই—মোহন সে ছিলো একদিন। আর আজ? মা'র বুক হাহাকারে ভরে ওঠে। ভাবতে পারে না—এলিয়ে পড়ে।

লছমী কোথায় ?

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

'মা-জি ?'

মায়ের স্বরে হতাশার সুর—'কোওন্ ? মোহন ?'

যে এসেছে সে ঢোক গেলে। চিবিয়ে বলে, হুঁ সে মোহন-ই ত'। একটু থামে, কি যেন ভাবে। আবার বলে, না না সে মোহন নয়, সে কান্হাইয়া। লছমী গেছে সে ত' আছে—তার হাতে কি খেতে দোষ ?

লছমীর মা ফুঁপিয়ে ওঠে—এও তার ভাগ্যে ছিলো !

সাবধানি কানাইয়া। তবু তাল গেল তার ভেস্তে। মিছে বলা কি সাধ ! নইলে যে সাড়া দেয় না মা-জী। অমনি গোঁজ হ'য়ে আছে আজ ছ'মাস। মোহনেরও নেই ফুরসৎ। তবু প্রায় দিনই সে আসে। এক-টুক্রো রুটি, একটু ঠাণ্ডা পানি—নইলে তার মা খায় না যে। এমনি করেই যায়। এবার হপ্তা পেরুলো মোহনের পাত্তা নেই। সে গেছে লছমীর খোঁজে—কানাইয়াও যাক মোহনের তল্লাসে···তার পর মোহনের সাথে হয়ত ভেট হোলো, লছমীকেও না হয় মিললো। দু'জনকে দু'হাতে নিয়ে নাচতে-নাচতে কানাইয়া এসে কুঁড়ে-ঘরে দেখলে কি ?···খাটিয়ার উপর শুয়ে তাদের মা-জী · ডাকলে দেয় না সাড়া—বরফ-ঠাণ্ডা দেহটা রেখে প্রাণটা গেছে হাওয়ায় মিশে।··· কাঁদবে তার লছমী—মোহনও তাই। না না, কাজ নেই লছমীকে শাদি ক'রে ··বেইমান সে নয়। মা-হারা যেদিন প্রথম এই শান্তি-নীড়ে আশ্রয় পায় সে—সে-কথা কি ভোলবার !·· ধন দৌলত ? দিতে চাইলেও নেয় না মা-জী। বলে, 'লছমীকে পয়লা তুহার হাতে তুলে দি' তবে ত' ?'

সে আশায় পড়েছে ছাই। লছমী আসবে না আর। তাই বলে কি শুখিয়ে মরবে মা-জী ! নিরুপায়—একান্ত নিরুপায়। পারে শুধু মোহন আর পারতো······ !

তার কলিজার লছমীকে কোন ডাকু লুটে নিলে রে ? আপশোষ।

* * *

নসীব বড় চিজ। নইলে বনেদী ব্যবসা—বাদশা-নামদারের ইনাম—দু'হাতে রোজগার। তখনকার দিনে রেশমী-মস্লিনের নাম-করা কারিকর—লছমী-মোহনের বাপজী ছাড়া আবার কে ? গুটীপোকার লালা—রেশমী ফেত্তির লেত্তি। যত ইচ্ছে টানো—লম্বা চলেছে সোজা। ফুঁয়ে ওড়ে, টানলে টস্কায় না—মোহরের গাদি কি আর

লছমী কোথায় ?

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

অমনি-অমনি ! এসব কিন্তু লছমীর বরাতে। সেই ছিলো তাদের লক্ষ্মী। মোহন তার অনেক পরে।

ছোট্ট সংসারের আসল প্রাণী এই চারটি। তার পর লোক-লস্কর আসবাব-তৈজস —সে সব বৈভব ভোগ করে কে ? লছমী খায় বাদাম—মোহন, পেস্তা। লছমীর হাতে কবুতার ডাকে 'বক্-বক্কুম্-কুম্'—মোহনের হাতে শ্রাজু, লক্কা। বাঁশী কিন্তু দু'জনেই শিখেছে সমান-সমান। মুখের কথা অল্প, বাঁশীর প্রতিযোগীতাই যেন তাদের পেয়ে বসেছিলো।··· খেতে বাঁশী, শুতে বাঁশী। বাঁশীর ভাষায় হোতো গল্প, গান—বাঁশীর কাকলিতেই পড়তো ঘুমিয়ে। খুব বড় ওস্তাদের সাক্‌রেদ যে তারা।

তার পর সে এক ঘুট্‌ঘুটে ময়লা রাত। ভাঙলো তাদের কপাল। চীৎকার উঠলো, 'খুন !'···গেলো বাপজীর জান। গেলো দৌলত, ধন, ইজ্জত ! লুট হোয়ে গেলো—লছমী। সেই থেকেই ত' মুষড়ে পড়েছে মা-জী। তার বহিনের লেড়কা কানাইয়া, বড় বাপের বেটা। লছমীর সাথে ভাব খুব। মা-জীর সাধ, লছমীকে ওকে দেয়—শেষের কটা দিন কাটবে ভালো। সেই আশাই কি তার মিটলো ? লছমীকে নিলে ডাকুতে লুটে। মোহনও বোধ হয় বাঁচবে না আব। মোহন কিন্তু তা' বলে না। সে বলে, লছমীকে কাঁধে-ফেলে ডাকুরা যখন চলেছিলো ঐ ঢলের দিকে, পা-টিপে টিপে লুকিয়ে সে দৃশ্য দেখেচে সে। জলের ওপর মস্তো লম্বা ছিপ্। তাইতে তুলে নিমিষের মধ্যে কোথায় যে গেল উধাও হ'য়ে !···মরতে কি এখন সে পারে ? প্রতিজ্ঞা তার কঠোর। উদ্ধার সে লছমীকে করবেই। কিন্তু কেমন ক'রে ?

* * *

বাদল-দিনের শেষ। মেঘের মাদল থামতে হোলো অপরাহ্ণ-বেলা।······উপত্যকা, চরাই, উৎরাই—সমান তালে পা-ফেলে যায় বল্লম-হাতে ও কে ? পিছন থেকে বোঝা যায় না ঠিক কানাইয়া কি না। ···· ······

কিন্তু এই পাহাড়ের পিছন-পাড়ে ডিঙ্গির ওপর শ্রান্ত মোহন ঘুমিয়ে আছে, এ একেবারে অতি স্পষ্ট।·· সহসা শূন্যে কাড়া-না-কাড়া ওঠলো বেজে—কড়্‌কড়্ ! কড়্‌কড়্ !...ধড়মড় ক'রে উঠেই মোহন বাঁশীতে দেয় ফু। যত ডাকে মেঘ ;— মেঘ-মল্লারে বাঁশীর ভাষা মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে ডাকে—আয় ! লছমী—আয় !......

লছমী কোথায় ?

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

......ওপর থেকে ঝরা-ধারায় বাঁশীর সুরে ভেসে আসে—মোহনিয়া-ভাই ! তুমি কোথায় ? বন্দী আমি বন্দীশালায়—এই গম্বুজের চূড়ায়।

···নাচে মোহন—তালে তালে বাজে মোহন বাঁশী। দেখতে পায় না কিছুই।···শুধু পথের কথা জানতে চায় সে। যে পিচ্ছিল ঐ পাথর ! কেমন ক'রে পৌঁছবে তার কাছে।

উত্তর আসে—উত্তর দিকের জান্‌লায় যদি পায় একগাছি রশি—তবেই আবার দেখা হবে। নইলে এই শেষ।

···গালে হাত দিয়ে ভাবে মোহন। এ ব্রত কি বিফল হয়—হদিস একটা মেলে। অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে ছাউনীর মধ্যে দৃষ্টি চালায়—একটি কৌটো, একটা খাঁচা, গুটী-লালাব সূক্ষ্ম রেশম—হাঁ, সবই ঠিক।

কৌটোর ভেতর আছে কি ?......এক-ঝাঁক জোনাকি। প্রত্যেকটি জোনাকির গায়ে লেপ্টে দিলে গুটীপোকার আটা—সূক্ষ্ম রেশম। ঐ উচ্চে—বহু উচ্চে উন্নত-শির শৃঙ্গ। আরও উচ্চে বন্দীশালার কক্ষে জ্বলে আলো মিট্‌-মিট্‌ ! লাখো জোনাকি উঠলো উর্দ্ধে। সূক্ষ্ম রেশমী-ল্যাজ সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্মতম—খেই তার মোহনের হাতে। তাতেও যদি না হয় ? ··খুললে খাঁচার দ্বার—'বক্‌-বকুম্‌-কুম্‌ !' ...'এ কবুতার ! লছমী তুহার ঐ !'......আগে ওড়ে আলোব ছাতা—জোনাকি জ্বলে আবার নেভে—আবার জ্বলে পিট্‌-পিট্‌-পিট্‌। তার নীচে ঠিক ছাড়লে, স্রাজু—পায়ে বাঁধলে সূক্ষ্ম রেশম। তার খেই-ও মোহনের হাতে। দিলে বাঁশীতে ফুঁ—লছমী-ও ঠিক তাই। রাতকাণা কবুতার ওড়ে—মহাশূন্যে বাজী খেলে—উর্দ্ধের বাঁশী ডাকে তাকে। সে আহ্বান কি উপেক্ষার গো ! ধরলে লছমী—খপ্‌ ! চুমা দিয়ে দিলে ছেড়ে—দিলে রেশমে·টান। আস্তে আস্তে নীচে হ'তে ছাড়ে মোহন লেত্তির ফেত্তি—টানে লছমী। যোগায় মোহন রেশমের পর সুতো—সুতোর পর সরু রশি—তার পর মোটা······

উর্দ্ধমুখে দাঁড়িয়ে মোহন। চোখ ঠিক্‌রে বা যায় ছিট্‌কে। মাঝে মাঝে জোনাকি—পিট্‌-পিট্‌। সেই আলোতে দেখে মোহন—রশি বেয়ে নামে কে না ? ··'লছমী-বহিন্‌ ! লছমী ?'···আনন্দেতে চোখে ঝরে জল। হাততালি দেয় জোরে—সঙ্গে সঙ্গে শিস্‌·········

*　　*　　*

লছমী কোথায় ?

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

···ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্·········সর্দ্দার-ডাকুর ডাকের বাদ্যি। হাঁকে সর্দ্দার, 'এই ? এ-নিরালায় শব্দ কিসের ?'······রক্তচক্ষু।

···পাহাড়ের মাথা—পাথরের সাঁকো—গুপ্তপথে ছোটে ডাকুর দল······তখুনি ফেরে, চীৎকার করে, 'সর্দ্দার ? সর্দ্দার ?—গায়েব !'···

'এই চুপ্ !—চুপ্ !'······লাফায় সর্দ্দার। মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ছোঁড়ে ! ইঙ্গিত তার—জলদি !

* * *

সে কি লড়াই ! ডিঙ্গি টলে। হাত পা কাঁপে—লছমী কাঁদে।······ঝপাং ! এক ঝলক জল উথলে ওঠে পড়লো কে-ও ?···মোহনের গলা—'লছমি ?' আর কিছু না· ·গাঢ় আঁধার।

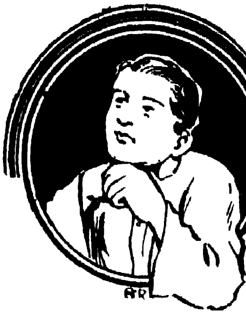
·· কোকিয়ে ওঠে লছমীর গলা···'মোহনিয়া-ভাই ? মোহনিয়া রে !'

·· তীরে ছিলো বল্লমধারী···টনক নড়ে · শব্দ শুনে সাঁতরে আসে—মারে খোঁচা ডাকুর বুকে ! খুন ছোটে ! গরম তাজা !···

·· কোলে তুলে নেয় লছমীকে। তখন কি আর জ্ঞান আছে তার !

* * *

মায়ের প্রাণ হায়-হায় ক'রে ওঠে। বরাতক্রমে লছমীকে যদি পেলে ত' মোহন এলো না ঘরে। কি বরাত নিয়েই জন্মেছিলো ঐ বুড়ি ! হবু-জামায়ের ঐ যে নীরব-অশ্রু ! কার স্মৃতির জন্যে তা সেই জানে। আর লছমী—সে মন-মরা হ'য়ে থাকবে না ত' করবে কি ? চাঁদনির রাত কিন্তু এত কথা বোঝে না। দিয়েচে এক-রাতে সুযোগ বুঝে ফিন্ ফুটিয়ে ঐ কুঁড়েটার অঙ্গনে, প্রাঙ্গণে, চালের·ছিদ্রে, বেড়ার ফাঁকে যেখানে যতখানি পেরেছে।···হঠাৎ লছমী ওঠে চম্‌কে ! পালিয়ে যায় সে পাশের ঘরে—তার হোলো কি ?···উছল হাসি উথলে আসে—যেন একটা একটানা স্রোত ! · অবাক-চোখে লছমীর মা আর কানাইয়া চায় সেইদিকে—আর এদিকে ? এদিককার খবর কেউ জানো ? মোহন আছে···এসে দাঁড়িয়েছে সে তার দরজায়—'লছমি ?'···আবার হাসির তুফান আসে—'টু !'···খিল্-খিল্-খিল্-খিল্ ! · তার আওয়াজ মোহন চেনে। ভাবে, এলো কেমন ক'রে লছমী ! ভেবে সে কূল পায় না—স্বপ্ন ! চোখটা একবার রগড়ায়······আওয়াজটা তার ঠিকই, কিন্তু লছমী ···· ?



ইস্কুলের অচেনা পথ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ববির সঙ্গে আমার খুব বেশী দিনের ভাব নয়। মাত্র কয়েকমাস হঠাৎ ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হ'য়ে গেছে। আমি যখন প্রথম ইস্কুলে ভর্ত্তি হই তখন বাবা আব জ্যাঠা-মশাই আমাকে বলে দিয়েছিলেন আমি যেন খারাপ ছেলের সঙ্গে কখনো না মিশি। সেই থেকে মনের মধ্যে আমাব বরারর ভয় ছিল—এই বুঝি খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশে ফেল্লুম। কে খাবাপ ছেলে কে ভাল ছেলে কারো মুখ দেখে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌তুম না, সেইজন্যে সব ছেলেকেই ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলতুম। দেখ্‌তুম অনেক ছেলেই পরস্পবের সঙ্গে আলাপ জমায়, গল্প কবে। নিশ্চয় এদের বাবারাও খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশতে বারণ ক'রে দিয়েছেন। এরা সব কি ক'রে ভাল ছেলেদের খুঁজে বার ক'রত অনেক ভেবেও আমি ঠিক করতে পারতুম না। মেসবার ইচ্ছে হ'ত আমার অনেকের সঙ্গে; কারুর সঙ্গে মিশতুম না ব'লে ভয়ানক একা একা লাগত।

শেষকালে একদিন জ্যাঠামশাইকে গিয়ে আমার মুস্কিলের কথা জানালুম। বল্লুম "জ্যাঠামশাই, আপনাদের কথামতো আমি কোনো খারাপ ছেলের সঙ্গে মিশিনি। কিন্তু ভাল-ছেলেদের কেমন ক'রে চিনে নেব?" জ্যাঠামশাই বল্লেন, "তোর মতো বোকা ছেলে তো দেখিনি। ভালো ছেলে হচ্ছে যারা লেখাপড়ায় ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হয়; তাদের সঙ্গে মিশবি; দেখ্‌বি তুইও লেখাপড়ায় ভাল হ'য়ে উঠবি। আমরা তো ছেলেবেলায় ফার্ষ্ট বয় ছাড়া কারুর সঙ্গে কথাই কইতুম না।"

তারপর দিন আমি আমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয়ের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে গেলুম।

ইস্কুলের অচেনা পথ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মালাপ কি ক'বে কর্তে হয় মোটেই জানিনা। যতটা পাবি মিষ্টি ক'রে বল্লুম 'ভাই তুমি কি ক'বে ফাষ্ট' হও?" ফাষ্ট' বয় যা' জবাব দিলে আমাব একটুও ভাল লাগল না। বল্লে—"তোর মতো গাধা পিটিযে।" আমি যে বোকা ছেলে তা' আমি বাবা এবং জ্যাঠামশাই-এর কাছে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু গাধা বল্লে আমাবও মনে লাগে। যাই হোক্, ভাবলুম আমারই আলাপ ক'ববাব কোথাও ভুল হ'যেছে, এর উপব রাগ কবলে তো চল্‌বেনা, কাবণ এব সঙ্গেই আমাব বন্ধুত্ব ক'বতে হ'বে।

আমি পিছপাও হ'লুম না। ফাষ্ট' বয, সেকেণ্ড বয এই জাতির কযেকটি ছেলেব সঙ্গে আলাপ ক'রে ফেল্লুম। এতদিন এবাই আমার বন্ধু ছিল যদিও কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি এদের বন্ধুত্ব যে আমার খুব ভালো লেগে এসেছে তা' আসেনি। কোথায় গলদ ধ'ব্‌তে পারতুম না, কিন্তু গলদ একটা ছিল বেশ টেব পেতুম। ঠিক যেন নিজেকে ওদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারতুম না। ওবা সবাই নিজেদের মাথা উঁচু ক'রে রাখত। ওরা যে ক্লাসের ভালো ছেলে এ কথা সব সময় ওরা মনে কবে বাখত। সেইজন্যে আমার নিজেকে মনে হ'ত আমি যেন ওদেব কৃপার পাত্র। আমি ওদেব পিছু-পিছু চল্‌তুম, ওদের নানারকম ঠাট্টা সহ্য ক'ব্‌তুম, তবু ওদের বন্ধুত্বেব আসনে নিজেকে বসাতে পারিনি।

এমনি ভাবে এতদিন চলে এসেছে। তারপব হঠাৎ হয়ে গেল ববির সঙ্গে আমাব আলাপ। ববি ফাষ্ট' বয়ও নয়, সেকেণ্ড বয়ও নয়, সাধারণ ছেলে। আশ্চর্য্য বকম আমার সঙ্গে ওর মিল হল। ওকেও বাড়ীর লোকে বলত বোকা ছেলে কিন্তু ও নিজে মনে মনে বিশ্বাস করত ও খুব চালাক। তার প্রমাণও দিত, ও নাকি ঠিক মানুষ চিনতে পারে—যা খুব কম লোকেরই সাধ্য। একদিন বল্লে, সারা ক্লাসের মধ্যে ও একটা মানুষ খুঁজে বার করেছে, সে হচ্ছি আমি। আমি একটু অবাক হয়ে বল্লুম, "কেন জ্যোতিষ, প্রসন্ন যাবা ফাষ্ট' সেকেণ্ড হয় তাবা কি মানুষ নয়?" রবি বল্লে, "ওরা এক চক্ষু হরিণ। কবল বইএর দিকে ওদের চোখ খোলা, আর কোনো দিকে নয়।" শুনে আমার ভয় হল ববি হয়তো খারাপ ছেলে—এর সঙ্গে মিশতে সাবধান হতে হবে। কিন্তু যত তলিয়ে ভেবে দেখতে লাগলুম রবিব কথাগুলো আমায় অবাক করে দিতে বসল। ফাষ্ট' বয়দের সম্বন্ধে ও যে কথাগুলো বলেছিল আমার মনে হল খুবই ঠিক। সব চেয়ে

ইস্কুলের অচেনা পথ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বেশী আমার মনে ধরেছিল আমার সম্বন্ধে ও যে কথাটা বলেছিল সেইটে। সেই কারণে আমি সব দ্বিধা দূর করে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেল্লুম। রবির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, কেন জানি না, সেই প্রথম আমার মনে হতে লাগল, আমি যে শুধু মানুষের মতো একজন মানুষ তা নয়, আমিও রবির মতোই চালাক। লোকে আমায় জানে না বোঝে না ব'লে বোকা বলে।

রবি একদিন আমাকে ওদের পাড়ার ফুটবল ক্লাবে নিয়ে গেল। তিন দিকে রাস্তা, একদিকে টিনের বেড়া দেওয়া ফুটবল গ্রাউণ্ড। গ্রাউণ্ড মানে ঘাসলেশহীন এবড়ো খেবড়ো খানিকটা জমী, তার দু পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে গোল পোষ্ট এবং অত্যন্ত যত্ন করে চূণের রেখা দিয়ে পেনাল্‌টি লাইন চিহ্নিত করা। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলুম তখন কয়েকজনে মিলে খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে। রবি আমায় বল্লে, "খেলবি?" আমি ঘাড় নাড়লুম। সেই আমার জীবনে প্রথম ফুটবল খেলা। একটা চামড়ার বল পায়ে করে ঠেঙাতে যে এত আনন্দ তা এর আগে কোনদিন বুঝিনি। আমার আনাড়িপনায় আর সবার খেলা সেদিন আমি মাটি করে দিয়েছিলুম বটে কিন্তু নিজে ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম। সাধারণতঃ বিকেল বেলা যদি আমি বাড়ী থেকে বেরই আমাকে বাড়ীতে বলে যেতে হয় আমি কোথায় যাচ্ছি। সেদিন না-বলেই গিয়েছিলুম এবং ফিরে এসে সত্যি-কথা বলবার আমার সাহস ছিল না। কারণ রবি যা-ই হোক সে তো আর ফার্ষ্ট বয় নয়, সেকেণ্ড বয়ও নয়—বাড়ীর লোকে ওর সঙ্গে আমার মেশাটা হয়ত বরদাস্ত করবেন না।

রবির সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার পর থেকে এ ক'টা মাস ফুটবল খেলে ' ্মার গালগল্প করে কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেল তা জানি না! মনে হয় এ ...সদিনের কথা। কোথায় পড়ে রইল জ্যোতিষ আর প্রসন্ন আর সব মার্কা-মারা ভা , ছেলের দল, কারুর কথা আর মনেই রইল না আমার।

কথাটা কেমন করে জানি না বাবার কাণে উঠল। বাবা আমাকে ডেকে এক সুদীর্ঘ উপদেশ দিলেন, তার সারাংশ হচ্ছে—ভাল ছেলেদের সঙ্গে যদি মেশবার ক্ষমতা আমার না থাকে কারুর সঙ্গেই মিশব না। বখাটে নিষ্কর্ম্মা ছেলেদের সঙ্গে মিশে

ইস্কুলের অচেনা পথ

শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

কোন ফল নেই। রবি হচ্ছে ঐ জাতির ছেলে সুতরাং তার সঙ্গে মেশা আমার একেবারে বারণ!

আবার দ্বিধায় পড়লুম। একবার মনে হ'ল সত্যিই রবির সঙ্গে মিশে সময় এবং স্বভাব নষ্ট করেছি। একবার মনে হল রবি ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই। বাবা আর জ্যাঠামশাইকে আমি ভয় করতুম, তা ছাড়া গুরুজনদের উপদেশ শোনা চিরকাল অভ্যাস; ঠিক করলুম রবিকে এড়িয়ে চলতে হবে। কিন্তু কেমন করে এড়াব? রবিকে কি বলব? হঠাৎ কি ছুতোয় বা ওর সঙ্গে মেশা বন্ধ করতে পারি? দু' তিন দিন চেষ্টা করে ওকে কাটিয়ে চল্লুম। রবি কি একটা সন্দেহ করলে। একদিন এসে আমায় [illegible] আমার নামে তোর কাছে কেউ লাগিয়েছে?" আমি ভারি লজ্জায় পড়ে [illegible], বল্লুম,—"না, না, লাগাবে কেন?" রবি আর কিছু বল্লে না। আমি বুঝলুম ও সব বুঝতে পেরেছে। আমি জানি কিনা রবির কিছুই নজর এড়িয়ে যায় না, ও সব বুঝতে পারে।

মন ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দেখলুম রবি ছাড়া কেউ আমায় বোঝে না। রবিকে একদিন সব কথা খুলে বল্লুম। রবি হোঃ হোঃ করে হেসে বল্লে "এই কথা? চল্ আজ একটা ফুটবল ম্যাচ খেলে নে, তোর মন টন সব ভালো হয়ে যাবে।" বলে আমায় টানতে টানতে [illegible] পাড়ার ফুটবল গ্রাউণ্ডে উপস্থিত করলে।

তার পর ম্যাচ খেলা আরম্ভ হল। যাদের বিরুদ্ধে আমরা খেলছিলুম তারা সবাই ভালো খেলে। গো[illegible]কেই তারা আমাদের হারিয়ে দিতে থাকল। জেতবার জন্যে আমরা মরিয়া হয়ে উঠলুম। বিশেষতঃ আমি। আমার মনে হতে থাকল, শুধু আমারই খেলার উপর [illegible] যাদের দলের সমস্ত সম্মান নির্ভর করছে। একটা চার্জ্জ করতে গিয়ে আমি টক্কর [illegible] হচ্ছি [illegible] এক ধারে পড়লুম। কয়েক সেকেণ্ড কিছু বুঝতে পারি নি। তার পর যখন [illegible] দেখি ভুরু কেটে রক্ত পড়ছে। সামান্য একটু ছড়ে গেছে। ভাবছি মুছে ফেলে খেলা শুরু করব ইতিমধ্যে রক্ত দেখে খেলোয়াড়েরা আমার পাশে ছুটে এল। কে একজন বল্লে—"ইস্ একেবারে হাঁ হয়ে গেছে দেখছি—এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও।" আমি ভয় পেয়ে ভুরুতে হাত বুলিয়ে দেখলুম বড় সহজ নয়—একটা কোণ-ভাঙা ইটের উপর পড়েছিলুম, চোখটা খুব